ক্ষণপানা

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

১—১৫ জুলাই ১৯৭৮

পঞ্চাশ পয়সা

চিঠি

মহাশয়,

'যোজনা'-র ১-১৫ই মে সংখ্যাটি যথাসময়ে হাতে পেয়েছি। এ সংখ্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রপ্রসাদ মিশ্রের লেখা 'চৈত্র-বৈশাখের বিপ্লবী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত চমকপ্রদ বলেই মনে হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যে বিষয়বস্তুর কোন ধারণা খুঁজে পেলাম না। তাঁর বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট ও অবাস্তব হয়ে গেছে। তিনি যদি আরেকটু সিরিয়াসভাবে লিখবার চেষ্টা করতেন তবে এই বিষয়টি এক অন্যরকম রূপ নিতে পারতো।

কবিতা লিখে তুলনা কবি হিসাবেই পরিচিতা। আমরা তাঁকে কবি হিসাবেই দেখতে ভালোবাসি। উনি কবিতা ছেড়ে এরকম একটা বানুলী গদ্য লিখে ফেলতে গেলেন কেন বোঝা গেল না। এ ধরণের গদ্য আজ-কালকার অধিকাংশ লিটিল ম্যাগাজিনে অকছার দেখতে পাওয়া যায়।

অশোক ঘোষের লেখা 'অসংগঠিত শ্রমিকের সমস্যা' একটি মূল্যবান নিবন্ধ। দুর্গা বসুর 'ঘরে ঘরে দুর্গা গড়ে তুলুন' লেখাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি অত্যন্ত যত্নে গ্রামবাংলার মাটির ঘরের কথা অত্যন্ত সরলভাবে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন যা সত্যই প্রশংসাযোগ্য।

শিল্প সংস্কৃতি' পর্যায়ে বীরেন সাহার 'ডাকাতিকে তাঁরা চারজন' যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা সাধারণ মানুষের মনে এদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই জাগাবে। এঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে যাঁদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই তাঁরা বীরেন সাহা মহাশয়ের কাছে আগামী দিনের জন্য উনুখ হয়ে রইলেন আরো বেশী কিছু জানবার আগ্রহে।

এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রাখীর হাতের 'সরকারী বাঁধন অনিবার্য কয়েকটি দিক' সুলিখিত হয়েছে। মনমাতানো লাবণ্যময় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের ছোটটি অপূর্ব।

মুহাম্মদ মজুমদার
সম্পাদক, দিবারী পত্রিকা,
আচার্যপল্লী, নরেন্দ্রপুর

মহাশয়,

যোজনা পত্রিকার ১৬-৩১ মে সংখ্যাটি হাতে পেয়েছি। আমি আপনাদের যাকেই সংখ্যা প্রথম হাতে পাই। ঐ যাকেই সংখ্যাটি পড়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম পত্রিকাটি খুব উচ্চমানসম্পন্ন এবং সম্পাদনা খুবই পরিচ্ছন্ন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যে কটা যোজনার সংখ্যা আমি হাতে পেয়ে পড়েছি তাতেই অবাক হয়েছি সুন্দর সম্পাদনা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য।

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্নের সন্ধানে,' সুভাষ মজুমদারের 'জাতীয় গ্রন্থাগার : পঞ্চাশের দশকের পরিক্রমা', পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'আকাশবাণী ও দূরদর্শন : রূপ ও ভাবনা,' বীরেন ভৌমিকের 'তাঁত শিল্পে নতুন প্রাণের স্পন্দন' 'আজন্ম ভিত্তিক বৃদ্ধিনীতি কেন প্রয়োজন' লেখাগুলো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। 'ফসল তোলার সময়'-আবৃত্তি মেলের এই গল্প মোটামুটি ভালই হয়েছে।

বিশ্বনাথ বসু
রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর

মহাশয়,

উড়িষ্যায় আমি একজন বাংলা ভাষার শিক্ষক। আমাদের স্কুলে আমি Optional Language হিসেবে বাংলা পড়াই। ভুবনেশ্বরের পূর্বাঞ্চল ভাষাকেন্দ্র থেকে আমি বাংলা শিখেছি।

আপনার 'যোজনা' আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য, কৃষি আর বিজ্ঞান—সভ্যতার কোন অঙ্গই 'যোজনা' থেকে বাদ যায় নি।

জাদিত্য কুমার পণ্ডা
খারকুড়া, রসুলি, বালাসোর, উড়িষ্যা

'যোজনা' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'যোজনা'য় লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার।
একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। গ্রাহকেরা ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে ২০% ছাড় পাবেন। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা :
যোজনা, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯.
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

কুরুক্ষেত্র

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬—৩০ আষাঢ় ১৩৮৫
১—১৫ জুলাই ১৯৭৮
দশম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

জাতীয় বেতন নীতি : পথের সন্ধানে যেতেনি
বীরেন ভট্টাচার্য্য ২

বহুতা যোজনা—সমস্যাভিত্তিক যোজনার অভিনব বিকল্প
ডঃ ডি. টি. লাকডাওয়ালা ৪

নয়ন তেরোমি
বরুণ মণ্ডল ৭

স্ন্যাপশটিক—চালন-বন্ধবিহীন মানুষ
কণা মুখোপাধ্যায় ৯

উচ্চ ফলনশীল প্রতিযোগিতা
সোমনাথ মিত্র ১১

সংবাদ ১২

জানা অজানা ১২

বিজ্ঞান প্রযুক্তি
সবুজ বিপ্লব ১৩

মহিলা মহল
রেখা চৌধুরী ১৫

খেল খামার
শীলবন্ধু রায়বা ১৭

বিজ্ঞ সংস্কৃতি
বিজ্ঞ রায় ১৮

সত্যানন্দ গুহ ১৯

গ্রন্থ আলোচনা
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২০

প্রাঙ্গণ
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২১
কেশবলাল শাহ ২১

প্রচ্ছদশিল্পী—বলরামকর শাসমল

সম্পাদকীয়

খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা

এই সেদিনও দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি মেটাতে আমাদের বিদেশে ধর্না দিতে হত খাদ্যশস্যের জন্য। আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে কৃষিজাত পণ্যের জন্য পর-নির্ভরতা নিঃসন্দেহে অবমাননাকর ছিল সন্দেহ নেই। আজ আমরা সেই গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত। আমদানির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য থেকেই একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

১৯৭৭-৭৮ সালের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২ কোটি ১০ লক্ষ টন হবে বলে আশা করেছিল, যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ১৯৭৩-৭৬ সালেও উৎপন্ন হয়েছিল এবং যা ছিল সর্বকালীন রেকর্ড। এখন দেখা যাচ্ছে গত বছরের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ পূর্বের রেকর্ড ছাপিয়ে আনুমানিক ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ টন হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এই উৎপাদন ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টন বেশী। আলোচ্য বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য ছিল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন।

শুধু খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেই আমরা এই কৃতিত্ব অর্জন করিনি। আখ, প্রধান প্রধান তৈলবীজ এবং তামাকের মত অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রেও ৮ থেকে ৯ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০ থেকে ১২ শতাংশ হয়েছে বলে ধরা হচ্ছে। এই বৃদ্ধির হারও একটি রেকর্ড।

কৃষিপণ্য বিশেষত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এই সন্তোষজনক পরিস্থিতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে একটি সুসংবদ্ধ প্রয়াস—সেচসেবিত এলাকার প্রসার, উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধের বর্দ্ধিত ব্যবহার ও বিজ্ঞানসম্মত চাষবাসের সম্প্রসারণ। গত বছর ২৪ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এক বছরে এতটা পরিমাণ অতিরিক্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা ইতিপূর্বে কখনো করা সম্ভব হয়নি। সেচের সুযোগ যদি থাকে তবে উচ্চফলনশীল বীজ ও সেই বীজ ব্যবহারের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ব্যবহারও সম্ভব হয়। সেচের সুবিধা থাকলে একাধিক ফসলও ফলান যায়। গত বছর উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে সারের প্রয়োগ। ধান, গম ও জোয়ার সংগ্রহ-মূল্য বৃদ্ধি করেও সরকার কৃষকদের অধিক ফলনে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আজ আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে একটা নিরাপত্তামূলক মজুত ভাণ্ডারও গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। রবিশস্য সংগ্রহ শুরু করার আগেই এই মজুত ভাণ্ডারে ছিল ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। রবিশস্য থেকে যে সংগ্রহ চলছে তাতে এই মাসেই খাদ্যশস্যের মজুত ১ কোটি ৮০ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে পরিস্থিতি যতই সুবিধাজনক হোকনা কেন আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সীমিত করতে আমরা সক্ষম হলেও সেই সীমিত বৃদ্ধির লক্ষ্যে মনে রেখে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার আমাদের উত্তরোত্তর বাড়িয়েই যেতে হবে।

জাতীয় বেতন নীতিঃ
পথের সন্ধান মেলেনি

ধীরেন ভট্টাচার্য

এল. ভূতলিঙ্গম একদা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী। অবসর-প্রাপ্তির পর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ' বা জাতীয় ফলিত-অর্থনীতি গবেষণা-পর্ষদের অধিকর্তাপদেও তিনি বৃত হয়েছিলেন। সুদক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমী এই বহুল-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিটির ওপর জাতীয় পর্যায়ে মজুরি, আয় ও মূল্য সম্পর্কে প্রয়োগ-সাপেক্ষ উপদেশ চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত বিশ্বাস অর্পণ করেছিলেন। শ্রী ভূতলিঙ্গম-এর সহযোগীরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং তাঁদের প্রতিবেদন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্ককে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে, এই আশা অনেকেরই মনে ছিল। অবশ্য সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে যারা কথা বলে থাকেন, সেই ট্রেড-ইউনিয়ন প্রধানেরা গোড়া থেকেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে আসছিলেন যে শ্রমিকের মজুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিন্দুমাত্র আওতায় এলেই শ্রমিক-স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। শ্রমিক-মালিকের যৌথ দরকষাকষির মধ্যেই যারা মানবিক সম্পর্কের (অন্তত ধনতন্ত্রী সমাজে) সর্বোত্তম রূপ খুঁজে পান, তাঁরা যে এই ধরনের জাতীয় নীতিনির্ধারক সমীক্ষাকে খুশি মনে মেনে নেবেন না তাতে বিস্মিত বোধ করার কারণ নেই। কিন্তু এই যৌথ দরকষাকষিতে সামাজিক মঙ্গল কতদূর সাধিত হচ্ছে এবং দরাদরির নিয়ম-কানুন কিছু কিছু বেঁধে দেওয়া যায় কিনা সে-সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দায়িত্ব থেকে জাতীয় কোনো সরকার সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেতে পারেন না। ট্রেড-ইউনিয়ন প্রধানদের আপত্তি সত্ত্বেও ভূতলিঙ্গম কমীশন রোটির প্রতিবেদন দুই সরকারে পেশ করা হয়েছে এবং তার প্রধান প্রধান বক্তব্য সংবাদপত্রেও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে গত ত্রিশ বছরে দেশের কিছুটা আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে। জাতীয় আয় বৎসরে শতকরা তিন থেকে সাড়ে তিন ভাগ হারে বেড়েছে। এই বাড়তি আয়ের ভাগ কে কতটা নিজের পক্ষে সুবিধাজনক করে নিতে পেরেছে তা প্রধানত নির্ভর করেছে সমাজের দর্বলতর বনাম প্রবলী শ্রেণী সংগ্রামের উপর। এখানে আমরা শুধু সংকীর্ণ অর্থে শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রতি ইঙ্গিত করছি না। শ্রমিকদের মধ্যেও নানা স্তর, নানা উচ্চনীচ ভেদাভেদ ও বৈষম্য বিদ্যমান, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক একই মজুরি পেয়ে সমান খুশি থাকবে এবং তাকেই ন্যায়সঙ্গত মনে করবে এমন ধারণা অমূলক। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের মজুরি প্রবর্তিত থাকবে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সামাজিকভাবে এই প্রয়োজনকে কখনোই অস্বীকার করতে পারে নি। কিন্তু এর ফলে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের পদ্ধতিতে এক ঘোরালো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নিজেদের প্রাপ্যিত মজুরি আদায়ে সফলকাম হওয়ার পর থেকেই অন্যান্য সমযোগ্যতার সংগঠনকেও দাবী আদায়ের জন্য নিজেদের হাতিয়ারে ধার দিতে হয় এবং এদের প্রচেষ্টা সফল হলে প্রথমোক্ত ট্রেড-ইউনিয়ন আবার আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়। কে-যেসেই সংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলন পরিবার, সেই দেশেই এই ধরনের ধাপে ধাপে মজুরি বৃদ্ধির ঘটনা চাক্ষুষ করা গেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ এই ঘটনার আপাত-লক্ষণীয় কারণ হলেও মূলে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক সমতা রক্ষার জন্যগত প্রচেষ্টা। মালিক-শ্রেণীর মুনাফা-বৃদ্ধি অবশ্য অনেক সময়েই এই ধরণের আন্দোলন চালু রাখার পথে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু মুনাফার পরিমাণ যেহেতু পূর্বনির্দিষ্ট নয়, সেই হেতু অতিরিক্ত মুনাফার উপর মালিক-শ্রেণীর পরিকল্পনার উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। আমাদের দেশে জাতীয় আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মালিক-শ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধির পথ খুলে গেছে, কিন্তু এটাই ধনতন্ত্রী সমাজে অর্থনৈতিক প্রগতির সাধারণ নিয়ম। এর জন্য মালিকদের কুঠোরা মনোবৃত্তির উপর দোষ চাপানো যদিও শ্রমিক আন্দোলনের একটি বহু-ব্যবহৃত জিগির, এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনপ্রিয় হবার একটি সহজ পথ, তবু মুনাফার উচ্চতর যে সব ক্ষেত্রে মালিকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না তা একটু ভাবলেই বোঝা যাবে।

দেশে শিল্পবিস্তার, শ্রমিক-সংগঠনের বিস্তৃতি এবং সাধারণভাবে মুনাফা-বিক্ষেপ-ফলের ফলে মজুরি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিযোগিতার নির্ঘাত প্রকাশ দেখা গেছে বিশেষভাবে মূল্যস্তর-বৃদ্ধির বৎসরগুলিতে। এই সময়ে যার যেমন সাংগঠনিক সামর্থ্য তাই নিয়ে প্রায় সব শ্রমিক-গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মজুরির হারে বুদ্ধিসঙ্গত সমতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যে-সব ক্ষেত্রে কোনো আদালতের রায় অনুযায়ী মজুরি নির্ধারিত হয়েছে সেখানেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালতের রায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে নি। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার নিজের কর্মচারীদের জন্য বেতন-কমিশন গঠনের সময় রাজ্য সরকারের কর্মী কিংবা

সরকারী ক্ষেত্রের নিম্নে নিযুক্ত কর্মীদের কথা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার নিজ নিজ নীতি ও ন্যায়পরতার বিবেচনায় নিজেদের কর্মীদের বেতন-হার নির্ধারিত করে দিয়েছেন, পরস্পরের মধ্যে খোঁজখবর করে দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেন-নি। এই ভাবে বেতন-হারের মধ্যে নানা ধরণের বৈষম্য ও অসঙ্গতির অনু-প্রবেশ ঘটেছে। ফলে সমান যোগ্যতা ও নৈপুণ্য নিয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের উপার্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

এর উপর রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে বোনাস দেবার এবং একেবারেই না-দেবার প্রশ্ন। প্রথমে বোনাস দেবার রীতি চালু হয়েছিল মুনাফার উপর শ্রমিকের খানিকটা অধিকারের স্বীকৃতিরূপে। ক্রমশ মুনাফার পরিমাণের সঙ্গে বোনাসের যোগাযোগ বিলুপ্ত হয়ে গেল যেন এবং শ্রমিকদের বেতনেরই একটা অংশ বৎসরান্তে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই আখ্যা দিয়েই বোনাস দেওয়ার যৌক্তিকতা বহু শ্রমিক-আদালত এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিলেন। কোনো বিশেষ বৎসরে মুনাফা আশানুরূপ না হলেও মালিকের পক্ষে শ্রমিকের বোনাসের দাবী পূরণ করা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে মূল বেতনের হার তেমন পরিবর্তিত হল না। তাই মহার্ঘ-ভাতা এবং বোনাসের পরিমাণ বাড়িয়ে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হল। কিন্তু যেহেতু নিয়োগের সব ক্ষেত্রে বোনাস-প্রথা চালু করা হল না কিংবা মহার্ঘভাতার নিয়ম-কানুনেও নানা রকমের গ্রন্থি থেকে গেল, সেই জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমজীবীর মধ্যে এইসব কারণেও আয়ের বৈষম্যের সৃষ্টি হ'ল।

স্বীকার করে এই বৈষম্যের মধ্যে থেকে যুক্তিসঙ্গত এবং মোটামুটিভাবে বৈষম্যের অবসানযুক্ত একটি বেতন ও উপার্জনের কাঠামোতে উত্তীর্ণ হওয়া বহু প্রীভূতলিফর ও তার সহযোগীদের কাছে সেই পথেরই সন্ধান চাওয়া হয়েছিল। তাঁদের প্রতি-বেদনের সামান্য যেটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে কিন্তু মনে হয় না যে তাঁরা এই প্রার্থিত পথের সন্ধান দিতে পেরেছেন। বরঞ্চ ভূতলিঙ্গম-গোষ্ঠি বেতন-নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে যৌক্তিকতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে কীভাবে বোনাস প্রভৃতি ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে শ্রমিকের ক্রয়-ক্ষমতাকে সীমিত রাখা যায় সেদিকেই নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন বলে মনে হয়। বোনাস দেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-সব বৈষম্য চালু আছে তা তুলে দেবার কিংবা কমিয়ে দেবার কথা তাঁরা খুব বেশি করে ভেবেছেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁদের প্রধানতম ভাবনা ছিল বোনাসকে ক্রয়-ক্ষমতায় রূপান্তরিত হতে না দেওয়া, যাতে এই অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতায় উপভোগ-সাধন জিনিস-পত্রের দাম বাড়ার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু যে-সব শ্রমিক-গোষ্ঠি বোনাস পাবার দাবী আগে থেকেই আদায় করে নিয়েছে তাদের বোনাস তুলে দেওয়া কার্যক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় বলেই বোধহয় তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন যে বোনাসকে বৎসরান্তে এক অর্থের পরিবর্তে অবসরকালীন পেন্সন হিসাবে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে শ্রমিককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না করেও আপাতত তার ক্রয়-ক্ষমতাকে কমিয়ে রাখা যাবে। ক্রয়-ক্ষমতার সংকোচ-সাধনের উদ্দেশ্যেই এঁরা আরও প্রস্তাব রেখেছেন যে ব্যবসায়ের মুনাফার উপর 'ডিভিডেণ্ড' বণ্টনের ঊর্ধসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক এবং সব শ্রেণীর শ্রমজীবীর জন্য একই পরিমাণ মহার্ঘ ভাতার প্রবর্তন করা হোক। এঁদের প্রতি-বেদনের এই সব প্রস্তাব যদি রূপায়িত হয় তবে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রতিরোধক যৌক্তির ব্যাপারে সরকার কিছুটা সাহায্য পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু এই সব প্রস্তাবকে ন্যায়সঙ্গত কিংবা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি হবে। কার্যক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় কথা হ'ল যে, এই ধরণের প্রস্তাব সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এসব প্রস্তাব কার্যকর করার চেষ্টায় ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তাতে মূল্যস্তর হ্রাস পাবার পরিবর্তে শিল্পক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার জন্য মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে ভূতলিঙ্গম-গোষ্ঠিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছিল। দেশের সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, মুনাফা-উপভোগী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের সংরক্ষণ আনার চেষ্টায় যে-জটিলতা অন্তর্নিহিত, তার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বার করবার পক্ষে এঁদের হাতে পর্যাপ্ত সময় একেবারেই ছিল না। সেইজন্য সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে বেতন-ক্রমের বৈষম্য কিংবা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার শ্রমজীবীদের বেতন-সম্পর্কিত নানা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থেকেও এঁরা এই ধরণের সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রবৃত্ত হন নি। তবু সমস্যাগুলি যে অতিমাত্রায় জটিল এবং এর দীর্ঘায়ত বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় স্তরে বেতন-কমিশন, বেতন-কমিটি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থা গড়ে তোলা যে অবিলম্বে আবশ্যক, সেই কথা বলেই এই প্রসঙ্গ এঁরা শেষ করেছেন। তবে বর্তমানে সরকারী ক্ষেত্রে উচ্চতম এবং নিম্নতম বেতনের মধ্যে অনুপাত যে ৯ : ১ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে সেই অনুপাত যে ১৬ : ১ এবং উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে এই পার্থক্যকে ক্রমশ কমিয়ে আনা যায় কিনা প্রতিবেদনে সেই নিয়ে কিছু আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভূতলিঙ্গম-কমিটির সদস্যদের মধ্যে একজন প্রস্তাব রেখেছেন যে আয়কর দেবার পর কেউ যেন মাসে ২৫০৲ টাকার বেশি হাতে না পান তার ব্যবস্থা জাতীয় বেতন-নীতির

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

বহতা যোজনা – সময়ভিত্তিক যোজনার অভিনব বিকল্প

ড: ডি. টি. লাকড়াওয়ালা

বহতা যোজনার ধারণা প্রধানত এই উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে পরিকল্পনা রচয়িতারা তাঁদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার ব্যাপারে অযথা নন। সেই জন্য এবং আরো অনেক কারণে মূল লক্ষ্য মাত্রার সঙ্গে সাফল্যের বিস্তর ব্যবধান থাকতে পারে। এ দুয়ে বর্তমান এই অসামঞ্জস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই সূত্রে উপলব্ধি অত্যাবশ্যক পরিকল্পনাকে আরও সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করার আন্তরিক প্রচেষ্টার সুযোগ এনে দেবে এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও গভীরভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে।

এই দেশের পরিকল্পনার ইতিহাস এই যুক্তিকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় থেকেই জাতীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আশানুরূপ এবং রূপায়িত কার্যাবলীর মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবধান প্রতিফলিত হচ্ছে পরিকল্পিত ও অর্জিত অগ্রগতির হারের অসামঞ্জস্যের মধ্যে। পরিকল্পিত অগ্রগতির হার যেক্ষেত্রে কখনোই ৫ শতাংশের কম ধরা হয়নি সেক্ষেত্রে অর্জিত উন্নয়নহার কখনোই ৩·৫ শতাংশের বেশী হয়নি। এর জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলিই মূলত দায়ী :

(ক) উপর্যুপরি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সকল ও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রাকে একটি ঊর্ধ্বাভিমুখী ছকে বাঁধা হয়েছিল। এর ফলে অনেক বেশী হারে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে বলে তাঁরা হয়েছিল এবং সত্যের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সার্বস্তরে জন্য পরিকল্পনার পর্বক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত সাফল্যের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল।

(খ) ভারতে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে প্রকৃতির অনিশ্চয়তার নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কারণে কৃষ উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে যোগান নিশ্চিত করতে বিদেশ থেকে আমদানি করা বা যথেষ্ট আগের থেকে পরিপূরণ করার মত কিছু ব্যবস্থা নিতে হয় কিন্তু আগেই কোনরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে বহু বছর ধরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব, এবং বিনিয়োগযোগ্য মূলধন আটকে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। অবশ্য বহিঃবিশ্বের আক্রমণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছিল।

(গ) পরিচালন দক্ষতার দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় অর্থনীতিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় : সরকারী উদ্যোগ (বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের দ্বারা), বেসরকারী সংগঠিত উদ্যোগ এবং অসংগঠিত উদ্যোগ। এর মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (বেসরকারী সংগঠিত উদ্যোগে) নির্দেশমূলক পরিকল্পনাই কেবলমাত্র রূপায়িত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তথ্যসংগ্রহ, যোগাযোগ সাধন এবং উৎপাদনবর্ধক কার্যকলাপ এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রটিকে (অসংগঠিত বেসরকারী উদ্যোগকে) নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। বিপুল সংখ্যক অসংখ্য উৎপাদক ও বাজার সম্ভাব্য তথ্য সম্পর্কে তাঁদের অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, বেসরকারী অসংগঠিত উদ্যোগের এই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রকের পরিচালনার পরিপন্থী। সেজন্য প্রকৃত সাফল্যের মাত্রার অথৈই অসঙ্গতি ঘটত। এমনকি প্রথম ক্ষেত্রেও যেখানে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, সেখানেও প্রচুর পরিমাণে ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে।

এই সমস্ত কারণগুলি এখন আর তেমন প্রকট হয়ে দেখা দেবে না। ১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনায় যে অগ্রগতির হার ধরা হয়েছে তা বাস্তবানুগ এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারও কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু যে কোন কার্যকর পরিকল্পনায় দক্ষতার সর্বাধিক প্রসার ঘটানো অপরিহার্য। দেশের নতুন লক্ষ্যমাত্রা, উন্নত ধরণের বীজ, সারের প্রয়োগবিদ্যা, নতুন নতুন সেচ-সেবিত অঞ্চলে কৃষ্যাও এরিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন, শুষ্ক আঞ্চলিক জল সম্পদের সুষ্ঠু পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী এবং উন্নততর সম্প্রসারণ পদ্ধতির সাহায্যে খাদ্য ও কৃষির অগ্রগতির হারকে অনেক বেশী বাড়ানো সম্ভব বলে মনে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার সন্তোষজনক সঞ্চয় এবং বাণিজ্য ও সাহায্যক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং আয়ের পুনর্বণ্টন কর্মসূচীর ফলশ্রুতি অনুযায়ী অর্থব্যয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক হতে পারে। যেহেতু আমরা এই সব কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষ সচেতন তাই এই সব ক্ষেত্রে অথৈষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি না দেখতে পেলে আমাদের অন্যান্য কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস করতে হতে পারে। আমরা প্রায় সব তথ্যই পাই বার্ষিক ভিত্তিতে। তাই প্রতি বছর এ কাজ করার প্রশস্ততম সময় তখন। এই প্রসঙ্গে ন্যূনতম সময়সীমা যা ভাবা যেতে পারে তা হল এক বছর। অতীতে কেন্দ্রের ও রাজ্যের বার্ষিক বাজেটেই বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অধিক মঞ্জুরি থাকত। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর্যালোচনা করতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হত না। সেখানে পরিকল্পনার কেবলমাত্র মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ণ হত এবং যখনই গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হত, তখনই অত্যাবশ্যক নয় এমন অংশকে ছাঁটাই করা

হত। কিন্তু এই রূপায়ণে তাৎক্ষণিকতা ছিল বেশী, সুদূরপ্রসারী অগ্রাধিকার হানার প্রতি নজর দেওয়া হত না। অথচ ক্ষেত্র-ভিত্তিক অগ্রাধিকার যদি সময় মত খুঁজে বার করা যেত তবে অধিকতর সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হত।

বহুস্তর যোজনার ধারণা পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ত্রুটিচ্যুতির বিশ্লেষণের উপরই ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। উদ্দেশ্য হল প্রতি বছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার কতটা অংশ পূরণ করা হল তা পর্যালোচনা করে দেখা। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে পাঁচটি বার্ষিক সম্পদ-বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যাতে প্রতি বছরের অগ্রগতিকে অনুমিত সংখ্যার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যায়। যদি অগ্রগতি কম হয় তবে কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য অধিকতর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া অনেক সময় আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক চাহিদার এমন অচিন্তনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অদলবদল করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তন হলেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেমন উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা বা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাপ্তিযোগ্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমানুপাতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অধিকতর গ্রহণ করা দরকার। বার্ষিক পর্যালোচনার সময়ে আরো এক বছরের লক্ষ্যমাত্রাও যোগ করা প্রয়োজন যাতে বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট দূরদর্শিতা নিয়ে সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হন। গত পরিকল্পনার শেষের দু'বছরে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে মন্দা দেখা দিয়েছিল।

বহুস্তর যোজনার ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। কেবলমাত্র জনসংখ্যা, জনশক্তির পরিকল্পনা জল সম্পদের ব্যবহার, খনি সম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি দীর্ঘমেয়াদী হতে হবে। প্রতি বছর এগুলির পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটু বেশী সময় অন্তর অন্তর এদের পর্যালোচনা করলেও চলবে। পর্যালোচনা প্রতিবছর করা যাবেনা এবং অর্থ কমিশনের জন্য সংবিধানে যে পাঁচ বছরের মেয়াদ ধার্য করা আছে সেই মেয়াদ শেষ হলে যদি নীতির পর্যালোচনা করা যায় তবে আরও ফলপ্রসূ ফল পাওয়া যেতে পারে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বার্ষিক পর্যালোচনার ফলে লক্ষ্যমাত্রার ঘনঘন পরিবর্তন হবে এবং অবশেষে মূল উদ্দেশ্যই খানচাল হয়ে যাবে। একথা মনে রাখা দরকার যে পর্যালোচনার অর্থই পরিবর্তন নয়। যদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে তাহলে সংশোধনের কথাই কোন সুযোগই থাকতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা-রচয়িতারাই সবচাইতে খুশী হবেন। যদি কোন প্রধান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ত্রুটির কোন সূত্র দেখা যায়, তবে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কোন সংশোধন করার পূর্বে ঐ ত্রুটির কারণগুলি পরিষ্কার দেখতে হবে, দেখতে হবে ত্রুটিটি মারাত্মক কিনা বা তা দূর করা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভবপর হয় তবে সেই ত্রুটি অধিকারে সুযোগ করতে হবে। তাছাড়া যেহেতু সমস্ত লক্ষ্যমাত্রাই পূর্বে প্রকাশিত হবে, সেই কারণে বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষ সকলের পক্ষেই সেগুলির সমালোচনা বা বিচার করার অনেক সুযোগ থাকবে। যদি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকেও আমরা ছাড়িয়ে যাই তবে সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেবে। যেখানে প্রযুক্তি বা কৃত উৎপাদনের মধ্যে অবাঞ্ছিতপূর্ব পরিস্থিতি পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে সেখানে লক্ষ্যপূরণে ঘাটতি বা বাড়তির সম্ভাবনাকে আগে ভাগে ধরিয়ে দেওয়া যাবেনা। সময়মত এসব বিষয়ে লক্ষ্য না রেখে আমরা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে পারি না। ফলে একটি অধিকতর সময়োপযোগী যোজনার নির্দিষ্ট সুবিধা হাতছাড়া হয়ে যায়। অতীতে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে অথচ কাউকে তার জন্য দায়ী করা হয়নি। বহুস্তর যোজনার কর্মপদ্ধতি এটাই নিশ্চিত করে যে এই সমস্ত ভুল-ত্রুটি আগেই ধরা পড়বে এবং আশা করা যায় যে, সেগুলি সময়মত সংশোধিত হবে।

কেউ কেউ আবার বহুস্তর যোজনার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাপক ব্যবস্থাদির প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছেন। বার্ষিক পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন তথ্যাবলীর দ্রুত ও নির্ভুল প্রবাহ। অনধিক ২-৩ মাসের মধ্যেই কোন ক্ষেত্রে কতটা কাজ হয়েছে তা জানা দরকার। যদি কোথাও বেশী কাজ হয় বা কোথাও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম কাজ হয় তাহলে তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার যাতে কম কাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্যপূরণের সম্ভাবনা বাড়াই করা বা বেশী কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা যায়। এই সব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রায় কি পরিবর্তন প্রয়োজন তাও ভেবে দেখতে হবে। এই সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে চূড়ান্ত সংশোধন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই। একথা সবারই জানা যে ভারতীয় পরিসংখ্যান তৈরী হতে সময় লাগে। এই ত্রুটি যোজনার বার্ষিক পর্যালোচনার ধারায় সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় বহুস্তর যোজনার পক্ষে প্রয়োজনীয় নির্ভুল কাজ কতটা সম্ভব হবে তা সন্দেহের বিষয়। এই স্বাভাবিক সন্দেহের উত্তরে আমি কেবলমাত্র দুটি প্রসঙ্গ তুলতে পারি। যে কোন পরিকল্পনা বিশেষত বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা সফল করতে হলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ করে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। একথা যেমন নির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য বহুস্তর যোজনার ক্ষেত্রে। এই ব্যাপারে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে তা যত শীঘ্র সম্ভব শুধরাতে হবে। বহুস্তর যোজনার সব চাইতে বড় গুণ হল এই তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করার কাজ আরও

গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। তথ্যপ্রবাহের ভুল ত্রুটি এই পদ্ধতিতে সহজেই ধরা পড়বে। পরিকল্পনা কমিশন ব্যাঙ্গালোর কলা কয়েকটি শিল্প ও খনি শিল্প সম্পর্কে একটি তথ্য সংগ্রাহক ব্যবস্থা চালু করবার জন্য ১৯৭৯ সালেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রককে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত মাসিক বিবরণ এবং তার বিশ্লেষণ পাঠাতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন এই প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেন ও তার ভিত্তিতে প্রতি তিনমাস অন্তর একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন তৈরী করেন। এখন ঠিক করা হয়েছে যে এই রিপোর্ট তৈরীর পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে পর্যালোচনা বৈঠক বসবে। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী স্তরেই এই তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। সমস্ত সরকারী উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্যাবলী যথেষ্ট নিয়মিতভাবে চাহিদামতো কমিশনের কাছে আসছে। সেচ এবং শক্তি, রাজ্য পর্যায়ের এই দুটি বড় বড় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত ব্যবস্থা আছে। আমরা রাজ্য সরকারের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, যেমন কৃষি ও তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রেও এই ধরণের ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করছি। যে সংস্থা যে কাজের জন্য দায়ী সেই কাজ সম্পর্কে তথ্য সেই সংস্থাই ভালভাবে সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী স্তরগুলির উপর কর্মসূচী রূপায়ণ ও তৎসম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তাবে।

পদ্ধতি হিসাবে যতই যোজনা নির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক যোজনার চাইতে উন্নততর ব্যবস্থা। অতিমন্ত্র প্রণালী অনেই এ বিষয়ে আশাঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই আশাঙ্কা অমূলক এবং এই সংশয় থেকে কেমনেই আমরা উন্নততর চিন্তা করতে সমর্থ হব।

জাতীয় বেতন নীতি

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অন্তর্ভুক্ত করা হোক। অন্য সদস্যরা কিন্তু বলেছেন যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে সব স্তরের লোকেদেরই আয় খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কোনো স্তরেই আয়ের উর্ধ্বতন সীমা বেঁধে দেবার প্রয়োজন-তাঁরা অনুভব করেন নি। উচ্চ আয়-বিশিষ্ট লোকেদের বাড়তি আয়ের একটা বড় অংশ সরকার কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায় করে থাকেন, এটাই বহু দিনের প্রথা এবং এই প্রথার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উপার্জনের বৈষম্য যতটা দূর করা যায় সেটাই হবে এঁদের মতে যথেষ্ট। বাড়তি উপার্জনের শতকরা ১০০ ভাগই কর-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ে সরকারের হাতে দিয়ে এলে কাজের উৎসাহ, উদ্যোগশক্তি ইত্যাদি করে যাবার আশংকাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু বাড়তি আয়ের চড়ম যেখানে আর্থিক কোনো কারণে ঘটে থাকে, সেখানেও একই নিয়ম বেঁধে চলার প্রয়োজন কেন হবে সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে কিছু আলোচনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

উপার্জনের উর্ধ্বতন সীমা বেঁধে দেবার পক্ষপাতী না হলেও নিরুক্ত আয় সম্পর্কে শ্রী ভূপ্রসিদ্ধম ও তাঁর সহযোগীরা এক সুপারিশ করেছেন। এখানেও এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বেশ খানিকটা অবশ্য যথেষ্ট মনে হয়, কেননা যেখানে দেশের জাতীয় আয়ের গড় এখন প্রতি পরিবারে মাসিক প্রায় ৪০০ টাকা, সেখানে ন্যূনতম মজুরির হার এঁরা আপাতত মাসিক ১০০ টাকায় বেঁধে দিতে বলেছেন, যদিও ক্রমশ এটা বাড়িয়ে মাসে অন্তত ১৫০ টাকায় তোলার কথাও বলেছেন। সংগঠিত শ্রমিকেরা বর্তমানে এর চেয়ে বেশি উপার্জন করে থাকেন, এমন কি কৃষি-ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হারও এর তুলনায় কিছু বেশি। সুতরাং ন্যূনতম বেতনের ব্যাপারে এঁদের এই সুপারিশ আর উপার্জনে আসবে 'স্ত্র' বোঝা যায়।

উপার্জনের কথা যায়, শ্রী ভূপ্রসিদ্ধম এবং তাঁর সহকর্মীরা যে-ধরণের সমাধানে আমাদের পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন তাতে মূল সমস্যাটির গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটা যাবে কিনা সে-বিষয়ে গভীর সংশয় থেকে যাচ্ছে। কেন এক শ্রেণীর শ্রমজীবী অন্য শ্রেণীর তুলনায় কম-বেশি বেতন পাবে এবং এই আয় তোলাতে কতদূর পর্যন্ত ন্যায্য বলে মেনে নেয়া হবে, সেই বহুদিনের নীতিগত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা এই প্রতিবেদনে দেখতে পাচ্ছি না। প্রমিকের দাবী এবং মালিকের সুনাফা-নিয়ন্ত্রণ মধ্যে টানা-পোড়েনে আজকের সব অর্থনীতি ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত এবং বলতে গেলে দিশেহারা। অর্থনীতি ব্যবস্থায় বিপর্যয় না ঘটিয়ে এই বিপর্যয়ের পথ থেকে ফেরিয়ে আসার কোনো উপায় উদ্ভাবন করা যাবে কি? সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাই কি কোনোরকম জবরদস্তি না খাটিয়ে সব স্তরের প্রমজীবীকে প্রাপ্য উপার্জনের সুযোগ করে দিতে পারবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা অবশ্যই জরুরী।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
'বন্ধ্যানো'র বিশেষ
যুগ্ম-সংখ্যা আগস্টের
প্রথম সপ্তাহে
প্রকাশিত
হচ্ছে

নয়ন ফেরেনি

বরুণ মণ্ডল

ওত দেরি হবার তো কথা নয়! এগারোটা প্রায় বাজে। নয়নের এতক্ষণে ফেরাই উচিত ছিল। নয়নের মা ভাবে। আজকে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ছে নয়নদের স্কুলে। তাই রোজের থেকে আগেই আসার কথা। কিন্তু এগারোটা বাজে। অন্যদিনও এ সময় চলে আসে। আজ কেন যে দেরি!

নয়নের মা ভাবে।

ছাদের থেকে শুকিয়ে যাওয়া জামা-কাপড়গুলো নিয়ে এসে গুছিয়ে আলনার রাখে। কাজ করে তার হাত। মন তার ভাবে। কি যেন বলাতে পারে না নয়নের মা। পর পর দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাটগুলো যেন কেমন এলোমেলো উলোটপালটা হয়ে যাচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা দাগে এগারোর ঘর অতিক্রমে ব্যস্ত।

নয়নের মা কাজ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা ধরে।

নয়ন ফেরেনি। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তবুও ফেরেনি।

নিজের ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করে নয়নের মা। রিক্সাওয়ালাকে তাড়া লাগায়। 'জোরে আরো জোরে রিক্সাওয়ালা।'

কেন এমন হচ্ছে? নয়নের মা ভাবিয়ে উঠছে। বাতাসে যেন অস্থিরতার ঘাটতি। বাপসের মত বুক তার নাচছে উঠছে। হঠাৎ জেগে ওঠা আশঙ্কাগিরির তপ্ত লাভায় নয়নের মা'র ভেতরটা পুড়ছে।

—আঃ, আর একটু জোরে যেতে পারছো না?

রিক্সাওয়ালা জোরেই যায়। কিন্তু আরো জোরে রিক্সাওয়ালা যায় না কেন! অচঞ্চল মন নিয়ে মাতালের মত যায় কি করে?

—তোমাকে আমি এক টাকা বেশী দেব রিক্সাওয়ালা, আরো একটু জোরে চল।

নয়নের মা যখন রিক্সায় উঠতে গিয়েছিল। অকারণে তার পা দুটো গিয়েছিল। পড়ার কথা নয়। সেটুকু চাপ সামলে নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু নয়নের মা পারেনি। রিক্সাওয়ালা একটা হাতাকে নয়নের মা'র দু'চোখে কাঁপতে দেখেছিল।

স্কুলের অত্ত দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ। নয়নের মা দরজায় ঘুকে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। নয়ন কোথায়? এই স্কুল বাড়ীটায় নয়নকে দিয়ে যাবার কোন কথা তো নেই! সবাইকে বের করে দিয়েই তো সে তার মুখ বন্ধ করে। তাই-ই করে করে আসছে এতদিন।

স্কুলের দারোয়ান কাছে পিঠেই কোথাও থাকে। দেখলেই তার বৌ-ছেলে আছে। স্কুলের কাজ শেষে সে বাড়ী ফেরে। রাতে শুতে আসে স্কুল বাড়ীতে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি। স্কুল বাড়ীর দরজায়—সারা দরজা সারা দিন এখন তালাই ঝুলবে।

পাশের দোকানের লোকটার কাছে দারোয়ানের বাড়ীর খোঁজ করে নয়নের মা।

লোকটার জানা ছিল। দেখিয়ে দেয় সে।

নয়নের মা চলতে করে পথটা পার হয়ে ছোট বাস্তাটায় ঢুকে পড়ে।

দারোয়ান বাড়ীতেই ছিল।

নয়নের মা'র ডাক শুনে বেরিয়ে আসে সে।

—স্কুল তো সেই সাড়ে আটটাতেই ছুটি হয়ে গেছে।

—সাড়ে আটটা? তারপর সবাই চলে গেছে? অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল না?

—না-না। অন্য কোথাও যাবার কথা থাকলে আমি জানতাম। আর আমি তো সব জায়গাতে সবে যাই।

-তাহলে নয়ন? নয়নকে তুমি দেখেছিলে স্কুলে আজকে?

—তা তো মনে করতে পারছি না, মা। কত ছেলে—কাউকে তেমন ভাবে মনে রাখা তো যায় না।

হঠাৎ এই ভর দুপুরে নয়নের মা'র পৃথিবীতে সন্ধ্যা নয়, ঘোর আঁধার নেমে আসে। আর সেই আঁধারে হারিয়ে যাওয়ার আগে কিছু ধরতে গিয়ে আছড়ে পড়ে নয়নের মা।

দারোয়ানের বৌ ছুটে আসে।

নয়নের মা চোখ খুলে দেখল—দারোয়ানের ঘর—দারোয়ানের বৌ।

এক দিদিমণি থাকেন আর দুবেই। পারোয়ান, আর বাড়ী ছুটেছে।

দিদিমণিকে দেখে নয়নের মা কেঁদে ওঠে। —আমার নয়ন কেরেনি।

—আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? সকলে কোন বন্ধুর বাড়ী-টাড়ী গেছে।

দিদিমণি দারোয়ানকে জিগেস করে, 'তুমি সব ঘরগুলো দেখেছিলে তো?'

—হাঁ দিদি, সব ঘর দেখে তারপর তো আমি জানালা দরজা বন্ধ করেছি।

দারোয়ানের কথার সাথে নয়নের মা কাঁদে।

নয়ন ফেরেনি।

নয়ন কোথা থেকে ফিরবে? কোন বন্ধুর বাড়ী তাকে রাত হানি দেয় না। রাতহানি দেয় তার বাড়ী—তার মা। বাপা পড়ার বাইরে নয়ন কোন দিন পথ চলেনি।

ভেতরের কান্না বাইরেটা ছেয়ে ফেলছে। পশু একটা শরীর নিয়ে ঘরে আছে নয়নের মা। সমস্ত অস্তিত্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে ঢুকে পড়ছে নিজেরই ভেতরে। প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে।

ফোনে খবর পায় নয়নের বাবা। —নয়ন ফেরেনি।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসে নয়নের বাবা। রাস্তার রাস্তার শব্দ। ট্রামের বন্দী পথিকদের তাড়াতে তাড়ার কথা বলে না। ঘরে নয়ন ফেরেনি।

নয়ন ফেরেনি—নয়ন ফেরেনি। শব্দের মতো অসহ্য আটেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে নয়নের বাবা।

বাড়ী ফেরে।

অসহ্য ভেঙে পড়া শরীরটা আরো ভেঙে পড়ে। কিন্তু আর নিজেকে ভাঙতে দেবেনা নয়নের বাবা। আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী খোঁজ নেয়। খোঁজ মেলে না। নয়ন ফেরেনি।

ঘুমের ওষুধ খোলা হয়। ভয় ভয় করে ছাদ থেকে ভাসে অবোধ চোখ একটি ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়।

খুঁজে পায় না কেউ। বিধাতার হাতে লেখা ঠিকানা কেউই পড়তে পারে না। নয়ন ফেরেনি। যন্ত্রণা কেবল আরো ঘন হয়ে জমে ওঠে নয়নের বাবার চোখে।

বিকেলের ছায়া এগিয়ে সন্ধ্যা তখনও দিবসের আসনে।

পুলিসের কাছে খবর যায়।

বার-বার চোখের সামনে নিঃসীম শূন্যতা।

রাত্রি ঝিমিঝিমি করে হেঁটে যেল ওদের খোলা চোখের সমুখ দিয়ে।

সন্দেহজনক সব আয়গাতেই খোঁজ নিয়েছে পুলিস। অথচ কোথাও নয়নের হদিস মেলেনি। সকালেই ছুটে এসেছেন পুলিস-অফিসার। ছুলটা তিনি একবার দেখবেন।

আবার খোলা হল ছুলের দরজা। খোলা হল সব ক্লাসের দরজা। বেঞ্চগুলো কাদও খোলা হয়েছিল। কিন্তু পুলিস অফিসার ভদ্রলোক বোধ হয় বিধাতার লেখা ঠিকানা পড়তে পেরেছিলেন।

ছুল বাড়ির একেবারে পিছনের পর পর সাজানো ঘরগুলোর একটার দরজার এসে থামলেন ভদ্রলোক। —এটি ভেতর থেকে বন্ধ যে। এখন তো ছুটি। এই অন্ধকার বারান্দার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ!

দরজা ভাঙতেই সমাধি ভেঙে গেল নয়নের ঠিকানা। ছোট বাথরুমে মুখড়ে মুচড়ে পড়ে আছে নয়ন। কিন্তু এখানে কেন নয়ন? ছুল বানাবে কাঠ-পেন্সিল দিয়ে লেখা সব কথাই দেয়ালে দেয়ালে লিখে গেছে নয়ন।

সুজয় ওকে ভয় করেছিল। সে ছুটে এসে ঢুকে পড়ে বাথরুমে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতেই ছিটকানিটা ঝুলে এসে দরজার ওপর পড়ল। দরজাটা বন্ধ হয়ে বন্দী হয়ে গেল নয়ন। সুজয় ওকে আর কোনদিন খুঁজে পাবেনা।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'নয়ন মারা গেছে রাত্রে।'

রাত্রে? বিকেলে তো ছুলে ফোন করেছিল, কিন্তু কেউ তো তেমন কিছু শোনেনি।

—নয়ন তার আগেই বীণ হয়ে পড়েছে। বন্দী ঘরে ভয়ে ভাবনার বিষম হয়ে পড়ে ও খুব চেঁচিয়েছিল। ছুটির টানে সকলে তখন চলে যেতে ব্যস্ত। নয়নের চীৎকার কেউ শোনেনি। নয়ন একটানা চেঁচিয়েছে—চীৎকার আশায়। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে দেওয়ালে ওর মাকে হাতে চিঠি লিখে গেছে। —আমার খুব খেত্তা পাচ্ছে, মা।

—মা, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আর তার পরেই একসময় নয়ন বাপা ভুলে পড়ে যায়। রাত্রি সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে মারা গেছে নয়ন।

নয়ন ফেরেনি। নয়নের মা অনুচ্চ-স্বরে ওয়ে ফেঁদে ওঠে।

নয়ন তাকে ভেকেছিল। নয়নের মা ফিরেও ছিল তো। মৃত্যুর দিকে ছেলের এগিয়ে যাওয়ার গতিও নিজের ভেতরে অনুভব করেছিল নয়নের মা। —তবে ফেরে তুই ফিরে গেলি নয়ন?—আমি এ জন আর ছুটি কি করে!

স্প্যাসটিক - চলন-যন্ত্রবিহীন মানুষ

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা স্প্যাসটিক কথাটি একটি নতুন শোনায়। বহু শিক্ষিত লোকও এখনো এর অর্থ জানেন না। প্রতিবন্ধী বলতে আমাদের স্বভাবতই মনে হয় অন্ধ, বধির, জড়বুদ্ধি বা বিকলাঙ্গ। স্প্যাসটিকরা এর কোনটাই নয়। তবে স্প্যাসটিক কারা?

মানুষের শারীরিক এই জটিল চিকিৎসা-শাস্ত্রগত নাম Cerebral Palsy বা শুরু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। যদিও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কোষের পক্ষাঘাতের জন্য বিভিন্ন ধরন স্প্যাসটিক হ'তে পারে, তবে সাধারণত ক্রিয়াজ বা চালক-স্নায়ুর (motor nerves) পক্ষাঘাতই স্প্যাসটিক হ'বার কারণ। এদের তুলনা করা যেতে পারে চালন-যন্ত্রবিহীন যানের সঙ্গে। এরা যেন হাল ও দাঁড় ছাড়া নৌকা, স্রোতের টানে এদিকওদিক চলতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট পথে চলতে পারে না। স্প্যাসটিকরাও যা করতে চায় তা করতে পারে না। হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও মস্তিষ্কের চালকযন্ত্র বশে না থাকায় তারা ইচ্ছামত ওগুলো ব্যবহার করতে পারে না।

সমস্যাটি কিন্তু ছোট নয়। এখন পর্যন্ত যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষে হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড্ বা প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ৮০ লক্ষ; তার মধ্যে স্প্যাসটিক আনুমানিক শতকরা ১। দিনে ২৪ টি স্প্যাসটিক শিশুর জন্ম হয়—ঘন্টায় ১ টি।

কেন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ঘটে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনো পদার্থবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা দিতে পারেনি। তবে এটা ঠিক, জন্মের আগে, সময়ে বা পরে, যে কোন সময়েই এই পক্ষাঘাত ঘটতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কে উপযুক্ত অক্সিজেনের অভাব, জন্মের পরে জন্ডিস বা মেনিনজাইটিস জাতীয় রোগের আক্রমণ বা পিতামাতার রক্তের প্রতিকূলতা ইত্যাদি যে কোন কারণেই এই পক্ষাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এর কোনো চিকিৎসা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নি এবং এখনো একে দুরারোগ্য বলেই মনে করা হয়। তাহলে আশা কোথায়?

হ্যাঁ, আশা আছে। এদের আরোগ্য করা না গেলেও উপযুক্ত শিক্ষা ও সাহায্য দিয়ে এদের অবস্থার অনেক উন্নতি করা যায়। এই আশা এবং সঙ্কল্প নিয়েই ১৯৭৩ সালে, প্রধানতঃ স্প্যাসটিক শিশুদের পিতামাতার প্রবল আগ্রহ ও উদ্যমে, বোম্বাইতে স্পাসটিক সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া গঠিত হয়। অতঃপর ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্প্যাসটিক সোসাইটি স্থাপিত হ'ল, এবং সেই বছরই নভেম্বর মাসে কলকাতার বাদীপুর বিদ্যাচারি কমপ্লেক্স কয়েকটি ঘর নিয়ে খোলা হ'ল স্প্যাসটিক শিশুদের শিক্ষার একটি বিশেষ কেন্দ্র।

স্প্যাসটিকদের লক্ষণ নানারকম হ'তে পারে। কেউ চলতে হাত পা কিছুই নাড়তে পারে না—তাদের সব কিছুই করে দিতে হয়; কারোর হাত পা বা শরীর সর্বক্ষণই নড়তে থাকে, কিছুতেই থামতে পারে না। যারা হাঁটতে পারে তারাও হিঁচড়ে চলে যাচ্ছে বা হাঁটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কেউ কথা বলতে পারে, কেউ পারে না বা তাদের কথা কিছুই বোঝা যায় না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পক্ষাঘাতের জন্য বাইরের লক্ষণও বিভিন্ন হয় এবং কোন দুটি স্প্যাসটিক এক রকম হয় না। অথচ স্প্যাসটিকদের মধ্যে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ জন সাধারণ বা সাধারণ থেকে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন। নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তারা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। স্প্যাসটিকদের শিক্ষার বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রে এই উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন স্প্যাসটিকদের সাধারণ স্কুলের কারিকুলাম অনুসরণ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান লেখিকা শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিদর্শনকালে এমন শিশুদের সাথে পরিচিত হয়েছে যারা কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতে পারে। একটি কুচকুচে ছোট মেয়ের জীবনের আকাঙ্ক্ষা সে কবি হবে। কিন্তু তারা এক অক্ষরও লিখতে পারে না কারণ হাত বা আঙুল কিছুই তাদের বশে নেই। এমন কি টাপ দিয়ে আইকে না রাখলে বসে থাকতেও পারে না, ব্যালান্স নেই। তারা মুখে মুখে রচনা করে, শিক্ষিকারা লিখে নেন। তাদের কথা—যারা তাদের অভ্যস্ত নয়—তারা বুঝতে পারে না। ভুলটিতে এরাও আছে অল্পবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি স্প্যাসটিক। তাদের পড়াশুনার চাইতে কাজ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক চালনার ওপরে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। জড়বুদ্ধি তবু শেখে খেতে, কাপড় পরতে ও শৌচকার্য করতে।

এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত আছেন শরীর-চিকিৎসক (Physiotherapist), অক্ষিবিদ্যাবিদ, মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ, শিশুচিকিৎসক, এবং স্প্যাসটিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষিকারা। স্প্যাসটিকদের শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। হাঁটা-চলা বসা-দাঁড়ানো কোনো কিছুর জন্যই হাত-পা বা শরীর অঙ্গের মনের বশ নয়। তাই তাদের চাই হুইল চেয়ার, টাইপ-রাইটার এবং আরো কতরকম সহায়ক-যন্ত্র। স্প্যাসটিক সোসাইটি স্বেচ্ছাসেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান, চলে পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের

পান ও চাঁদায়। প্রতিটি ছাত্রের জন্য গড়ে খরচ হয় ২০০ টাকা। কিন্তু স্কুলের কর্তারা পুরো বেতন দিতে পারে। ছাত্রের স্কুলের বেতন নির্ভর করে অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যের উপর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে একটি ছোট ওয়ার্কশপও আছে। সেখানে তারা সেলাই, ছুতোরের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজ শেখে। স্প্যাস্টিকদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুদের আত্মনির্ভর ক'রে তোলা, তাদের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগে সাহায্য করা। এ ছাড়া সম্প্রতি একটি আউট-ডোর চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে দুদিন খুব ছোট শিশুদের চিকিৎসা করা হয়, এবং তাদের বাবা-মাদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

গত বছর নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে বিশ্বের পক্ষাঘাতের প্রতিবিধান ও ব্যবস্থাকল্পে একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়ে গেছে। সেই অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বিশ্বের পক্ষাঘাত সমিতির (International Cerebral Palsy Society) সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত ফ্রেডরিক লোরিং স্প্যাস্টিকদের শিক্ষার ব্যয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই ব্যয় বহনভার কাঁধে চাপত দেশগুলিতেও প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে বহু বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। পশ্চিমবঙ্গ স্প্যাস্টিক সোসাইটি এই বিপুল সমস্যার সমাধানে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। স্প্যাস্টিক সোসাইটি ও স্প্যাস্টিক শিশুদের বাবা-মায় যতই আন্তরিক চেষ্টাই থাকুক না কেন সমাজ, সরকার ও জনসাধারণের কার্যকরী সাহায্য ছাড়া এদের পক্ষে সাফল্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। স্প্যাস্টিক সোসাইটি টীকা কালেক্‌শন, চ্যারিটি শো, এক আনীর দল গ্রহণ ইত্যাদি নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও তারা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে, এবং সরকার সাধ্যমত সাহায্য দেবার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্প্যাস্টিক সোসাইটি এখন একটি জমি এবং নিজস্ব বিল্ডিং-এর জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে।

স্প্যাস্টিকদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সুধা কৌল এক জায়গায় বলেছেন—"প্রত্যেক স্প্যাস্টিক শুধুই একটা সংখ্যা নয়। এর প্রত্যেকটি সংখ্যার পিছনে আছে একটি ক'রে পরিবার—সন্তানদের পূর্ণ বাস্তবায়িত দুটি জগৎ। সন্তানের জন্য তাদের আশা এবং দুরাশা।" সন্তানের জন্মের পরে যখন জন্মদাতা প্রথম বুঝতে পারেন তাঁদের সন্তান স্বাভাবিক নয় তখন কেবলমাত্র দুঃখের আঘাত আসে তাই নয়, ডাক্তার চিকিৎসক থেকে চিকিৎসকের দোরে। তারপর একদিন সেই বর্ণাতিক সত্য চূড়ান্তভাবে হয়—তাঁরা দুজনকে বলেন তাঁদের সন্তান কোনোদিনই স্বাভাবিক হবে না। সেদিনের সেই দুরাশা, নিজস্ব শিশুর জন্য দেওয়ার ক্ষমতা ও মর্মবেদনা বুদ্ধিশ্রেণী ছাড়া অন্যে পুরোপুরি সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ স্প্যাস্টিক সোসাইটি একটি কঠিন কাজে ব্রতী হয়েছে, আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে এদের সাহায্যে। এ সাহায্য শুধু আর্থিক নয়। মানুষের বিকলতা একটি করুণ নয়—সমাজ থেকে এই করুণ-মনোভাব দূর করতে হবে, প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে। শারীরিক ত্রুটির জন্য যেন এরা শিক্ষা ও নিয়োগ ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত না হয়। বহু বহু স্প্যাস্টিক উন্নত আশ্রয় না ঐ রকম কোন জায়গায় জীবন কাটায়। সবরকম সাহায্য পেলে এরা হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো, এইভাবে সৌভাগ্যে বাধ্য পঙ্গু জীবন যাপন করতে হ'ত না।

বিশেষ শিক্ষার এই কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল দুটি শিশুকে নিয়ে, এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২। এই ৪২ টি শিশুর বাইরে আরো কত দুর্ভাগা শিশুরাস্তার দুর্ভাগা সন্তান রয়েছে—তাদের জন্য কী ব্যবস্থা হবে, কবে হবে? আমরা মনে করি বিলম্ব অনেক হয়ে, আমার ঘটবে না। স্বয়ংক্রিয় এই তিতিক্ষীন আপ্তাদ আমাদের উল্লাসগীম করে—এটা পলায়নবৃত্তি। স্প্যাস্টিক শিশু যে কোন জায়গায়, যে কোন পরিবারেই জন্মাতে পারে, —গ্রাম-শহরে, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত। এটা কোন প্রকৃতির-গড় ত্রুটি নয়, পরিবেশগত কোনো রোগও নয়। একই পরিবারে দুটি স্প্যাস্টিক শিশু প্রায় দেখা যায় না।

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, যে দেশে সুস্থ সবল সক্ষমদের বেকার, সেখানে প্রতিবন্ধীদের চাকুরী দেওয়া বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রশ্ন আসে কেন? কথাটায় যুক্তি নেই তা নয়, তবু আসে—এবং সেটা আসে সামাজিক প্রয়োজনে এবং বিশেষ ক'রে মানবিকতার আবেদন থেকে। বহু শতাব্দী ধ'রে যে মানব-সভ্যতা আমরা গড়ে তুলেছি তারই সঙ্গে সৃষ্টি করেছি কিছু মূল্যবোধ। বুড়ো থেকে অথর্বে নিয়ে যায় যে চেতনা, যে উপলব্ধি, তারই সাথে জড়িয়ে আছে এই মূল্যবোধ যেখানে মানুষ পশু থেকে পৃথক। তাই বহু বেকার থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্ধবিদ্যালয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করি, বধিরদের কথা বলাবার চেষ্টা করি, এবং সর্বোপরি এদের পুনর্বাসনের কথা ভাবি। আজ এদের সাথে এসে হাত মিলিয়েছে স্প্যাস্টিকরা। এদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে, সমাজকে এদের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আগামী সংখ্যায়

নিরক্ষর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের শিশু শ্রমিক

রেণুকা চক্রবর্তীর গল্প উজান বেয়ে

ডঃ অমীয় মোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ বুদ্ধের জন্য বেতার

নতুন কর্মসংস্থানে খড়ের বোর্ড শিল্প

ডঃ জ্যোতির্ময় বসু রায় চৌধুরী

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার

সোমনাথ মিত্র

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন বিষয় নির্বাচন করে বিশ্বে জনস্বাস্থ্য শিক্ষাবোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। সাধারণতঃ উক্ত সংস্থা, সামাজিক WHO. প্রতি বছর জনস্বাস্থ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে নির্বাচন করেন। এ বছরের বিষয় হল Down with high blood pressure অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ নিপাত যাক।

বাস্তবিক পক্ষে ব্লাড প্রেসার কথাটা এত বেশী জনপ্রিয় যে কথা চালু হয়ে গেছে যে, প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায় 'প্রেসারের ঝোঁপে ভুগছি' অথবা 'আমার আবার হাই ব্লাড প্রেসারের দোষ' ইত্যাদি।

ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ সম্পর্কে কিছু বলবার আগে জানতে হবে ব্লাড প্রেসার জিনিসটা কি? আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত খাদ্য ও অক্সিজেন দরকার। শরীরের ভেতরে এগুলি সরবরাহ করে রক্ত। আর আমাদের হৃৎপিণ্ড বিভিন্ন শিরা ধমনিরার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত পৌঁছে দেয়। হৃৎপিণ্ড যে পরিমাণে চাপের সৃষ্টি করে সেই চাপকেই ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ বলে। চাপ ছাড়া শরীরে রক্ত চলাচল করতে পারেনা। অতএব বলা যায়, ব্লাড প্রেসার সব মানুষের শরীরে আছে। তবে এটা প্রয়োজন মাফিক হলেই ভালো। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হ'লেই হাই ব্লাড প্রেসার বা উচ্চরক্তচাপ এবং কম হলেই লো ব্লাড প্রেসার বা নিম্ন রক্তচাপ বলা হয়। এই চাপ যত কম বা বেশী হবে প্রেসারের তীব্রতাও তত কম বা বেশী হবে।

রক্তচাপ কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়। সময় সময় তার পরিবর্তন হয়। অনেকটা আবহাওয়ার পরিবর্তনের মতো। আমরা যখন উত্তেজিত বোধ করি তখন রক্তে চাপ খুব দ্রুত হয়। আবার বিশ্রামের সময় এই চাপ কমে যায়। রক্তচাপ বয়স অনুপাতে থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রেসার সর্বোচ্চ ১২০ থেকে ১৪০ মি: মি: এবং সর্বনিম্ন ৮০ থেকে ৯০ মি: মি: থাকে। সাধারণভাবে দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রক্তচাপ কম হয়। কারণটা অবশ্যই সাধারণ। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিকতর শান্ত ও সহনশীল হন। সেকারণে তাঁদের মধ্যে উত্তেজনাও কম থাকে। আর উত্তেজনা কম হ'লে রক্তচাপও কম হয়।

ব্লাড প্রেসার হ'বার কারণ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অন্যদিকে তেমন সামাজিকও। আমাদের আধুনিক জীবন-যাত্রা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। অত্যধিক পরিশ্রম ও চিন্তা রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আমরা প্রায়শই নানা কারণে উত্তেজনা বোধ করি। ট্রামে-বাসে খেলার মাঠে এমন কি শ্মশান ঘাটেও আমাদের উত্তেজনার প্রকাশ দেখা যায়। উত্তেজিত হ'লে অথবা বিশেষ কোন বিষয় আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিলে আমাদের রক্তচাপ বেড়ে যায়।

ধূমপান আজকাল একটা ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই ধূমপান আমাদের শরীরের মারাত্মকভাবে ক্ষতি সাধন করে। অত্যধিক ধূমপানে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

ব্লাড প্রেসার অনেক সময় বংশানুক্রমিক হয়। বাবা মার উচ্চরক্তচাপ থাকলে সাধারণতঃ তা ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায়। তাছাড়া অত্যধিক নুনযুক্ত বা বসে কাজ করার অভ্যাস রক্তবাহিকার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এসব-গুলিই উচ্চরক্তচাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক। মূত্রগ্রন্থি বা কিডনি এবং এনড্রোক্রাইন গ্রন্থির অনিয়মিত কাজও রোগের মধ্যে থেকে ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে দেয়।

হাই ব্লাড প্রেসার বা উচ্চরক্তচাপ হয়েছে আমরা বুঝবো কি করে? সাধারণতঃ এক-নাগাড়ে মাথাব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী অম্বল, শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি, পরিশ্রম করতে অসুবিধা, আলস্য, অলসতা, অনিদ্রা ইত্যাদি উচ্চরক্তচাপের এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কখনো বা কোনো লক্ষণ ছাড়াই উচ্চ-রক্তচাপ হতে পারে। সেকারণে চিকিৎসক দিয়ে নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করানো উচিত। আপনার স্বাভাবিক রক্তচাপ জেনে রাখুন। উচ্চরক্ত চাপ দেখা দিলে চিকিৎসা করান এবং সঠিকভাবে চিকিৎ-সকের পরামর্শ মেনে চলুন।

উচ্চ রক্তচাপ হলে অনেকগুলি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ধমনীগুলি শিরা উপশিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন এগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে পারেনা। হৃৎপিণ্ডে অত্যধিক চাপ পড়ায় তার স্বাভাবিক কার্যকরণে ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়া স্ট্রোক (Stroke), পক্ষাঘাত, হার্টফেল বা হৃদ-রোগাক্রান্ত অথবা কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নিয়মিত খাদ্য, স্বাভাবিক জীবন যাপন, শরীরের ওজন বেড়ে গেলে তা কমানো এবং নিয়মিত চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করানো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্রচুর বিশ্রাম, আরোম-প্রমোদ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। বিরক্তি ও উত্তেজনা রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ; সে কারণে এগুলি এড়িয়ে চলা উচিত। সংগীত-চর্চা, বাগান তৈরী অথবা কোরো-গ্রাফির মতো অভ্যাসগুলিও মানসিক উত্তেজনা হ্রাসের সহায়ক।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ

আসামের গোয়ালপাড়া শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে পুরে গ্রীসূর্য পাহাড়ে সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রীসূর্য পাহাড়ে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বিনয়তোষ ভ [illegible] সিদ্ধান্তে আধিকার করেন। অঞ্চলে ইতিপূর্বে ৬৫ মাইল বৌদ্ধ নিদর্শন আর পাওয়া যায় নি। [illegible] মাটি [illegible] (মৈরাকোটি) যে নিদর্শনটি [illegible] দুই [illegible] লিপি চারটি করে [illegible] টি পুরুষমূর্তি অঙ্কিত আছে। প্রতিটি পুরুষমূর্তি ত্রিভঙ্গমূর্তি। দেহের মধ্যে [illegible] মুখমণ্ডল উর্ধ্বদিকে এবং প্রতিটির

অন্তরীনদের বাচ্চাদের জন্য ক্রেশে। ফ্রেঞ্চ উইলিয়ামে অবস্থিত অন্তরীনদের যাঁরা কাজে বেরুবেন বা পরিবার কর্মসংস্থানকেন্দ্রে কোন প্রশিক্ষণে গেলে বাচ্চাদের নিরাপদে রাখার সমস্যা এড়াতে কেন্দ্রে একটি 'ক্রেশে' বা শিশুসদন খোলা হয়েছে। অন্তরীনদের কর্মসংস্থানকেন্দ্রের অনন্তের এই নতুন ব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শিবিরেও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আসামের গোয়ালপাড়ায় অন্তরে সম্প্রতি এই বৌদ্ধ নিদর্শনটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপরে পার্শ্বে অঙ্কিত একটি ছোট স্তূপ, প্রতিটি মূর্তির মাথার পিছনে গোলাকার দ্যুতিমণ্ডল। অধ্যাপক বে অনুমান করেন নিদর্শনটি খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের।

শ্রীসূর্য পাহাড়ে বৌদ্ধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আসামের এই অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছিল।

এই অঞ্চলে অধ্যাপক প্রীসের অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে শ্রীসূর্য পাহাড়ের অদূরে বরাদেব পাহাড়ে নাগর-রীতিতে তৈরী একটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং গোয়ালপাড়া শহরে দুটি পার্শ্বদেব ভাস্কর্যের। অধ্যাপক প্রীসের অনুমান, মূর্তি-দুটির একটি সম্ভবত একজন বৌদ্ধ দেবীর এবং অন্যটি শিশু পদ্মপাণির। প্রীসের মতে, এই সব নিদর্শন থেকে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে আরো অজানা তথ্য জানা সম্ভব হবে।

শ্রীসূর্য পাহাড়কে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের ভাণ্ডার আখ্যা দিয়ে অধ্যাপক প্রীস বলেন, শ্রীসূর্য পাহাড়ে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো দরকার। এই পাহাড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত সম্ভব হবে।

জানা অজানা

১। দ্বিতীয় ভারতীয় পতাকা কে, কবে এবং কোথায় উত্তোলন করেছিলেন?

২। বন্ধ কি একটি বাদ্য-যন্ত্র?

৩। (ক) চীতা বাঘ, (খ) ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া এবং (গ) সিংহ কত দ্রুতগতিতে চলতে পারে?

৪। বিশ্বে প্রথম এরোপ্লেন চালানো কৃতিত্ব কাদের?

৫। অকবরে 'পিন কোড' কবে চালু হয়েছে?

৬। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ সংঘ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নামে চাঁদের সাতটি গহ্বরের নামকরণ করেছেন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নাম কি?

৭। ভারতে মাত্র দুটি আগ্নেয়গিরি আছে। সেগুলো কোথায় রয়েছে?

৮। ইতিহাসে প্রসন্নটি কোথায়?

উত্তর ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

ভূতাত্ত্বিকের চোখে ঃ পশ্চিম বাংলার টাংস্টেন

সঙ্কর্ষণ রায়

টাংস্টেন একটি বিরল ধাতু। প্রকৃতি অকৃপণ হয়ে একে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দেয়নি। কিন্তু বিরলতা সত্ত্বেও এর চাহিদা অপরিসীম। বৈদ্যুতিক কারিগরী শিল্পে টাংস্টেন অপরিহার্য। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও ইলেকট্রিক বাল্ব-এর ফিলামেন্ট টাংস্টেন দিয়ে তৈরী হয়। এক টন টাংস্টেন থেকে তৈরী হয় প্রায় এক কোটি বাল্ব-এর ফিলামেন্ট। এ ছাড়া লোহার সঙ্গে টাংস্টেন মিশিয়ে তৈরী করা হয় বিশেষ কঠিন ইস্পাত, যা দিয়ে প্রস্তুত হয় চ্যাম্প, কারাম, মকেট, মিসাইল ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য মিশিয়ে প্রস্তুত হয় টাংস্টেন কার্বাইড যা প্রায় হীরের মত শক্ত। টাংস্টেন কার্বাইডের কঠিনত্বের জন্য তা দিয়ে তৈরী করা হয় কাটবার ও ড্রিলিং করার যন্ত্রপাতি।

বিভিন্ন রকম চাহিদার অনুপাতে টাংস্টেন-এর উৎপাদন খুবই কম হয়ে থাকে, কাজেই এর দাম খুবই চড়া। তার এখনকার বাজার দর টনপ্রতি এক লক্ষ টাকাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

পশ্চিম বাংলার এ দেন দামী ধাতুর অস্তিত্ব সত্যিই চমকপ্রদ। শুধু যে আছে তা নয়, বীতিমত খননযোগ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে পুরুলিয়া জেলার বাঘমা-নাদার মধ্য দিয়ে প্রসারিত শিলা-কৃন্তন ক্ষেত্রের (Shear zone) পূর্ব প্রান্তে বাঁকুড়া জেলায় পাঁচটি টাংস্টেনের সন্ধান করেছে খান-পাহাড়, চেলা-ডুংরী, পূর্বপানি, বহুড়ি ও বাটুলোল-এ নীচু শিরির আকারে।

টাংস্টেন-এর তিন রকম আকর সাধারণত অল্পাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। টাংস্টেনযুক্ত মূল আকর দুটি হচ্ছে উলফ্রামাইট ও শিলাইট (wolframite and Scheelite) এবং তৃতীয় আকরটি হচ্ছে উলফ্রামাইট অবক্ষয় হয়ে সৃষ্ট হওয়া টাংস্টেন ওকার (tungsten ochre) বা ফেরি-টাংস্টাইট (ferri-tungstite)। ভারবাহ আকরের উলফ্রামাইট পুরোপুরি ক্ষয়ে গিয়ে শুধু লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ অবশিষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য, এই লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ উলফ্রামাইট-এর মধ্যে টাংস্টেন-এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। শিলাইট ক্যালসিয়াম-যুক্ত টাংস্টেন মোলাইড-এর শিরার সঙ্গে এমনিভাবে মিশে থাকে যে খালি চোখে তাকে চেনা যায় না। একে খুঁজে বের করার জন্য একটি মজার পদ্ধতি আছে। অন্ধকারে তার ওপরে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেললে তা খাঁটির চোখের মত জ্বল জ্বল করে। তাতে আলট্রা-ভায়োলেট লাগান টর্চ নিয়ে শিলাচত্বরে মত ঘোরাঘুরি করে ভূতাত্ত্বিকরা শিলাইট-এর সন্ধান নেন।

যে কৃন্তন-ক্ষেত্রের আলমের পথ বেয়ে বাঁকুড়া জেলার চেলাপাথর, বাটুলোল ও বহুড়িতে টাংস্টেন-এর সন্ধান ঘটেছে তা এই ছোট এলাকাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কৃন্তন-ক্ষেত্রটির দক্ষিণ পুরুলিয়া জেলায় বাঘমা-নাদার কাছে, কাজেই বাঘমা-নাদা এবং চেলা-পাথরের মাঝামাঝি এলাকার মধ্যেও টাংস্টেন-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন ভূতাত্ত্বিকেরা। এই অনুমানের প্রেরণায় তাঁরা সমীক্ষাও চালিয়েছেন। সমীক্ষার ফলে বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলির কাছে ক্যালক সিলিকেট (Calc-Silicate) পাথরের মধ্যে শিলাইট পাওয়া গিয়েছে। সমীক্ষা অবশ্য সম্পূর্ণ হয় নি, কাজেই ঝিলিমিলিতে টাংস্টেনের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে এইটুকু বলা যায় যে এই কৃন্তন-ক্ষেত্র বরাবর ঝিলিমিলি থেকে চেলাপাথর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় টাংস্টেনের সম্ভাবনা আছে।

চেলাপাথরে চেলাডুংরি, খান-পাহাড় ও পূর্বপানিতে টাংস্টেনের আকরের ভাণ্ডারের মধ্যে নির্দিষ্ট খনন করে বছরে প্রায় মাথা টন করে টাংস্টেনের আকর, অর্থাৎ টাংস্টেনযুক্ত উলফ্রামাইট ও শিলাইট বের করা হচ্ছে। উলফ্রামাইট ও শিলাইট-এর মধ্যে টাংস্টেন-এর

উচ্চমানের টাংস্টেনের আকর বের করতে গিয়ে প্রভূত পরিমাণে নিম্নমানের ফেরি-টাংস্টাইট খনন করে ফেলে দেওয়া হয়। এই ফেলে দেওয়া পাথরের মধ্যে টাংস্টেনের পরিমাণ থাকে শতকরা ০.০৬। ফলে পাশে এই ফেলে দেওয়া পাথর উঁচু গিরি সৃষ্টি করেছে।

উচ্চমানের টাংস্টেনের আকর বের করতে গিয়ে নিম্নমানের আকর ফেলে দেওয়া রীতিমত অপচয়। এই অপচয় নিবারণ করতে হলে নিম্নমানের আকর থেকে টাংস্টেন নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কার করতে হবে। তার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল দুর্গাপুরের রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্নমানের সূক্ষ্ম-

ধলিচ গ্রামের আকর—পাথরের স্তর

তাকে অবশ্যই চাংস্টেনকে চোখে-পড়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

ভেলাপাথর অঞ্চলের উত্তরে আর একটি চাংস্টেনযুক্ত অঞ্চল আছে। এটি আর একটি কৃন্তন-ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। এই কৃন্তন-ক্ষেত্র বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে—এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো আকরিক ধাতুর ভাণ্ডার—যার অনেক অংশ আগ্নেয়ক্ষেত্র বলা চলে। খাতলা পাথরের অনুরূপ আগ্নেয়ক্ষেত্রের পাশাপাশি পোড়া পাথরের কোয়ার্টজাইট (Quartzite) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাংস্টেন-যুক্ত কোয়ার্টজ-এর শিরা-উপশিরা। কোয়ার্টজাইট-এর সঙ্গে কোয়ার্টজ-এর শিরা-উপশিরার সম্মিলনকে স্টকওয়ার্ক (Stock-work) বলা হয়। এই স্টক-ওয়ার্ক-এর মধ্যে খনন চালিয়ে কয়েক মিটার অন্তর অন্তর টনালমাইট-শিলাইট-এর শিরা এবং তাদের ফাঁকে ফাঁকে কেরি-চাংস্টোইট-এর চলনে-সবুজ রঙের আস্তরণ মিলেছে। পোড়া-পাথরে হয়তো কাজ বন্ধ হবে যাওয়ার পরও স্টক-ওয়ার্কের পূর্ণ বিস্তার এবং মাটির কতটা নীচে পর্যন্ত চাংস্টেন-যুক্ত স্টক-ওয়ার্ক বিস্তার করছে তা জানা সম্ভব হয় নি।

এই কৃন্তন-ক্ষেত্রের মধ্যে কেবলমাত্র যে পোড়াপাথরই চাংস্টেনের ভাণ্ডার বহন করছে তা হতে পারে না। আর মধ্যে আকরযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের প্রমাণ দেখে ভূতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে চাংস্টেনের ভাণ্ডারও অনুরূপভাবে এই কৃন্তন-ক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়ে সম্প্রতি ওঁরা চাংস্টেনের লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন ঘাটশিলার পূব দিকে কোয়ার্টজ-টুরমেলিন (Quartz-tourmaline) পাথর যা শর্ল বকস-এর (School-rocks) মধ্যে। এই কৃন্তন-ক্ষেত্রের মধ্যে আরও কয়েকটি শর্ল বকস-এর পাহাড় আছে। এদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে চাংস্টেনের খনন্যোগ্য ভাণ্ডার খুঁজে বের করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

সম্প্রতি ধানবাদ জেলার পার্থডা অঞ্চলেও চাংস্টেন-এর আকরের লক্ষণ দেখা গেছে। কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী ভূপ্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে বলেন যে বার্মা-থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়ার মত পূর্ব হিমালয়েও সীসা, দস্তা, টিন, চাংস্টেন, তামা প্রভৃতি ধাতুর সম্ভাবনা রয়েছে। ওঁদের অনুমানের সত্যতা বছর পাঁচেক আগে সীসা-দস্তা-রূপার ভাণ্ডার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ধানবাদ জেলার গোকুলখান অঞ্চলে সীসা-দস্তা-রূপার মোটামুটি একটি বৃহৎ অঞ্চল ভূপ্রাকৃতিক সমীক্ষার সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। সীসা-দস্তা-রূপা পাওয়ার পর ভূতাত্ত্বিকরা চাংস্টেনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও আশান্বিত হলেন। ধানবাদ জেলার অন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন একটি চাংস্টেনের লক্ষণ। যদিও আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন এই চাংস্টেনের আকরের খননযোগ্যতা প্রমাণের জন্য, তবু এর সম্ভাবনা সম্পর্কে ওঁদের অনেক আশা।

ধানবাদ জেলায় চাংস্টেনের আকরের খননযোগ্য ভাণ্ডার আছে কি না এর সঠিক হদিশ এখন পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও বাঁকুড়া জেলায় চাংস্টেনের ভাণ্ডারগুলির, অন্ততপক্ষে তিনটির, খনন-যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমটি হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার ভেলাপাথরের চাংস্টেনের ভাণ্ডার—এখানে বহু বছর ধরে নিয়মিত খনন চলছে। দ্বিতীয়টি বুরুডির চাংস্টেনযুক্ত খনিজের সকল—এখানে পরীক্ষামূলকভাবে খনন করা থাকলে খনির মাকার দেওয়া যায়। তৃতীয়টি পোড়া পাহাড়ের চাংস্টেনের ভাণ্ডার। এখানে যে পরীক্ষামূলকভাবে খনন করা খনি রয়েছে, তাকেও একটি খনিতে রূপান্তরিত করা চলে অনায়াসে।

চাংস্টেন খুবই মূল্যবান ধাতু, মূল্যবানের পরিপ্রেক্ষিতে তার এক কথাকেও উপেক্ষা করলে চলবে না। পশ্চিম বাংলার যেখানে যতটুকু থাক, তাকে আহরণের চেষ্টা করতেই হবে।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার

১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

রোগব্যায়াম উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত রোগব্যায়াম করা খুব একটা অসুবিধা জনক কিছু নয়। অথচ স্বাস্থ্যরক্ষায় রোগ-ব্যায়াম বিরাট ভাবিয়ার।

প্রত্যেক মানুষের নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। নিয়মিত খাদ্যের তালিকায় কাঁচা শাকসব্জী, ডাল, মসুর এবং অল্প পরিমাণ লবণ থাকবে। শ্বেতসার, চিনি, অতিরিক্ত মশলা, আচার ও চাটনী জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা উচিত।

প্রয়োজনবোধে উচ্চরক্তচাপ রোগের জন্য সারাজীবন ওষুধ খেতে হতে পারে। ব্লাডপ্রেসার রোগ প্রতিরোধ করার থেকে অবশ্য অধিকতর সহজসাধ্য প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির সাহায্য নিতে পারি। এস সব মানুষই বীরবিক্রমে একটু ঘুরে চললে রক্তচাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

মহিলা মহল

জ্ঞানের সভ্যতার উষালগ্নে সামাজিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে পরিবার ছিল মাতৃপ্রধান। কিন্তু ধীরে ধীরে পুরুষরাই সেই সমাজকে পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরিত করে নারীর জীবনের স্বাধীনতা হরণ করলো। তারপর শাস্ত্রকার মনু নারীর জীবনের বাকী স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়ে সগর্বে ঘোষণা করলেন রমণীর যাগযজ্ঞে বা কোনরূপ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে অংশ নেবার অধিকার নেই। মানব সভ্যতার অনেক বিবর্তন ঘটলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সাধনা রমণীর জীবনে আর্থ নতির হয়েই রইলো। ধীরে ধীরে নারী হয়ে উঠলো আসবাবের মতোই পুরুষের জীবনে শুধুমাত্র বিলাস ও ভোগের উপকরণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক বনিয়াদে যখন ভাঙন ধরল তখন চাল বজায় রাখার জন্য নারী পেল জ্ঞানের অধিকার। অনুভব করলো অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে বাই নারীকে প্রায় সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিল। তথাপি বহুবিধ কারণে আজও সমাজের বুকে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা নানাভাবে অসহায় হয়ে পড়ছে।

ভাববেও আশ্চর্য হতে হয় যে, আমাদের ভারতবর্ষে ১-১৫ বছরের অসহায় শিশুর সংখ্যা ১১ লক্ষ। অবশ্য এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ে দুই-ই আছে। সাধারণত দেখা যায় নিম্নলিখিত কারণে ১-১৫ বছরের মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়ে :—

(১) অল্পবয়সের অবিবাহে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ এবং সেই সময়ে পারস্পরিক ও পারিপার্শ্বিক মানসিক পরিবর্তনের অভাব। (২) আধুনিক সমাজে পিতামাতার মধ্যে স্থায়ী বিবোধের ফলে সন্তানদের হেফাজত এবং ভরণপোষণ। (৩) অনেক মায়ের কলঙ্কের সংসর্গে বাঁচতে চাইলে সামাজিক বাধা। (৪) জন্মের সম্মান। (৫) চাকুরীজীবী মায়ের সন্তানেরা। (৬) পিতার অবর্তমানে সংসারে অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার লোক না থাকায় শিক্ষার সুযোগের অভাব।

অসহায় নারী

প্রথমেই মনে রাখা উচিত, জীবনের এই সমস্যা বিকশিত হবার। তাই এই সময় সুস্থ ও স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশ বাস্তবিক কোন মেয়েই আগামী জীবনে সুসন্তানের জননী হতে পারে না। মা-বাবের অবর্তমানে পিতৃমাতৃহীনা কন্যার স্নেহভালবাসার বিশেষ প্রয়োজন মেয়েদের জীবনে। আর জীবনকে মানবিকতা বোধে বিকশিত করতে প্রয়োজন সুশিক্ষার। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মাধ্যমিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। এই প্রথা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে প্রবর্তিত হওয়া উচিত। এই শিক্ষার সঙ্গে এমন কিছু কারিগরী শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার দ্বারা এইসব কিশোরী মেয়েরা জীবনে অসহায়তা অনুভব না করে নিজের জীবিকা নিজেই নির্বাচ করতে পারে। তাছাড়া বিপথগামী এবং পিতৃমাতৃহীন অসহায় মেয়েদের জন্য দেশে অনাথাশ্রমের গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা চালু হওয়া সত্ত্বেও অসুখী দম্পতির সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। ফলে, ধনী হলেও জীবনের প্রতি হতাশাবাদী একদল উচ্ছৃঙ্খল ভবিষ্যৎ বংশধর তৈরী হচ্ছে। একজন বিপথগামী মানুষের কলঙ্ক যদি মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায় তবে সমাজকে তাকে সে অধিকার দিতে হবে। সন্তানদের চাকুরীজীবী মায়েদের জন্যে আরও অধিক সংখ্যায় ক্রেচ খুলে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই বয়সে একটি মেয়ে সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার অভাবে যেই অভীষ্টের মতো আজও যে তুলসীর পা বাড়িয়ে পুরুষের ভোগের শিকার হতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৫-১৯ বছর বয়সের অসহায় মেয়েরা। এই বয়সটা কর্মের। সমাজে ও ঘরে এই বয়সীদের মেয়েরা নানা কারণে অসহায় হয়ে পড়ে। যেমন,

(১) দেশবিভাগের ফলস্বরূপ আর্থিক পরিস্থিতির ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ। (২) যৌবনের উন্মাদনায় কোন ছেলের সঙ্গে বাড়ী থেকে পালানোর পর তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অসহায়তা। (৩) স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। (৪) মাতার স্বামীর অত্যাচার এবং পুরুষবাড়ীর নিষেধ।

বর্তমানে গ্রাম ও পল্লীর অধিবাসিনী মেয়েদের অল্প সময়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার জন্যে একটি কনডেন্সড্ কোর্স চালু করা হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি অসহায় নারীদের শিক্ষিত করে তোলবার পক্ষে খুবই কার্যকরী প্রথা। এই রকম প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেখাবার জন্যে সেদিন গিয়েছিলাম বর্ধমানে শিবদুর্গা সমিতিতে। এ বছরে ১৬টি মেয়ে ওখান থেকে এই কোর্সে পরীক্ষা দিচ্ছে। বয়স সকলেরই ১৮-র উর্ধ্বে। বেশীর ভাগই জীবনে পোড়খাওয়া মেয়ে। কিন্তু অন্ধকার জীবনে শিক্ষার আলো পেয়ে তারা জীবনসায়াহ্নটা পালটে গেছে। প্রতিষ্ঠানটি চলছে সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানে। এই শিক্ষার সঙ্গে নানারকম হাতের কাজ শিক্ষা দিয়ে

মেয়েরা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। অসহায় মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শিখা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলবার প্রতিষ্ঠান কমলাদেবী পুণ্যাশ্রম। এটি গড়ে তুলেছিলেন নেত্রকোণার মাইনর স্কুলের হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা কমলা দেবী। বর্তমানে এটি দেখাশুনা করছেন তাঁর কন্যা বিদুষী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য। সরকারী অনুদানে গড়ে উঠেছে এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি। অসহায় মেয়েদের জন্য শ্যামমোহিনী দেবী গড়ে তুলেছেন মানিক-গঞ্জের বাণীপীঠ স্কুল। এই স্কুলে দুঃস্থ মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে ছাত্রীনিবাস আছে। এছাড়া গ্রামে ও শহরে মহিলাদের জন্য আরও অধিক সংখ্যায় আবাস গড়ে তোলা উচিত।

লেখাপড়া শিক্ষা ছাড়া এইসব মেয়েদের হাতের কাজের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। এইজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যেখানে হাঁড়িকোনা, বেত ও বাঁশের কাজ, এবং আরও নানাবিধ হাতের কাজ নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। শুধু শিক্ষা নয়। শিক্ষার্থীর উৎসাহ বাড়াবার জন্য শিক্ষান্তে একটি সার্টিফিকেট দিলে ভাল হয়। সরকারী প্রকল্প ছাড়াও একটি অসহায় মেয়ে নানা ভাবে নিজের জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে বলে আমার ধারণা। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছাপাখানার কম্পোজিং-এর কাজ। হাতের লেখা ভাল হলে লেখক-লেখিকার লেখা নকল করে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা, গল্প বুলবনে ছোটখাটো ব্যবসা করে তোলা যেমন খাবারের হোটেল, নকল গয়নার দোকান, ম্যাগাজিন হোম, লুলাকাঠির দোকান। এর জন্য সামান্য মূলধন প্রয়োজন। এছাড়া একটু চালাক চতুর হলে এবং চটুল কায়দাকানুন রপ্ত করলে সেলস গার্ল এবং রিসেপশনের চাকরী করে অসহায় মেয়েরা বেশ আরামেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

১৫ বছরের পরিবারে পড়েন ৪৫-এর উর্ধ্বে মেয়েরা। সরকারী বিচারে এদের কর্ম-হীন বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে, এধুকি কোনকালেই খাটে না। বিশেষ করে সরকারী চাকরীর পেনসনের বয়স যখন ৫৮ বছর।

এই বয়সের মেয়েরা নিম্নলিখিত কারণে অসহায় হয়ে পড়েন :

(১) স্বামীর অকালমৃত্যু। (২) সংসারে কোনরূপ আয়ের ব্যবস্থা না থাকা. (৩) পুত্রদের স্বার্থপরতা। (৪) পুত্র কন্যা না থাকা। (৫) পারিবারিক বিরোধিতা।

আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমাদের দেশের অনেক সন্তানদের কাছে

বিধবা মা বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাই পাশ্চাত্য কালচার দেখা দিয়েছে মায়ের সঙ্গে ভিন্ন হওয়া। অথচ আমাদের এই দেশেই বলা হয়েছে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। পুত্রদের স্বার্থপরতার জন্য সেই মা অসহায় হয়ে পড়ছেন. যদি না তাঁর জন্য স্বামী আর্থিক সঙ্গতি রেখে যান। সুতরাং জীবনের জন্য এই বয়সের মেয়েদেরও জীবিকার পথ খুঁজে নিতে হবে।

কিছুদিন আগেকার কথা। দুপুরে গ্রামের পথ দিয়ে চলেছি। দেখলাম, একপাল হাঁস বুড়ী বেদিয়ে নিয়ে চলেছে এক বুড়ী। বুড়ী বললে, আমার নাম ছিন্নের মা। কি কোথায় বর বিধি। সাতকুলে তো কেউ নেই। বিধবা-পরি যা ছিল তা আত্মজনেরা ঠকিয়ে নিয়েছে। তাই বাবুদের বাড়ী বাসন মেজে কিছু পয়সা জমিয়ে এখন হাঁস বুয়রী পালি। বর করে বুড়ী আমার ভার চালাঘরে নিয়ে গেল। লেখলাম. সুন্দর গোলাই গড়ে তুলেছে। গ্রামের ছাটে ডিম চালান দেয়।

শুধুমাত্র গোলাই নয় বয়স্কা অসহায় মহিলারা আরও নানাভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারেন তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে। শহরে ও গ্রামে যে অসংখ্য মহিলা সংস্থা আছে সেই সব সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বয়স্কা মহিলারা সহজেই এগিয়ে আসতে পারেন জীবনে অভিজ্ঞতার দাবির নিয়ে। এছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও বস্তিবাসী জন-সাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিতে পারেন এবং এই শিক্ষার জন্য যদি মাধ্যমিক নামমাত্র মূল্য ধার্য্য করেন তাহলে এদ্বারা তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। স্কুল, কলেজ এবং অফিস পাড়ায় টিফিনের খাবার সরবরাহ করে একজন অসহায় প্রবীনা মহিলা যে বেশ ভাল আয় করতে পারেন সে সম্পর্কে ধারণা হল রমাদির সঙ্গে পরিচিত হবে। প্রবীনা একমাত্র পুত্র নিয়ে ৪৬ বছর বয়সে স্বামীকে হারান। তারপর আত্মীয় ও বন্ধুদের সহযোগিতায় সুরু করেন অফিস পাড়ায় এই ব্যবসা। সেই ছেলে আজ ইঞ্জিনীয়ার। এছাড়া নানারকম হাতের কাজের দ্বারা বয়স্কা মহিলারা অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদন করে থাকেন। অবসরে অনায়াসে হল পাঁপড়, বড়ি ও আচার তৈরী করা, ঠোঙা বানানো, বই বাঁধানো, নারকোল ছোবড়া, বেত ও মাটির নানারকম প্রয়োজনীয় ও সৌখীন জিনিসপত্র তৈরী করা।

এক কথায় এ পৃথিবীতে কেউই অসহায় নয়—নিজের আত্মাকে গড়ে তুলতে হয় কর্মের দ্বারা। নয় কি?

হেনা চৌধুরী

খেত খামার

কাঁঠালি গাছে আম ভাল হয় না। তাই না-ও হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দেখা যায়। ভাল কুলের আঁটির গাছে দেখেছি ভাল কুল হয় না। কলমের গাছে বড় আম হয়, মিষ্টি আম হয়। কলমের কুল গাছে বড়, মিষ্টি কুল হয়। অবশ্য আঁটির গাছে আম বা কুলের সংখ্যা অনেক বেশি হয় প্রায় ক্ষেত্রেই।

বীজ থেকে যে শশা হয় তাও তাড়াতাড়ি গাছে, ফলেও প্রচুর। কিন্তু খুব বড় আকারের শশা, যাকে 'লাউ-শশা' বা 'বাকুড়ে-শশা' নাম দেওয়া যেতে পারে, তা বীজের গাছে হয় না।

শশা সচরাচর দু-জাতের দেখা যায়। বাচাল শশা আর নেড়ী শশা। আমাদের আলোচনা বাচাল শশা নিয়ে। কেননা, নেড়ের শশাকে পরীক্ষা ক'রে দেখিনি। বাচাল শশা স্বভাবতই আকারে বড় হয়। তিনশো, চারশো বা পাঁচশো গ্রাম। তার বেশি বড় একটা চোখে ঠেকে না। তাও তখন থেকে যায়। কাঁচা খাওয়া যায় না।

কিন্তু সরু কাঁচি শশা কি দেড় দু-কিলো বা তারও বেশি হতে দেখেছেন? আমরা দেখেছি—বনেবালির জনৈক চৌধুরী মশাইয়ের বাগানে। দেখেছি নলনবাটীর এক চাষীর খামারে। দেখে সন্দেহ হয়েছে, শশা তো? নাকি শশা বেশধারী লাউ? হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার গাঁওগঞ্জের বাড়ীতে এক রকমের লাউ দেখেছি, যা দেখতে অনেকটা খুব বড় শশার মত। ওরা বললেন, না, এগুলি সত্যিকার শশা। খেয়ে দেখুন। চৌধুরী মশাই একটি শশা তুলে সামনে চাড়িয়ে সকলকে খাইয়ে দিলেন। আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকলো না।

এখন আসুন, আপনিও এমন লাউ-শশা বা বাকুড়ে শশা আপনার বাগানে ফলাতে পারেন কিনা দেখুন। এর জন্য বাড়তি কোন খরচ নেই। শুধু বিশেষ যত্নে বীজ সংগ্রহের সময়টা নেই। তিনি-চারটি আপনি আপনার বাড়ীতে বা আত্মীয়স্বজনের খেয়ে যাবেন। চাই কেউ বেরোবে।

লাউয়ের মত শশা ফলান

কয়েকটি মাচার শশার চারা আপনার বাগানের নিচুই চাষযোগ্য সময় মতো লাগান। অবশ্যই ভাল জাতের শশার বীজ হওয়া চাই। এবার প্রতিটি বীজের দশ ঝাড়ো উঁকি তফাতে তফাতে একটি ক'রে লম্বা লম্বা জাতের গাঁড়বীজ পুঁতে দিন। বীজ অঙ্কুরিত হলে উপযুক্ত পরিচর্যা করে গাছগুলিকে বাড়তে সাহায্য করুন। উক্ত লতা যখন হেড দু-চুট ক'রে উঁচু হয়ে যাবে, তখন পাশাপাশি একটি বাঁশের ও একটি শশা গাছ টেনে দিন। পাশাপাশি লাগিয়ে দেখুন, তাদের কোন্ কোন্ অংশ গায়ে গায়ে ঠেকে। তারপর কিছু নীচে, যেখানে পরস্পরের গা ঠেকেছে, সেই অংশ ছুরী দিয়ে ঘষি দিয়ে খানিকটা খানিকটা চেঁছে দিন। আঠা ঝরতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থায় লতা দুটি বাংলার মত পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ক'রে, চাঁচা জায়গাগুলো লাগিয়ে বেশ ঘন ক'রে নরম পট্টি জড়িয়ে দিন। এমন এক জোড়া নয়। অন্তত পাঁচ সাত জোড়া। কেন, পরে বলছি।

বলা হবে নিয়মিত জল দিন। বেশ-ছায়া না থাকলে দুপুরের কড়া রোদ্দুরের সময় ওদের ওপর কিছু ছায়া সৃষ্টি করতে পারলে ভাল হয়। তবুও দেখবেন দু-এক জোড়া গাছ মরে যাবে হয় তো। বেশ কিছু দিন নজর রেখে যান। দেখবেন ওগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেছে। এবার লাউ গাছের ডগা এবং শশা গাছের গোড়া কেটে দিন। এবারে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। কিন্তু অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটি নিশ্চয়ই টিকে যাবে। সেই জন্যেই অনেক জোড়া গাছ লাগাতে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু, বড় দুঃখের কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রোফ্টিং বা এনারুয়েসিস প্রয়োগ করে এই কলম বাঁধা বা গ্রাফটিং-এর কাজ করতে পারলে গাছ মরে কম। তবে

কয়েকটি মাচার শশার চারা আপনার বাগানের নিচুই চাষযোগ্য সময় মতো লাগান। অবশ্যই ভাল জাতের শশার বীজ হওয়া চাই। এবার প্রতিটি বীজের দশ ঝাড়ো উঁকি তফাতে তফাতে একটি ক'রে লম্বা লম্বা জাতের গাঁড়বীজ পুঁতে দিন। বীজ অঙ্কুরিত হলে উপযুক্ত পরিচর্যা করে গাছগুলিকে বাড়তে সাহায্য করুন। উক্ত লতা যখন হেড দু-চুট ক'রে উঁচু হয়ে যাবে, তখন পাশাপাশি একটি বাঁশের ও একটি শশা গাছ টেনে দিন। পাশাপাশি লাগিয়ে দেখুন, তাদের কোন্ কোন্ অংশ গায়ে গায়ে ঠেকে। তারপর কিছু নীচে, যেখানে পরস্পরের গা ঠেকেছে, সেই অংশ ছুরী দিয়ে ঘষি দিয়ে খানিকটা খানিকটা চেঁছে দিন। আঠা ঝরতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থায় লতা দুটি বাংলার মত পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ক'রে, চাঁচা জায়গাগুলো লাগিয়ে বেশ ঘন ক'রে নরম পট্টি জড়িয়ে দিন। এমন এক জোড়া নয়। অন্তত পাঁচ সাত জোড়া। কেন, পরে বলছি।

বলা হবে নিয়মিত জল দিন। বেশ-ছায়া না থাকলে দুপুরের কড়া রোদ্দুরের সময় ওদের ওপর কিছু ছায়া সৃষ্টি করতে পারলে ভাল হয়। তবুও দেখবেন দু-এক জোড়া গাছ মরে যাবে হয় তো। বেশ কিছু দিন নজর রেখে যান। দেখবেন ওগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেছে। এবার লাউ গাছের ডগা এবং শশা গাছের গোড়া কেটে দিন। এবারে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। কিন্তু অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটি নিশ্চয়ই টিকে যাবে। সেই জন্যেই অনেক জোড়া গাছ লাগাতে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু, বড় দুঃখের কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রোফ্টিং বা এনারুয়েসিস প্রয়োগ করে এই কলম বাঁধা বা গ্রাফটিং-এর কাজ করতে পারলে গাছ মরে কম। তবে

কি নাম দেবেন এই সবের জন্মটির? বাকুড়ে-শশা? লাউ-শশা? না কি হুকুমের বাবের দুটি শব্দের চাপে লাউ-শশা 'লাশা'? বিষয়টি আপনি চিন্তা করুন। আর কি ভাবছেন? এর বীজ থেকে অমনি বড় শশা হবে কি না? বেশ তো পরীক্ষা ক'রেই দেখুননা। তবে মতভেদ হবে না। ফলনের নিশ্চয়ই হবে।

দীনবন্ধু ছাত্রা

শিল্প সংস্কৃতি

জোস্নালি আবেদের ঘরা ডবল পরনার মতো ঝাপসা হ'য়ে আসা দুইকে মাথার পেছনে রেখে হাসানমোল বাল গাঁয়ের থেকে গোলাপিনী, চুকলিয়ার বিনিবাস করেছিলাম।

ঠাসাঠাসি ভীড়, গাদাগাদি করা মানুষজন—সবাইকে পিছে রিনিট পঁচিশেক হাঁটার পর পৌঁছলাম চুকলিয়ায়। পেয়ারা রংয়ের ওড়নির মতো গোলাপিনী রোড যেখানে দু'ভাগ হয়েছে সেখানে নেমে পড়েই হাঁটতে শুরু করেছি।

চুকলিয়া এখেনি নজরুল মেলা দেখছে। চল্লিশ থেকে ত্রিশের যে পঞ্চাশ নজরুলের ১২৩তম জন্মদিন উপলক্ষে এই মেলার আয়োজন করেছেন নজরুল একাডেমী। হাঁটতে হাঁটতে নজরুল একাডেমীর ছোট সোতলা বাড়ি ডান দিকে রেখে মেলার পেটের ভেতর ঢুকে পড়েছি। আর পাঁচটা গ্রামীণ মেলার মতোই এখানেও নানান দোকানে পসরা সাজানো।

কবির স্মৃতিগ্রাহী জোড়াবট—'হাকুত' 'হাকুত', ভীম মস্তিজের পাশে তাঁর বাণী ও ছবি দিয়ে একটা চিল্লতে প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছে। তারই পা ঘেঁষে যুবকল্যাণ সমবের স্টলে বিক্রীর জন্যে ঝাঁকুড়ার পাকড়া, কাঠের মোড়া সাজানো রয়েছে। একজোড়া কাঠের ফুলে ঘাঁড়ের দামই তিরিশ টাকা। কাঠের বগেল, কাঠের পাখিও স্টলে সাজিয়ে বেখেছেন ওঁরা। কালনার উপজাতিদের হাতে তৈরী চুরুটি, কাঁসাও বিক্রীর জন্যে রাখা হ'য়েছে।

পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানই হ'য়েছে মেলা প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে। মঞ্চের পাশেই মাটির ওপর চটপাতা, পেছনেচেকরেচৌকের কাছ থেকে ভাড়া করা চেয়ার। লোক-জন সন্ধ্যে না হ'তেই উপচে পড়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। নজরুলের যৌবন বয়সের একটা আবক্ষ অয়েলপেন্টিং পেছনে রেখে শিল্পীরা গাইতে বসেছেন। গুণী জনেরা বক্তৃতা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। নাটক যাত্রা অভিনীত হ'য়েছে। তবলা, বেহালা গানের আসর বসেছে।

লোডশেডিং-এর ভূত প্রায়ই এসে অনুষ্ঠানের ঘাড়ে চেপেছে। হ্যালাক হ্যাবিকেন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সেবিকারা ছোটাছুটি ক'রেছেন। মঞ্চে ডাক্তারবাবু

ফুলের জলসায় কবি

আলো জ্বলেছে, মাইক বেজেছে। আঠাশ ত্রিশিরের অনুষ্ঠান বজ্রবৃষ্টির জন্যে ঘাতে লুচো নাগাদ ভেঙে গিয়েছে। তিরিশের বিকেলেও প্রবেশে প্রবল ঝড়। ঝুকে আবিরের মতো উড়েছে লাল ধুলো। ন্যাশনাল ছবির অলসাগানের মতো মাথা নেড়েছে তালগাছেরা ক্ষ্যাপা হাওয়ার সঙ্গে 'তাল' মিলিয়ে।

উনত্রিশের রাতে স্বপ্নতা সরকার অদাধারণ গলায় গাইলেন চারখানা নজরুল গীতি। তাঁর 'অতলান্ত রোদ—' গজীত গোলাপ হ'য়ে ঝরে পড়েছে কবির কবরের মাটির ওপর।

অদ্ভুত লাগা দেখেছি সাধারণ মানুষের মধ্যে। এ মেলা যেন এক নতুন জোয়ার এনেছে তাঁদের জীবনে। মিলন ঐক্য মাতৃত্বের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে এই মেলা। হিন্দু-মুসলমান ভাইবোনা সমস্ত কিছু সাম্প্রদায়িক ভোতেক ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছেন এবেলাকে কেন্দ্র ক'রে। অদ্ভুত উৎসাহ নিয়ে কাজ করছেন সবাই। দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়। আসলে নজরুল সমস্ত জীবন দিয়ে একটা যুদ্ধ লড়েছিলেন কুসুম—হিন্দুমুসলমানকে জুড়িয়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজের জীবন

দিয়েও তিনি তাই ক'রে গেলেন। এপারে তাঁর জন্মভূমিতে শ্রী প্রবীলা কাজীর সমাধির পাশে রইলো তাঁর কবরের মাটি। দেশ রইল ওপার বাংলায়। নজরুল যেন এপার-ওপারের সেতুবন্ধন হ'য়ে রইলেন চিরকালের মতো। প্রবীলা কাজীর কবরের পাশে দাঁড়াতে হ'তে একথাই মনে পড়েছে বারবার।

এ বেলাতে রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য প্রদান সঙ্গে স্মরণ করবেন একাডেমীর সম্পাদক কাজী রেজাউল করিম। যে সময়ে নজরুল পড়তেন মাত্র চাপ্পান্ন টাকা হাতে নিয়ে নেবে তাঁর ওপর ওঁরা গড়ে তুলেছেন চমৎকার সেতলা ইন্দুলবাড়ি। নজরুলের ভিটের ওপরই তৈরী হ'য়েছে সোতলা নজরুল একাডেমীর বাড়ি। বয়স্ক শিক্ষালাভের শিক্ষাকেন্দ্র আছে এখানে সোতলায়। একতলায় আছে লাইব্রেরী। জানালেন একাডেমীর প্রশাসনিক কাজী গোলাম কিবরিয়া (কিবু)।

একত্রিশিরের ভোরে ফিরে আসতে চোখে পড়েছে গাড়পাল্লালি, মাঠ, পাখ-পাখালি। বাবের কপালের সিঁদুর টিপ হ'য়ে উঠেছে সূর্য। এই ঐক্যের বেলা মাতৃত্বের বেলা থেকে ফিরে যেতে মন চাইছেনা। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ নিজেদের ওপর নতুন বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন বুঝি। নবচেতনার, নব সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে এ মিলন-বেলা। যে স্বপ্ন কাজী-সাহেব দেখে গিয়েছিলেন সমস্ত জীবন ধরে তারই উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি এই মেলাতে। মানুষের মধ্যে। চুকলিয়া গ্রামের সবাই যেন নজরুলময় হ'য়ে উঠেছিলেন ক'দিন।

কিরণ রায়

সম্রাট—তাঁরে বেমানান

কোন নবাব বা রাজা বাদশার কাহিনী নিয়ে সম্রাট নাটক তৈরী হয়নি। ইতিহাসের কোন গন্ধও এ নাটকে নেই। এনাটক একজন রঙ-মহলদের কাল্পনিক অভিনেতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। একজন খ্যাতিমান সম্রাটতুল্য অভিনেতার জীবনের পরিণতি কি তাই দৃশ্যে দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। এ পরিণতি যে কোন নামী লোকের, যে কোন শিল্পীর, যে কোন গুণীলোকের হতে পারে। শ্রীযুক্তি বসু সুন্দরভাবে নাটকখানি লেখেছেন। শ্রীযুক্তের গুপ্ত ও শ্রীযুক্তা সরকারের পরিকল্পনা ও নির্দেশনাও প্রশংসনীয়। কিন্তু এ নাটক ষ্টার থিয়েটারে চলার উপযোগী নয়। দর্শকদের সমস্যাই তা প্রমাণ করে। কলকাতার এই কুলীন থিয়েটারে পূর্বের নাটকগুলি দর্শক মনোরঞ্জনের নানা উপকরণে সমৃদ্ধ ছিল। দর্শকরাও সেইভাবে চোখকান তৈরী করে রেখেছেন। ফলে ষ্টারে এ নাটকটি দেখতে কেমন যেন বেমানান লাগে।

শরদিন্দু রায় দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই অবসর স্বেচ্ছাকৃত। শরদিন্দুবাবুর সংসারে আছেন পুত্র প্রবীর, পুত্রবধূ আরতী ও ভৃত্য মুন্সী। শরদিন্দুবাবুর সময় আর কাটেনা। বাল্যকালের সঙ্গে অভিনয় দেখেন, মন রেখে মন মাজেন। ফলে সময় কাটাতে আসেন থিয়েটারের নেশা। তাই তাঁর সরকারী কর্মচারিরা প্রাণগোপালের ছদ্মবেশী দোকানে বাক্যালাপে গল্প করতে, সময় কাটাতে আসেন।

শরদিন্দুবাবুর জীবনে একদা অঘটন নেমে আসে। পুত্রবধূর কাছে তাঁর কলঙ্ক কাহিনী করে আসছিল। পুত্রবধূ স্বামীর কাছে সঙ্গে সঙ্গে নালিশও জানাচ্ছেন। একদিন পুত্রবধূ কৌশলে ডাক্তারকে সংবাদ দেন। একথা জানতে পেরে শরদিন্দু-বাবু মানসিক আঘাত পেলেন। নিজ ভুল স্বীকার করে একমাত্র কন্যা রূপসীর শ্বশুর-বাড়ীতে উঠেন। সেখানেও অশান্তি, অস্বস্তিতে দিন কাটতে থাকে। তবুও স্থির বুদ্ধিতে সংপরামর্শ দানে শেষ রাতে তিনি আবার বিরুদ্ধপক্ষ হন। মেয়ে জামাই ফিরে আসতে থাকে।

এদিকে পুত্রবধূ রাজ্যের কারণ খুঁজে পায়। সমস্ত ভুল ভেঙ্গে যায়। স্বামীকে বলে শ্বশুরকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথায় তিনি? কেউ জানেনা। চারধাম ঘুরে খোঁজাখুঁজি চলে। শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের সম্মুখে এক ভিখারীর দলের সঙ্গে তাঁকে দেখা গেল। প্রথমে এসে দেখে শরদিন্দুবাবু আর স্বাভাবিক অভিনয় নেই। তিনি পাগলের মত নাটকের সংলাপ বকে যাচ্ছেন। সমা-জের চোখে, দর্শকের চোখে এখন তিনি পাগল।

এই বক্তব্য নিয়েই নাটকটি শেষ হয়। নাটকের শেষ দৃশ্যে শরদিন্দুরূপী নরেশ গুপ্ত অসাধারণ অভিনয় করেছেন। দর্শকদের চোখে জল টেনে এনেছেন। আমি তাঁর এমন নিখুঁত অভিনয় আর দেখিনি। অন্যকেশুরূপী দিলীপ রায়চৌধুরী নাতিদীর্ঘ অভিনয় করেছেন। বাংলা নাটকে ও চলচ্চিত্রে যখন নায়কের অভাব তখন দিলীপ বাবুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলা যায়। সুদর্শন, মিষ্টি ভাষী ও স্মার্ট। তবে নবনিভারূপী বীনা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুয়েট গানগুলি তাল মেলেনি। বীনাদেবী অভিনয় জমাতে পারেননি। প্রাণগোপালের মনোহারী দোকান কেমন যেন খাপছাড়া, তাছাড়া দৃশ্যগুলিও দীর্ঘায়িত ও একঘেয়ে। প্রাণগোপালরূপী নির্মল ঘোষ দ্বিতীয় পর্বে ভাল অভিনয় করেছেন। প্রথমের ভূমিকায় সত্যেন ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় চৌধুরীর ভূমিকায় দিলীপ রায়চৌধুরী, বিমলেশরূপী কমল মজুমদার, তারারূপী বেলা দাস সর্বক্ষেত্রে উজ্জ্বল। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মৃত্যু রায় ছবিটী বেমানান। নানী নানী জিনিসপত্র ও সাজ পোষাকের

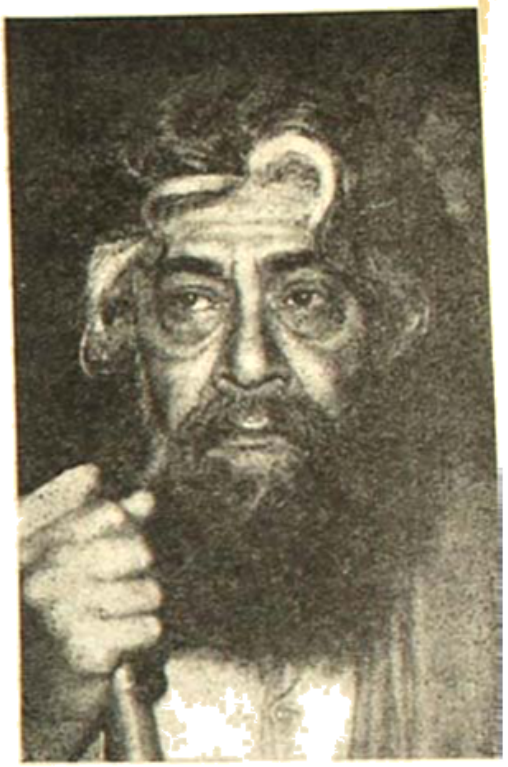

সম্রাট/নরেশ গুপ্ত

মধ্যে সস্তার ধারালো চর্বিটী চোখে লাগে। চরিত্রের মুখোপাধ্যায়ও (নন্দন) দর্শকদের হাসাতে চেষ্টা করেছেন কথাসাধ্য। ধাচিলের গানগুলি অর্থপূর্ণ হলেও সুশ্রাব্য হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন— শৈলেন ভট্টাচার্য, বনীন্দ্র ঘোষ, সুশীল বসু, সুধা ঘোষাল ও বীনা চক্রবর্তী প্রভৃতি। বীনা চক্রবর্তীও চরিত্রটিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাটকটির সংলাপ সুলিখিত, মনে দাগ কাটে। তিনিবরূপের আবহ সঙ্গীত, বক্তির গানের আলো, সন্তোষ সরকারের মঞ্চ পরিকল্পনা, চণ্ডীদাস বসুর গীত রচনা নাটকটিকে মর্যাদা দিলেও এ নাটক ষ্টারের দর্শকরা মেনে না। কারণ মনে হয়েছে। শেষোক্ত এই নাটকটি অন্যান্য ঘটনাবহুল ও জমজমাট সংসার মনে তার মত।

সত্যানন্দ গুহ

গ্রন্থ আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ : উত্তরাধিকার। জ্ঞানপ্রকাশ সংসদ। মুকেশী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জ্ঞানপ্রকাশ। ছয় টাকা।

রবীন্দ্র-তিরোধানের পর প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হয়ে এখনও তাঁর প্রজ্ঞা-প্রেরণাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। আসলে ঐকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে কোন দিকের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মনন-কল্পনার যোগসূত্রটি চিনে নেওয়াই মঙ্গলের। আলোচ্য গ্রন্থে নাতিদীর্ঘ আটটি নিবন্ধে বাস্তবে লেখক সেই রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রায় সব কটি রচনাই 'একাডেমিক'; অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও বিন্যাস-রীতির বিচারে। তবু 'জীবনানন্দ দাশ ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাটি উৎসুক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। "রবীন্দ্রনাথ : উত্তরাধিকার" রচনাটি ঠিক নিবন্ধ নয়, মননরচনা; পড়তে ভালোই লাগে। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; ভূমিকাটি তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় বহন করছে। প্রচ্ছদ ছাপা, বাঁধাই চলনসই। চতুর্থ মলাটে প্রকাশকের বক্তব্য ছাপা হয়েছে। তাতে এই গ্রন্থে, 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনার একটা নতুন দিক উন্মোচিত হোল' বলে পাঠককে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রসিক পাঠক কি ঐ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারবেন? ভালো উপন্যাসের উৎস সন্ধানে। অশোক কুমার দে। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯ ও কলিকাতা-৯। ১২ টাকা।

প্রথম রচনা 'নতুন' কি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নব বাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রীঃ)? না, ছানা ক্যাথেরীন মালেন্স রচিত 'কুলবধূ ও কলঙ্কীর বিবরণ' (১৮৫২)? এ বিষয়ে বক্তব্যের অবকাশ আছে, থাকবেও। সেই সঙ্গে হয়তো কেউ কেউ উচ্চারণ করতে চাইবেন প্যারীচাঁদের বিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' কি বেতালেও নাম বিহারী দে-এর লেখা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' অথবা বঙ্কিমের 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' প্রভৃতি 'উপন্যাসে'র নাম। তবে লেখক ডঃ দে 'বিষবৃক্ষ'-কেই প্রথম বাঙলা 'নভেল' আখ্যা দিতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি পরম্পরা বিন্যাস-যোগ্য এবং মনন-বুদ্ধিদীপ্ত। তবে আলোচ্য গ্রন্থের অন্য তিনটি অধ্যায় সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। সে তিনটির বিষয়নাম—'বাঙালি নরনারীর জীবনবোধ ও বাংলা গল্পে সামাজিক মানুষের ভিড়' এবং 'বাংলা কথা সাহিত্যের বিকাশ'। শেষোক্ত অধ্যায়টি কিছুটা চিন্তা-চর্বণকও বটে। ডঃ দে এই গ্রন্থ রচনায় যতটা পরিশ্রম করেছেন প্রকাশক সেই অনুপাতে গ্রন্থ মুদ্রণে ততটা যত্ন নেননি। অনেক ছাপার ভুল থেকে গেছে। গ্রন্থ শেষে সংযুক্ত নির্দেশটি গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সহায়ক। প্রচ্ছদটিও মূল্যবান।

শুধু তোমার জন্য। বিভূতিভূষণ বক্সল। পত্রবিচিত্রা।

সম্প্রতি ষোল-উত্তীর্ণের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তরুণদের বিপুল উৎসাহে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। দু-জন সাম্প্রতিক তরুণ কবির এ-বছরই একটি প্রচেষ্টা : 'শুধু তোমার জন্য'। এঁরা হলেন দুর্গা বর্মণ, অনুকূল বক্সল, প্রণব মাণিক্য, সুকুমার বক্সল, বিভূতি বক্সল। এই নামগুলি স্বাভাবিকভাবেই কবিতা পাঠকের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়, বরং কয়েকজন একেবারেই নতুন। এঁদের লেখার বয়েস যে খুব বেশি নয়, এঁদের কবিতা পড়েও সেটি বোঝা গেছে। যে সাহস ও ঔদ্ধত্য একালের কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ সেটি এঁদের কবিতায় খুব বেশি নেই। বরং একটু দুঃখ, চিলে-ঢালা এইসব কবিতা। বয়সোচিত রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকেও এঁরা এখনো বর্জন করতে পারেন নি। তবু নিজস্ব আবেগের আন্তরিকতা ও সতর্ক প্রচেষ্টা এই কবিতাগুলিকে ব্যর্থ হতে দেয়নি। প্রায়ই উঠে এসেছে মনে রাখার মত উজ্জ্বল সব পংক্তি। যেমন, দুর্গা বর্মণের : 'বুকের মধ্যে পাথর গুঁড়ো করা শব্দ/ রেলগাড়ী বুকের পাঁজর ভেঙে করে চলে।' অথবা হিরাংশু বিশ্বী-র 'একমুঠো অন্ধকার দুঃখ নেবে / 'স্মৃতি' তোর মুখখানা কালো করে দিতে ইচ্ছে করে।' অন্যেরাও এ-রকম তীব্র কিছু কিছু পংক্তি অনায়াসে উপহার দিতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এঁদের কবিতা ভীরু, নতমুখ নয়—বরং সাবলীলতায় স্বচ্ছ।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আগের প্রশ্নগুলির উত্তর

১। ম্যাডাম ক্যামা এবং তাঁর দলের নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীরা প্যারিসে ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

২। গন্ধ বাষ্প-তরঙ্গ নয়, তাদের বলা হয় Contact senses।

৩। (ক) ঘন্টায় ১২৮ কিলোমিটার, (খ) ঘন্টায় ৫৬ কিলোমিটার এবং (গ) ঘন্টায় ২৯ কিলোমিটার।

৪। উইলবার এবং অরভিল রাইট এই দুই ভাই-এর।

৫। ১৫ আগষ্ট, ১৯৭২।

৬। রোমি, জে. ভাদা, জগদীশ চন্দ্র বসু, অনিলকুমার দাশ, এস. কে. বিশ্ব, সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা এবং বিক্রম সারাভাই।

৭। একটি পোস্টকার্ডের থেকে ১৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বারেন দ্বীপে এবং অপরটি বারেন দ্বীপের ১৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নারকোডাম দ্বীপে।

৮। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে। বাইনগঙ্গা নদীর উপনদী গাভির তীর নিম্নতম ইতিহাসে প্রবল থেকে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার এক অবিতে সেট দেয়া যাবে।

প্রাঙ্গণ

চিন্তাগ্রস্ত চন্দ্রশিং

ব্রে মাধ্যমে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা চলছে কলকাতায়। সব দলেরই গড়ে ৩ টা করে খেলা হলো। এবারের খেলায় গতবারের দলকে দাতব্যার চান্দিহাম ইষ্টবেঙ্গলের ইতিহাসে একটি রাত হয়েছে। কলকাতার ফুটবল লীগের শুরুতেই এই ইন্দ্রপতন এবং আরও কয়েকটি ঘটনা ক্রীড়ামোদী মানুষের বিশেষভাবে ভাবিয়ে

কলকাতায় ফুটবল

তুলেছে। এসম্পর্কে গতবারের লীগ টেবিলে প্রথম চারটি দলের অধীনের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

"এসা পাথার নাহি ? এখনও উনিশটা খেলা বাকি ? এই নয়ো নাথা গরম করে লাভ আছে কি ভাই ?"

গত ৮ই জুন উয়াড়ীর কাছে ইষ্টবেঙ্গল হেরে যায়। ১৩ তারিখ শনিবার

প্রত্যুষের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে

বিশ্বকাপের অগ্নিপরীক্ষা

এবারের আগে বিশ্বকাপের খেলা হয়েছে মোট দশ বার। শুরু সেই ১৯৩০ সালে। তখন ফুটবলের সোনার পরী তুলে নিয়ে কাপটি নিয়ে চলতো লড়াই।

তুলে নিয়ে চুক্তিটি নিয়ম সোনার একটি পরীর মূর্তি। ফরাসী ভাস্করের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৩০ সালে যখন প্রথম বিশ্বকাপের খেলা শুরু হল তখন সেই সময়কার বিশ্বকাপ সংগঠক শ্রীজাপতি ফরাসী আইন্ত্র তুলে নিয়ের মাবটি ঐ চুক্তির সঙ্গে তুড়ে দেওয়া হল। তখনকার দিনে সোনার ঐ পরীটিকে তৈরী করতে খরচ হয়েছিল বিয়াল্লিশ হাজার টাকার ওপর।

নিয়ম ছিল যারা তিনবার বিশ্বকাপ বিজয়ী হবে তারা চিরদিনের জন্যে পেয়ে যাবে সোনার পরী তুলে নিয়েছে। ১৯৫৮, ১৯৬২ আর ১৯৭০ সালে বিজয়ী হয়ে ব্রাজিল সোনার পরীকে চিরদিনের জন্যে ঘরে তুলেছে। তাই ১৯৭৪ সাল থেকে বিশ্ব কাপের পুরস্কারের নাম বদলে গেলো। নতুন নাম হল 'ফিফা' বিশ্ব কাপ। ১৯৭৪ সালের ফাইনালে হল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী প্রথম ফিফা বিশ্ব কাপ জয় করে।

এবারের বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল যে ষোলটি দল তাদের চারটি বিভাগে ভাগ করে খেলানো হয়েছে।

ক বিভাগে ছিল—আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরী, ইতালী ও ফ্রান্স। খ বিভাগে—পশ্চিম জার্মানী, পোলাণ্ড, ডেমোক্রেসিয়া ও মেক্সিকো। গ বিভাগে—ব্রাজিল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও সুইডেন এবং ঘ বিভাগে—হল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, পেরু ও ইরাণ।

প্রথম পর্বের খেলার পর সেমিফাইনালে পর্যায়ের লীগের খেলায় খেলার অধিকার অর্জন করল ক বিভাগ থেকে আর্জেন্টিনা ও ইতালী, খ বিভাগ থেকে পশ্চিম জার্মানী ও পোলাণ্ড, গ বিভাগ থেকে ব্রাজিল ও অষ্ট্রিয়া ও ঘ বিভাগ থেকে হল্যাণ্ড ও পেরু। এই আটটি দলকে দুটি ভাগে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলানো হল। এক নম্বর বিভাগে ছিল হল্যাণ্ড, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া এবং দু নম্বর বিভাগে—ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পোলাণ্ড ও পেরু। দুই বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সেই খেলায় যারা জিতবে তারাই পাবে ফুটবলবিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

শেষ সংবাদ

বিশ্বকাপ এবার জয় করল আর্জেন্টিনা হল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। ইতালীকে ২-১ গোলে হারিয়ে ব্রাজিল পেয়েছে তৃতীয় স্থান।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

DHANADHANYA | YOJANA | Regd. No. WBCC 315
Price 30 Paise | (Bengali) | July 1-15, 1978

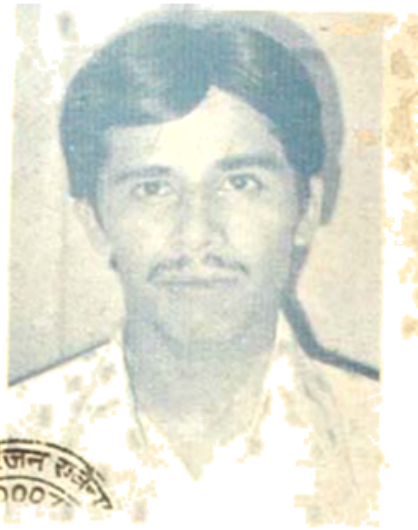

প্রশিক্ষণের সফলতম প্রশিক্ষক

খেলাধুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ধনশিল্প সম্বন্ধের কর্তৃপক্ষ উত্তরে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত। সমর্থকদের কাছে সুরজিতের অনুরোধ : ধৈর্য ধরুন, চঞ্চল হবেন না ; এখনও অনেক খেলা আছে।

সুরজিৎ জেনারেল, বয়স ২৬, সাহেবদের আমলের। ৬৯ সালে কলকাতায় প্রথম ফেডারেশন ট্রফি ফিরিয়ে আনার দলে ছিলেন। তারপর দুবছর দিল্লিপুরে এবং দুবছর মোহনবাগানে খেলেন। '৭৪-'৭৬ সাত বছর খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলে। দলটিকে সাতটি ট্রফি বিজয়ী বানানোর অধিনায়ক। সর্বোপরি ট্রফি খেলেছেন ৩ বার। এবারের বিজয়ী বাংলা দলের কলকাতার অন্যতম প্রধান ছিলেন। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের উল্লেখ করার মত অন্য ঘটনা হল—১৯৭০ সালে কলকাতা মাঠের প্রথম খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। তারপর দলের প্রতিনিধি হয়ে দুবার ফুটবল খেলেছেন বাইরে ১৯৭২-এ। মারডেকা টুর্নামেন্ট ও প্রিয়ান ওয়েস্টে খেলার হয়ে অর্থ সংগ্রহের গৌরবের অধিকারীও সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

সুরজিতের বক্তব্য : খেলায় মোহভঙ্গ আছে। কেন কেন দিন খেলোয়াড়রা ভাল খেলতে পারেন না। তাঁরা তো আর যন্ত্র নয়। তাই দিনের আগে সবাই দিনে আড়াইশো হই। কিন্তু পলাশের আমরা সবাই মেনে নিতে পারবনা কেন?

"ইস্টবেঙ্গল হেরেছে বলে আমরা তো আর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাইনি। সুতরাং ওটা নিয়ে চিন্তা করে নিজেদের বিজয়ী ভাবার কারণ নেই। এখন শুধু ভাবতে হবে প্রত্যেকটা খেলাকে আমরা যাতে ভালভাবে জিততে পারি"—মোহনবাগান দলপতি প্রসূন ব্যানার্জির মনের কথা এটাই। দি. কেন সরোজ প্রসূনও কলকাতার ফুটবল আকাশে আসে ৬৯-৭ সাল হৈমিয়াকের মাধ্যমে। পরের বছর দিল্লিপুর ক্লাব। অতিশ্য কোচ মহম্মদ হাবীবের ভাবনা ঠিক করলেন একটু পিছনে। ট্রাইব্যাকের ভাবনা থেকে সেফটি ব্যাক বা সেফটি লিবারোর পজিশনে। ঐ জায়গায় প্রসূন এখন ভারতপ্রেমের অন্যতম প্রধান। দলের সবাই এখন মোটামুটি ভাল খেলায় প্রতিটি ম্যাচ জিতে অনায়াস অবলীলায় ফেরেছেই। তাদের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া মোহনবাগান ক্লাবের দীর্ঘ তম ঐতিহ্যকে সম্মান করে—এই আশা নিয়ে প্রসূন নিরলস অনুশীলন করছেন।

দলিপুর মোড়ের মেসে বসে আলোচনা প্রসঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিং-এর দলনায়ক মুক্তাগী হাবিব খান (২৭) বললেন : ছোট ছোট দিন এখন খুব কেনা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে খেলার প্রথম দিকে গোল করতে না পারলে গোল করা ভীষণ কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। ওরা সারা বছরের প্রেষ্ঠ খেলা খেলে বড় দলের সঙ্গে ৫টি দুটিনটে ম্যাচে। হাবিবের আব্বাজান শের খান অন্ধ্র-প্রদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন জাতীয় ফুটবলে। ভাই রশিদ খানও ছিলেন অন্ধ্র পুলিশের নিয়মিত খেলোয়াড় ও ক্যাপ্টেন। কোচ নূর মহম্মদের কাছেই হাবিবের ফুটবলের পাঠগ্রহণ। সিটি বয়েজ ওল্ড ক্লাবের হয়ে হাবিব খান হায়দরাবাদ ফুটবলের প্রথম ডিভিসনে খেলা শুরু করেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৩-এ কলকাতায় এসে খেকে বরাবর মহমেডান

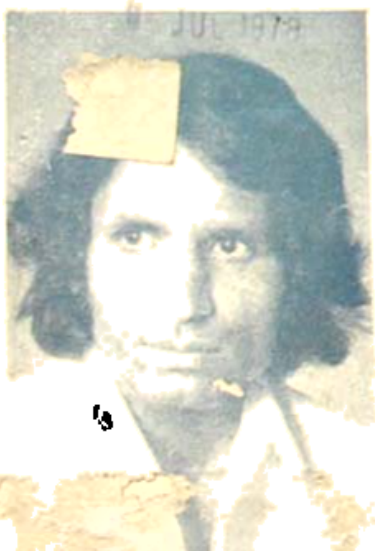

মহমেডানের অধিনায়ক হাবিব খান

স্পোর্টিং-এই খেলেছেন। ওর মতে দীপের সবচেয়ে বড় দলটিকে এখন মোহনবাগান। ওদের হাফ লাইন এখন বেই।

দল-বদলের হিসাব-নিকাশে প্রিয়ান্স দলের খবরের প্রতিদিনই লোকসানের নতির নতুন কিছু নয়। নতুন চল এবার গোড়ায় ৫টি খেলায় নেমে একটি পরাজয় দেখে চার পয়েন্ট খুইয়েছে প্রিয়ান্স। দলনায়ক প্রণব চক্রবর্তী (২৬) এর কারণস্বরূপ জানালেন ওঁর দলের খেলা আশানুরূপ হচ্ছে না।

বাটা-র কোম্পানীর কর্মী শ্রী গোপাল চক্রবর্তীর পুত্র প্রণবের জন্ম বাটানগরেই। আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম। ছাত্রজীবনে দু'বছর খেলে প্রিয়ান্সে চারবছর খেলছেন ইস্টার ব্যাক পজিশনে। ওঁর মতে সুপিরিয়র টিম চল এবার মোহনবাগান।

ছোট দলগুলোর মধ্যে কেউই অবশ্য তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বড় দল থেকে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আনলেও চর্ড লীগাক বরফুলের প্রথম খেলাতেই হেরেছে। দিল্লিপুর, উয়াড়ি ও চাওড়া ইউনিয়ন ভাল খেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কলকাতার ফুটবলে খেলা দিয়েছে অপনি সংকেত। দলবদলের চালনায় একটি খেলা বন্ধ হয়েছে সবাপ্তির পাড় মিনিট আগে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের একটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। প্রত্যেক বড় খেলায় প্রয়োজন হচ্ছে বহু সংখ্যায় পুলিসবাহিনী। এভাবে চললে লীগের খেলা শেষ পর্যন্ত চলতে পারবে কি?

কেশবলাল দাশ

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. বি. রাবকৃষ্ণান। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত এবং গ্লোবো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ, দাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

স্বাধীনতা সংখ্যা

আগস্ট ১৯৭১

১৯৭৮

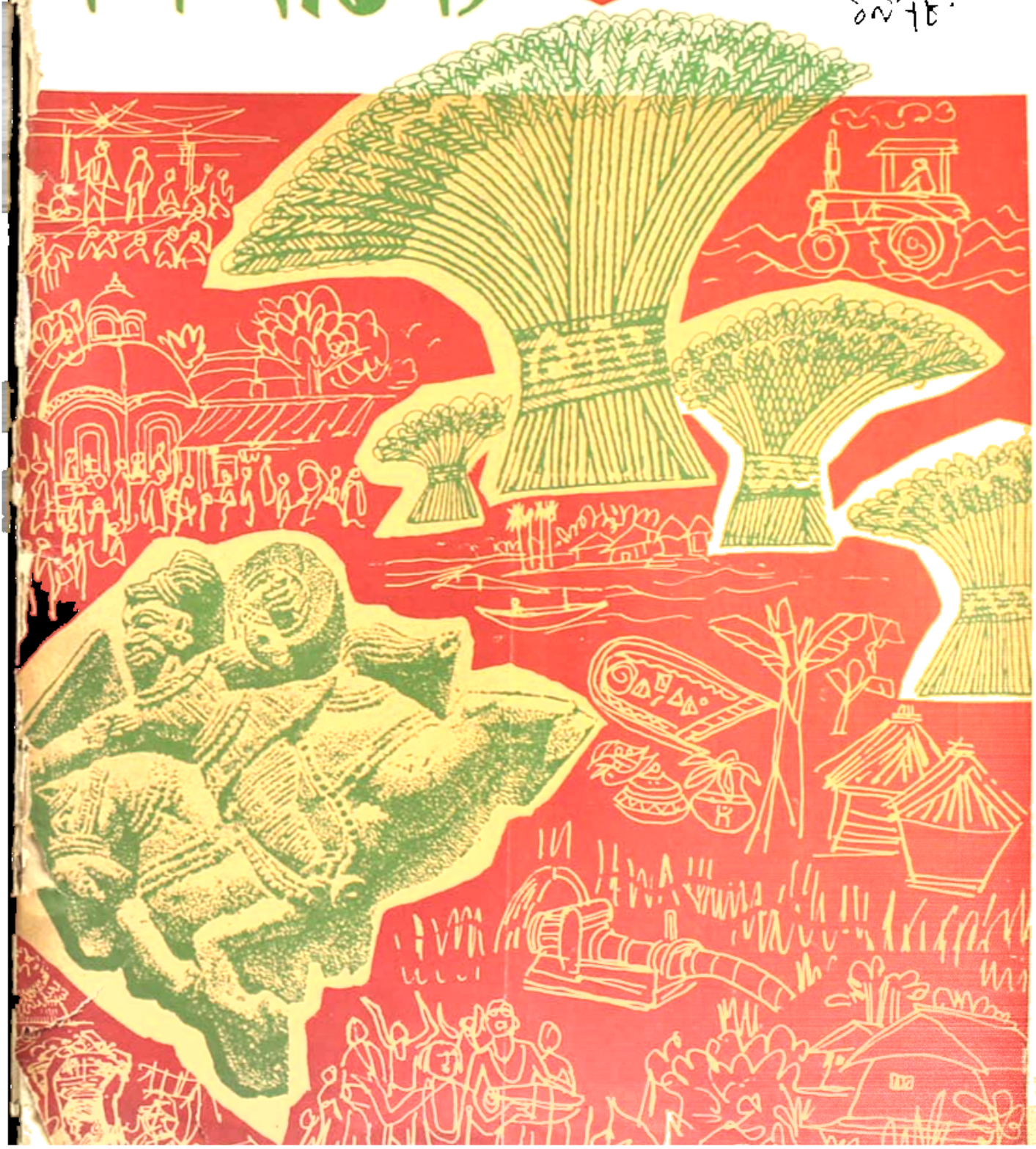

একত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যার নায়ক গ্রামের সেই সহজ সরল মানুষ, যাঁর কঠিন স্নেহাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতি। তাঁর জীবনের সুখদুঃখই এই সংখ্যার উপজীব্য। আজ দেশের ৬৩ কোটি লোকের ৫১ কোটিরই বাস ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার গ্রামে। তাই স্বাধীনতা লাভের এই একত্রিশ বছরে দেশের অগ্রগতির মূল্যায়ন হবে গ্রামীণ অর্থনীতির কষ্টিপাথরে। সেই অর্থনীতির ছিন্ন যিনি শত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও অক্লান্ত প্রয়াস পরে তুলে চলেছেন গ্রামের সেই সাধারণ মানুষটির জীবনধারা কোন্ পথে বইছে তার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারের জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।

দেশের এই একান্ত কোটি গ্রামবাসীর মধ্যে ২৪ কোটি বাস করছেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। আর এই ২৪ কোটি লোকের অধিকের বেশী 'অতি দরিদ্রের' আওতায় পড়েন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী, আদা উৎপাদন বেড়েছে ৫ ৬ গুণ। কিন্তু ক্ষেতের ফসল উঠছে কাদের গোলায়? পঞ্চাশ দশকেই প্রণীত হয়েছে ভূমি সংস্কার আইন, তখন থেকেই তোড়জোড় চলে আসছে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার। তবু ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা কেন বেড়েই চলেছে? যে কৃষির ভিত্তির ওপর গ্রামের লোকেরা নির্ভর করে এসেছেন তাঁদের সারা বছরের জীবিকার জন্য সেই ভিত্তির বর্তমান চেহারা কি? অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপুষ্টির অভিশাপ থেকে গ্রামবাসীরা আজ কতটা মুক্ত?

গ্রামের সেই সাধারণ মানুষটিকে ঘিরে এরকম নানা প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে জাগে। গ্রামোন্নয়ন, কৃষির বিকাশ, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানো ও ধনপতি বৈষম্য হ্রাস করাকে মূল লক্ষ্য করে সম্প্রতি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যে নবরূপায়ণ চলছে তা গ্রামের দরিদ্র মানুষটির জন্য কি প্রতিশ্রুতি বহন করছে তাও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের এই বিশেষ সংখ্যায় এসব প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা। গ্রামজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে গ্রাম ভারতের বিশেষ করে গ্রাম বাংলার বর্তমান রূপ এবং সরকারের নতুন কর্মসূচীর রূপরেখা।

১-৩১ আগস্ট ১৯৭৮
দশম বর্ষ: তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

৩ আর্থিক উন্নতি ও গ্রামের মানুষ
ড: ভবতোষ দত্ত

৭ পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের ভূমিকা
শান্তিকুমার মিত্র

৯ নতুন বিপ্লবের রূপরেখা
ড: শঙ্খ মুখোপাধ্যায়

১৩ ভূমিসংস্কারের পথ ও পাথেয়
নীরেন সাহা

১৭ পল্লী বিকাশে সমবায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

২১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বেকার
রাধাশ্যাম দত্ত

২৪ গ্রামীণ ভারতের শিক্ষায়ন
মনোজ মজুমদার

২৭ গ্রামের সেবায় চক্ষুচিকিৎসা
প্রোফেসর সেন

৩১ চার দেয়ালের বাইরে
ডা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৩৩ পল্লী স্বাস্থ্য রক্ষার পূর্বাপর
সিদ্ধিকুমার রায়

৩৭ জেলা শিল্পকেন্দ্র-গ্রামীণ শিল্পে নতুন উদ্যোগ
ডা: অমরনাথ দত্ত

৩৯ গ্রামীণ কুটির: আজ আর কাল
দুর্গা বসু

৪১ অন্ধকার থেকে আলোকে
কৃষ্ণ দেবনাথ

৪৭ গ্রামীণ মনোরঞ্জনের অন্বেষাস
সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

৪৯ একটু জলের জন্য
অরুণালয় ভট্টাচার্য

৫৩ বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ ও মন
মহুয়া সিংহ

৫৭ বিনোদন: গ্রাম বাংলার
অধীর বিশ্বাস

প্রচ্ছদ—মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

স্পষ্ট বলুন ঃ আজ্ঞে না, ধন্যবাদ

আপনার সংরক্ষিত টিকিটের নাম ফেরৎ দেবার জন্য রিজার্ভেশন অফিসে গেলে অনেকেই হয়তো আপনার টিকিটটি কিনে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন।

কিন্তু না, ওঁদের কাউকেই বিক্রী করবেন না। সোজা কাউণ্টারে ফেরৎ দিন।

কারণ, হয়ত ওঁদের মধ্যে দু-একজন যাত্রী থাকবেন কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই উদ্দেশ্য আপনার টিকিটটি কিনে অন্য কোন নিরীহ যাত্রীর কাছে বেশী দামে বিক্রী করা।

অন্যের নামে রিজার্ভ করা টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করা অপরাধ এবং এর জন্য শাস্তি নগদ জরিমানা ৫০০ টাকা পর্যন্ত অথবা তিন মাসের জেল অথবা দুইই হতে পারে। তাছাড়া এই ধরনের জরিমানা সমেত রেলের ভাড়া দিতে হবে বা তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়েই দেওয়া হবে।

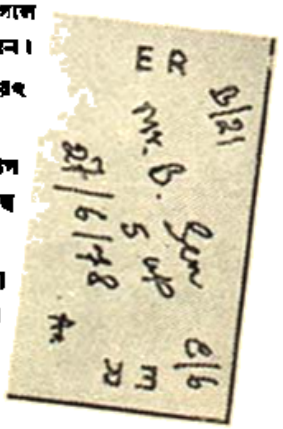

আপনি নিশ্চয়ই চান না কোন নিরীহ যাত্রী এইসব শাস্তি ভোগ করুন কিংবা আপনি নিজে এ জাতীয় অপরাধে জড়িয়ে পড়ুন।

সুতরাং জোর গলায় বলুন, আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।

পূর্ব রেলওয়ে

আর্থিক উন্নতি ও গ্রামের মানুষ

ডঃ ভবতোষ দত্ত

গত তিন দশকে আমাদের যতগুলি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিরই প্রথম কয়েক পাতাতে দেখা যাবে যে দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলের উন্নতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত গ্রাম-প্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ। তাই এদেশে আর্থিক উন্নতি মানেই গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন। শহরের সংখ্যা ও শহরবাসী জনসংখ্যা দুই-ই ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু এখনো দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামেই থাকেন এবং এঁদের অধিকাংশেই কৃষি-নির্ভর। সারা দেশের খাদ্য সরবরাহ ও কয়েকটি বড় শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন এঁদেরই হাতে এবং শেষ পর্যন্ত এঁদের আয়-ব্যয় থেকেই আসে বেশির ভাগ শিল্পজাত জিনিসের চাহিদা। আমাদের বড় শিল্পপতিরা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে গ্রামের চাষী শুধু তাঁদের খাদ্যশস্য আর কাঁচামাল যোগায় না। তাঁদের নিজেদের উৎপন্ন কাপড়-জামা, জুতো, বাসনপত্র থেকে আরম্ভ করে সাইকেল বা সস্তা রেডিও পর্যন্ত বহু জিনিস যদি গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি না হয় তাহলে উৎপাদনে মন্থরতা আসতে বাধ্য।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে গত সাতাশ বছরের পরিকল্পনাতে গ্রামাঞ্চলে অনেক দিকে উন্নতি হয়েছে। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রসারের সুবিধা গ্রামবাসীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছেন। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে যে বিরাট বিনিয়োগ হয়েছে সেটা প্রধানত গ্রামবাসীরই জন্য। এটা আশা করা হয়েছিল যে দুই দশকের মধ্যেই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে এবং সেই বিদ্যুৎ কাজে লাগানো হবে কৃষিক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্র শিল্পে।

কৃষি কাজে নিযুক্ত জমির ১৭.৬ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা ছিল ১৯৫০-৫১তে। বর্তমানে সেই অনুপাত প্রায় ২৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারের ব্যবহার ১৯৫২-৫৩তে এক লক্ষ টন থেকে এখন প্রায় ৩৪ লক্ষে এসে পৌঁছেছে। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ১৯৫০-৫১তে মাত্র সাড়ে তিন কোটি টন আর ১৯৭৭-৭৮-এ এর পরিমাণ হয়েছে সাড়ে বারো কোটি টনেরও বেশি, অর্থাৎ আটাশ বছরে উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৩.৬ গুণ। খাদ্যশস্যের সঙ্গে সমস্ত কৃষিজাত উৎপন্নের হিসাব নিলে দেখা যায় যে বৃদ্ধি হয়েছে তিনগুণের বেশি।

সহজেই কথা উঠবে যে কৃষি উৎপাদনে যদি এতটা উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে গ্রামবাসীদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। সাময়িক হিসাবে দেখলে কথাটা ঠিক, কিন্তু এই ধরণের হিসাবে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ হয় না। প্রথমত মনে রাখা উচিত যে ১৯৫১তে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি এবং সেটা এখন, অর্থাৎ ১৯৭৮—এ ৬৫ কোটির চেয়ে একটু বেশি। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ থেকে বীজ-ইত্যাদির জন্য যা দরকার এবং নানা কারণে যে অংশ নষ্ট হয়ে যায় সে সব বাদ দিলে মাথাপিছু প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ গত তিন দশকে প্রায় একই রকম আছে—বৈশিক ৪০০ গ্রামের কিছু নীচে। দ্বিতীয়ত, ভোগ এবং উৎপাদন দুদিক থেকেই মাথাপিছু হিসাব সবটা তথ্য দেয় না, কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই বিরাট অসাম্য আছে। যে আর্থিক উন্নতির মোট বা গড়পড়তা হিসাব আমরা পাই তাতে ভোগ এবং ক্রয়ক্ষমতার অসাম্যের পরিমাণ পাওয়া যায় না।

এই অসাম্যের পুরোপুরি হিসাব তৈরি করবার মত পরিসংখ্যান আমাদের নেই। কিন্তু কতগুলি বড় জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। সেচ, বিদ্যুৎ, সার-সরবরাহ, উন্নত বীজ বা ব্যাঙ্কের ঋণ ইত্যাদিতে যে সব সুবিধা পল্লী-অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে সেটা প্রায় সবটাই ভোগ করেন সম্পন্ন চাষীরা। ছোট ছোট ক্ষেতে যে অগণিত চাষী কাজ করেন তাঁদের কাছে এসব সুবিধা পৌঁছয় না। পল্লী-অঞ্চলের দারিদ্র্য-মোচনের কথা যখন আমরা বলি, তখন অনেক সময়ে ভুলে যাই যে গ্রামের অর্থনীতিতে এখনো সবচেয়ে প্রবল শক্তি বড় আমারের মালিক, মহাজন ও ব্যবসায়ী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই তিনটি আলাদা শ্রেণী নয়—একই ব্যক্তি বা একই গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তিরা একসঙ্গে বড় খামারের চাষী, পাইকারী ব্যবসায়ী এবং মহাজন। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে নূতন আয় সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশই এই শ্রেণী নিজেদের আয়ত্ত করে নেন। সরকারী বিরাট বিনিয়োগের সুফল সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয় না। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে অনেক কথা, অনেক আইন তৈরি হয়েছে। বড় বড় দপ্তরখানা খোলা হয়েছে কিন্তু ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বাড়ছে এবং আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বলীয়ান একটি শ্রেণী সমস্ত থেকে সমস্ততর হয়ে উঠছে। উদ্বৃত্তক্ষমতাশীল খাদ্যশস্য এঁরাই উৎপাদন করেন, দেশের তিন লক্ষ ট্রাকটর (১৯৫১ তে ছিল মাত্র ৯০০০) এঁদেরই কাজে লাগে।

১৯৭১ সালে অধ্যাপক লাকড়াওয়ালা ও নীলকণ্ঠ রথ তাঁদের বিখ্যাত হিসাবে দেখিয়েছিলেন যে ভারতবাসীর শতকরা চল্লিশ জনই দারিদ্র্য সীমার নীচে। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের যে হিসাব দিয়েছেন সে অনুসারে ১৯৭৭-৭৮-এ দারিদ্র্য সীমার নীচের জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪০.৭১ আর

গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৭.৮৫। বিশ্বব্যাঙ্কের শ্রী আলুওয়ালার হিসাব অনুসারে এই অনুপাত অবশ্য অনেক বেশি। যদি পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবটাই মেনে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে শহরে থেকে গ্রামে দারিদ্র্য অনেক বেশি এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুসারে গ্রামবাসী ৫১ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে (১৯৭৬-৭৭-এর মূল্যমান অনুসারে মাথা পিছু মাসিক আয় ৬২ টাকার কম)। এই বিরাট দরিদ্র জনসংখ্যার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে—মাসিক ৪৫ টাকা আয়ের নীচেই আছে প্রায় ১৩ কোটি লোক। ভোগ্যদ্রব্যের উপরে ব্যয়ের পরিমাণ থেকে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে প্রমাণ হয় যে গ্রামাঞ্চলের মোট-ভোগ্য-দ্রব্যের ব্যয়ের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ আসে উপরের দিকের শতকরা তিরিশ জন লোকের কাছ থেকে—বাকি সত্তর শতাংশ ব্যয় করেন আর পঞ্চাশ ভাগ। শহরের হিসাব আলাদা, সেখানেও দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে বর্তমান।

গ্রামবাসীর বর্তমান অবস্থাটা অবশ্যই বিশদভাবে দেখলে অনেক দিক পরিকল্পনার অসাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। গ্রামে বেকারের সংখ্যা পাওয়া যায় না, কারণ সেখানে সারা বছরের কাজ অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটেনা সেখানে বেকারত্বের সংজ্ঞা দেওয়াই কঠিন। এটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে গ্রামের দরিদ্র গোষ্ঠির মধ্যে প্রধান হল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক। এঁদের সংখ্যা বেড়ে গেছে—১৯৭১-এর আদমশুমারির সময়ে এঁদের সংখ্যা ছিল ৪.৭৫ কোটি। যাঁরা কোনো ধরনের রাষ্ট্রিত বা বর্ণাদারি ব্যবস্থায় চাষ করেন তাঁদের অধিকাংশেই খুব ছোট আকারের জোতে কাজ করেন এবং ফলে তাঁদের পক্ষে আধুনিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। গ্রামের কুটির শিল্প অধিকাংশেই মৃতপ্রায় এবং নূতন ধরনের যে সব ক্ষুদ্র শিল্প দেশে গড়ে উঠেছে তাদের বেশির ভাগই শহরে বা শহরের গায়ে গায়ে অবস্থিত। গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ১৯৬৯ থেকে, কিন্তু এখনো ভারতের ৫.৭৫ লক্ষ গ্রামের মধ্যে সাত-আট হাজার ব্যাঙ্ক অফিসও স্থাপিত হয় নি। সরকারী হিসাবে গ্রাম-ভিত্তিক বা 'গ্রামীণ' ব্যাঙ্ক বলে এদের দেখানো হয়, তার প্রায় এক চতুর্থাংশ বড় শহরের গায়ে গায়ে স্থাপিত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮-এর শেষে ভারতের সমস্ত গ্রামের মধ্যে মাত্র ৬৪,০০০ গ্রামে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ১ লক্ষ গ্রামে পানীয় জলের প্রায় কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ১৯৭৭-এর শেষ পর্যন্ত ২.১১ লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল, কিন্তু বিদ্যুতের তার গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে গেলেই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় না, এটা আজকাল সকলকে বোঝাতে হবে না। যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ সত্যি সত্যিই পাওয়া যায় সেখানেও তার ব্যবহার খুব সম্পন্ন চাষী বা গৃহস্থদের মধ্যেই সীমিত। দেশের বড় শিল্পের উৎপাদনের দিকে তাকালে চোখে পড়ে যে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদন বেড়েছে অল্প, কিন্তু ধনীজনের ব্যবহৃত বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণে বেশি। কাপড়ের উৎপাদন যা বেড়েছে তাতে মাথা পিছু প্রাপ্তব্য পরিমাণ বাড়েনি। কিন্তু টেলিভিশন সেট, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার, মোটর গাড়ী থেকে আরম্ভ করে বোতল বন্দী ঠাণ্ডা পানীয় বা প্রসাধন দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে দ্রুত গতিতে। শহরে বড় বড় বাড়ী তৈরি হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। বড় শহরে যেমন ব্যবস্থা দিয়ে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে—গ্রামাঞ্চলের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাতে সামান্যই উপকার হয়।

এই অবস্থার ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আমাদের নূতনতম আর্থিক পরিকল্পনার রূপ কী হওয়া উচিত সেটা সহজেই বলা যায়। এর আগে পঞ্চম পাঁচ-সালা পরিকল্পনাতেও "ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্প" সম্বন্ধে প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত চার বছরে সেই প্রকল্পের রূপায়ণে খুব একটা উল্লেখ্য অগ্রগতি করবার মত সাফল্য হয়নি। এবারে ১৯৭৮-৮৩—এই পাঁচ-বছরের জন্য যে নূতন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে তাতে ন্যূনতম প্রয়োজনের প্রকল্পটি আরো ব্যাপক করা হয়েছে। এর মধ্যে গৃহনির্মাণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু সবচেয়ে এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে বেশি উপকৃত হবে গ্রামবাসীরা। এই প্রকল্প অনুসারে পাঁচ বছরে ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শতকরা ১০ ভাগকে স্কুলে আনা হবে এবং ১৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত বয়সের লোকদের মধ্যে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশকে বয়স্ক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। প্রতিটি ৫০,০০০ লোকের জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং প্রতি ৫,০০০ লোকের জন্য একটি উপ-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে—আশা করা হচ্ছে যে প্রথম পাঁচ বছরে গ্রামের শতকরা ৪৬ জন প্রাথমিক কেন্দ্রের সুবিধা পাবে এবং উপকেন্দ্রের সুবিধা পাবে শতকরা ৭১ জন।

যে সব গ্রামে পানীয় জলের সম্পূর্ণ অভাব তাদের সবগুলিতেই জল-সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামের রাস্তা তৈরি হবে এমন ভাবে যাতে যে সব গ্রামে লোক সংখ্যা ১৫০০ বা তার উপরে তাদের সবগুলিতেই রাস্তার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং যে সব গ্রামে জনসংখ্যা ১০০০ থেকে ১,৫০০-এর মধ্যে তাদের অন্তত অর্ধেক গ্রামে রাস্তা তৈরি হয়। পাঁচ বছরে প্রত্যেক রাজ্যে শতকরা অন্তত পঞ্চাশটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ৪০ লক্ষ শিশু এবং আরো ২৬ লক্ষ ৬ বছরের নীচের শিশু ও সদ্য-প্রসূতি মাতৃ

করছেন এমন মেয়েদের অন্তত একবেলা খাবারের পূর্ণ বা আংশিক ব্যবস্থা হবে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের ৪০ শতাংশকে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি দেওয়া হবে।

এই সব প্রকল্পের জন্য পাঁচ বছরে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৯৮০ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় যে অসঙ্গতি ১৯৭৩-৭৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ২৮০৩ কোটি টাকা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করা হয় এবং ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৯-৮০ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয় হয় মাত্র ৮০০ কোটি টাকা। এবারের গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য মোচনের দিকে যে রকম জোর দেওয়া হচ্ছে তাতে আশা করা সঙ্গত যে এই প্রকল্পের উপর ব্যয় সংক্ষেপের আঘাত নেমে আসবে না। প্রস্তাবিত ৪৯৮০ কোটি টাকার বিনিয়োগ নূতন পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ ৬১,৫৮০ কোটি টাকার মাত্র ৬ শতাংশ। আবার যদি এই প্রকল্পে ঘাটতি পড়ে তাহলে গ্রামবাসীর দুরবস্থা মোচন করে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ন্যূনতম প্রয়োজন সম্বন্ধে যে প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে সেটা সার্থক ভাবে রূপায়িত হলে গ্রামের লোকের দারিদ্র্য অনেকখানি কমবে। কিন্তু এসবই হল অভাব-মোচনের ব্যবস্থা। এর সঙ্গে দরকার উৎপাদনের উন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা। প্রশ্ন জমতেতে সাম্য আনা এই একই ব্যবস্থার অঙ্গ। পল্লী অঞ্চলে যদি উৎপাদন ও শ্রম নিয়োগ বাড়াতে হয় তাহলে একদিকে প্রয়োজন কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং অন্যদিকে কৃষির বাইরে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি। এর সবটাই এমনভাবে করা প্রয়োজন যাতে সরকারি বিনিয়োগ ও প্রচেষ্টার সুফল তাদেরই হাতে আসে যাদের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। নূতন পরিকল্পনাতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প দুই খাতেই বিনিয়োগের পরিমাণ ও অনুপাত বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনার তুলনায় কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ বাড়বে ৪৩০২ কোটি টাকা থেকে ৮৬০০ কোটি টাকা, পল্লী উন্নয়নে ৭৪৩ কোটি টাকা থেকে ২০০০ কোটি টাকা, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৪২২৬ কোটি টাকা থেকে ১৬৫০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পে ৫১০ কোটি টাকা থেকে ১৪১০ কোটি টাকা। আশা করা যায় যে এই বিনিয়োগের সবটাই গ্রামবাসীর উপকারে আসবে। বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো হবে ৭০১৬ কোটি টাকা থেকে ১৫৭৫০ কোটি টাকা—এরও অনেকটা ব্যয়িত হবে পল্লী-অঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসারে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট, গ্রামীণ শিল্প, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য যে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে (ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিতরে ও বাইরে) তাতেও পল্লীবাসীর উপকার হবে।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন—জমি, সার, ভাল বীজ, সস্তা অথচ উন্নত যন্ত্রপাতি, জল, ব্যাঙ্কের ঋণ ইত্যাদি। কিন্তু এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, যাতে যারা সত্যিকারের চাষী তাদের হাতেই জমির মালিকানা আসে। শুধু আইন করে এই কাজ সুব্যবস্থার উন্নীত হওয়া যাবে না, এর জন্য চাই রাজনৈতিক স্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং কর্মকরী স্তরে অবিচলিত নিষ্ঠা ও দক্ষতা। আলাদা আলাদা প্রকল্প বিভিন্ন বিভাগের হাত দিয়ে রূপায়িত করবার চেষ্টা করলে তার ফল হয় খুব অসন্তোষ, এটা অতীতে অভিজ্ঞতাতে বারবার দেখা গিয়েছে। যেটা প্রয়োজন সেটা হল একটা সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা। এবারকার প্রস্তাবগুলি দেখে জনমনের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বলতার, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিতর্কে, বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমলাতান্ত্রিক পরিচালনায়, গ্রামের শক্তিশালী উৎপাদক-ব্যবসায়ী-মহাজনদের প্রতিকূলতায় যদি পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রথমে ব্যাহত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সমস্যার সমাধান আরো বহুগুণে দুরূহ হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে ৬০ কোটি থেকে বেড়ে হবে ১৯৮১তে ৬৭ কোটি, ১৯৮৮তে ৭৬ কোটি এবং ১৯৯১তে আশি কোটি। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯১ এই ১৩ বছরে গ্রামবাসী জনসংখ্যার অনুপাত যদি বর্তমান ৮০ শতাংশই থাকে, তাহলে তাদের সংখ্যা ১৯৯১ তে হবে ৬৪ কোটি। যদি অনুপাতটা কমে গিয়ে ৭৫ শতাংশেও দাঁড়ায় তাহলেও গ্রামবাসীর সংখ্যা হবে ৬০ কোটি। সংখ্যাটা যাতে এতটা না বাড়ে সেদিকে নজর দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন এবং তার জন্যও দরকার গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মানে দ্রুত উন্নতি আনা। জন্মহার কমাবার অনেক পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে সফল পদ্ধতি হল উন্নত জীবন যাত্রার মান এনে দেওয়া এবং উন্নততর মানের জন্য আকাঙ্খার সৃষ্টি করা।

আগামী দশ পনেরো বছরে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বহুগুণে বাড়বে। এই চাহিদা সর্বস্তরে মেটাতে হলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়-সৃজনের কর্মনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য যাতে সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গ্রাম-ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনা এবং গ্রাম-ভিত্তিক সরবরাহের পরিকল্পনা। ভোগ্য-দ্রব্যের বণ্টনে সাম্য আনতে হলে সারা দেশে যে ব্যাপক ব্যবস্থা দরকার হবে, নূতন পরিকল্পনায় তার জন্য সুচিন্তিত কোনো পথনির্দেশ নেই, গ্রামে গ্রামে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য যে সংগঠন দরকার হবে, তারও

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহৎ সঙ্কল্পে একটি বৃহৎ প্রকল্প

একান্ত প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষজমিতে অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের প্রার্থিকাঠি—অধিক ক্রিয়াশীল ও রোগসহনশীল বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল। কৃষকদের এইসব কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের ক্ষেতে খামারে পৌঁছে দেবার পথ নির্দেশ: ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি ব্লকে প্রদর্শন ক্ষেত্র, কৃষক প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস 'বসুমতী' মাটি পরীক্ষা ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কৃষিপঞ্জী ও কৃষি বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে রহিত সফলতায়। সার্থক হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

- সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি,
- প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া,
- কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের সাহায্য করা এবং,
- রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করে তোলা।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ। কৃষিকর্মের সকল স্তরেই এক হচ্ছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ। লক্ষ্য—কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

৯৯ বি, রেসের স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৯ ফোন নং। ২৯২৬৬৮-৬৯

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

শান্তিকুমার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে সদ্য নয়া পঞ্চায়েতের আরম্ভ। নয়া বা নতুন সব অর্থেই। এক তো, আগের চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জেরে এ হল দ্বিস্তর পঞ্চায়েত। তারপর সবচেয়ে উল্লেখ্য, পুরোপুরি রাজনীতির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এই নয়া পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা। এর আগে খোলাখুলি দলীয়ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের লড়াই আর হয়নি। ফলে স্পষ্টই আমূল গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। এর বিস্তৃত যে অনেক গভীরে, নির্বাচনে নিয়ে উৎসাহ, উত্তেজনাই তার প্রমাণ। বুঝি, অন্য দিক দিয়েও নয়া পঞ্চায়েত বিশিষ্ট। এ পঞ্চায়েত অনেক বেশি দায়িত্ব পাচ্ছে, আর্থিক সংস্থান সম্প্রতিও বাড়ছে। কাজেই নতুন পঞ্চায়েতের কাছে প্রত্যাশাও অনেক। নিশ্চয়ই মূল প্রত্যাশা গ্রামোন্নয়ন নিয়েই। আগেই বলেছি, এবার দলীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েত গঠিত। ফলে স্বভাবতই ক্ষমতাসীন দলের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন পঞ্চায়েতের কাজেকর্মে ঘটবেই। এ লেখা যখন লিখছি, তখন পর্যন্ত বিপুলভাবে জয়ী বামফ্রন্ট দলের সরকার বা কমিটি গ্রামোন্নয়নের রূপরেখা, যা থাকে বলে উন্নয়ন ঔদ্যোগের কাঠামো, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় ও ঘোষণা করেননি। তাহলেও কিছু কিছু আভাস তো মিলেছে, নেতৃবৃন্দও কিছু নীরব থাকেন নি, তারই ভিত্তিতে এই আলোচনা। অবশ্য মানি, শিরোনামটি একটু বিভ্রান্তিকর। আসলে হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কি হবে। এখানে বিধায়ী পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সাজত্তামামি করতে বসিনি নিশ্চয়ই, যদিও প্রসঙ্গত সে সব কথা উঠাতেই পারে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্নে এসে দাঁড়াচ্ছি, নতুন পঞ্চায়েতের ভূমিকা কি হবে বা হওয়া উচিত।

বলতে কি, এ ধরনের যে কোনও প্রশ্নের উত্তরই ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে কিছু কিছু লক্ষণ স্পষ্ট। যেমন, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে গাঁ-গঞ্জে ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। ভাল হল, কি মন্দ হল, কথাটা আপেক্ষিক তা নয়। কারণ সে বিচার হবে আপেক্ষিক। তাছাড়া 'ফলেন পরিচীয়তে' বলে সাধু উপদেশ অগ্রাহ্য করিই বা কি করে? কিন্তু এটা ঠিক, গণতন্ত্র একেবারে পরিবেশের কুটিরে, ছোট খামারে, মাঠে গোঁছে গিয়েছে। আগে যার ভাগ্য নির্ণীত হতো মোড়লের ঘরে, সম্পন্ন মানুষের বৈঠকখানায়, সরকার-প্রবাসী বিত্তবানের চেম্বারে, আজ সেই পঞ্চায়েতের ভাগ্য-বিধাতারা দীন হতে দীন থেকে শুরু করে, বলা উচিত, গ্রামের আপামর জনসাধারণ। যদিও দলের হস্তাবলেপ সব সময়ই সুফলপ্রদ হয়েছে বা কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেনি, তা যদি কি করে? সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। বাস্তবে যা দেখছি, দলের পৌরুহিত্যে বা কল্যাণে, যে জন্যেই হোক, একদা অবহেলিত অনেক মানুষ আজ ক্ষমতায় এসেছেন, যাঁদের না আছে অর্থের, সম্পদের কৌলিন্য, না পৃষ্ঠপোষকতা, বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার। আর এক শ্রেণীর মানুষ এসেছেন, যাঁদের কর্মীরূপে পরিচিতি বর্তমান। পুরোনো, যাঁরা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন, দেখবেন তাঁদের এলাকার কর্মপরিচয়ের সাক্ষ্য বিদ্যমান। একটি সাধারণ সূত্র সমান সত্য, তা হল নয়া পঞ্চায়েতসদস্যদের উৎসাহের অভাব নেই। আন্তরিকতাও কম নয়। গড়পড়তা মোটামুটি এই। এ বিশ্লেষণ কিন্তু অহেতুক নয়। বলার উদ্দেশ্য, এবারের পঞ্চায়েত আকৃতিতে যেমন, তেমনি প্রকৃতিতেও আলাদা। দলীয় প্রাধান্য যেমন সুশৃঙ্খলায়, এক মন, এক প্রাণ হয়ে সদস্যদের কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তেমনি ক্ষমতার প্রশ্রয় ও অপব্যবহারের বীজও এর মধ্যে নিহিত। তা বলে শুরুতেই কিন্তু নৈরাশ্যের দান পাইতে চাই না, বরং বেপরীতই আশা করি, প্রত্যাশা রাখি, রাজ্য প্রশাসনে ও পঞ্চায়েতে একই দলের পরিচালনায় কাজের সুবিধা হবে, গ্রামে অনেক অবহেলা ও বঞ্চনার প্রতিকার হবে, পক্ষপাতিত্বের অবসান ঘটবে।

বলা বাহুল্য, নয়া আমলের নীতি নিয়ামকরাও পঞ্চায়েত সম্পর্কে মূল ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করেননি। পঞ্চায়েতই যে গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বার হবে, হওয়া চাই, এ বিষয়ে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা তাঁরাও বলেছেন। এক অর্থে পঞ্চায়েত হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, কাজেই গ্রামের পথঘাট, তার জল, তার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সব কিছুর প্রতিই নজর রাখার দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েতের। বামফ্রন্ট মহল এই মূল নীতি সম্পর্কে নিঃসংশয় যে, গ্রাম পঞ্চায়েত হবে কার্যনির্বাহক, পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধায়ক, জেলা পরিষদ নীতিনিয়ামক, অর্থ বণ্টনকারী কর্তৃপক্ষ। কৃষি উন্নয়ন, কুটির শিল্প সংগঠনের দায়িত্বও পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হবে। তবে নতুন যে দায়িত্ব ন্যস্ত হচ্ছে, তার তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এক কথায় সে দায়িত্ব হল ভূমি সংস্কারের। বেনামী জমি উদ্ধার, ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন, জন-মজুরদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা, এ সব কাজও ঐ দায়িত্বের অন্তর্গত।

নতুন পঞ্চায়েতের কাজকর্মের ধারাকে নিঃসন্দেহে দ্বিমুখী বলতে পারা যায়। এক হল, গ্রামের, গাঁ-বসতির সর্বাঙ্গীণ

কল্যাণ সাধন, দুই হল নানা অবিচার, অন্যায়ের অবসান সংঘটন। কল্যাণকর্মের তালিকায় ঘটাই যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানীয় জল ও কৃষি উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাবে। এ আমাদের মনগড়া কথা নয়। নবনির্বাচিত সদস্যদের অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কেউ যে তত্ত্বকথা তুলে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল বদল না হওয়া পর্যন্ত, সমাজবিপ্লব না ঘটা পর্যন্ত তেমন কিছু করা অসম্ভব, এই যুক্তি দেখাননি, তা নয়, তবে বেশির ভাগ সদস্যই কাজের কথাই বলেছেন। বলেছেন, গাঁয়ে জলকষ্ট মেটাব। সড়ক নির্মাণের, চাষীদের মদৎ দেব, সমবায় গড়ব, বীজ, খুলধন, জল জোগাব। ঘোষণা করেছেন, শোষণ বন্ধ করব, সরীখী হটাব। সড়ক নির্মাণের সাধু এবং আমাদের স্বস্তি, দলমত যাই হোক, নতুন প্রতিনিধিরা গ্রামের একান্ত সমস্যার কথাই ভেবেছেন। দীর্ঘকাল নির্বাচন না হওয়ায় বিগতদী পঞ্চায়েতের ধার, কর্মক্ষমতা, উৎসাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কর্মেমী স্বার্থবোধই কি আর জন্মায়নি? সেদিক দিয়ে নয়া পঞ্চায়েত মাতিরুম তো বটেই। নূতন বলে তার উৎসাহও প্রচুর। ঠোক সঠীক কর্মীদের প্রার্থনা, কর্মীকুলের উপস্থিতি ঘটাই কথার চেয়ে কাজেই উৎসাহ দেবে। প্রাথমিক সংস্থান সমিতি বাড়লে কাজের পরিধিও নিশ্চয়ই বাড়বে। প্রতিনিধিরূপে সাধারণ, সাধুপ্রকৃতাশী মানুষের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিকভাবেই আকাশকুসুম রচনা না করে কঠোর বাস্তবের মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করবে পঞ্চায়েতকে। গাঁয়ের আপনজন গাঁয়ের মানুষের ব্যথা বেদনা বুঝবেন। এ কি কম জরুরী?

এখন দেখা যাক, পঞ্চায়েত আইনে কি করতে পারে। ঘটাই এক্ষেত্রে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সকল পঞ্চায়েতের নজির তুলে ধরতে ইচ্ছে করে। তা এখনই সে কথা থাক। তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গা-ঘরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মূল যা প্রয়োজন, তা হল সঠিক গ্রামীণ নেতৃত্ব। যে গ্রামে একটি ভাল ক্লাব আছে, কিংবা ভাল পল্লীমঙ্গল সমিতি রয়েছে, সে গ্রাম সৌভাগ্যবান। সেখানে কাজের ঘটাবতঘটাই সৃষ্টি হয়, খুব তরুণরা এগিয়ে আসেন। তা সে আর কত গ্রামে আছে? কোটিতে গুটিক। নতুন পঞ্চায়েত সর্বত্র এই নেতৃত্ব নিতে পারেন। পঞ্চায়েতের সদস্যপদের একটি আবশ্যিক শর্তই ছিল, গ্রামীকে তাঁর কেন্দ্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। সেই শর্ত পালিত হয়েছে বলেই ধরে নিচ্ছি। এর মূল তাৎপর্য, পঞ্চায়েতপ্রধানরা গ্রাম চেনেন, গ্রামকে জানেন। ঘই পড়ে তাঁদের গ্রামকে জানতে হয় না বা হবে না। কাজেই কোন্ গ্রামের কি সমস্যা, কোন্ সমস্যার সমাধানকেই বা অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নিয়ে তাঁদের মনে কোনও দ্বিধা থাকার অবকাশ নেই। অতএব, যাকে বলে একেবারে জাদিতে, সমস্যার গোড়ায় তাঁরা নজর দিতে পারবেন। অনেকে বলি কি, গোটা গ্রামের ছবিটা সামনে রেখে কাজের ছক বেঁধে নিন। গোড়ার কাজ গোড়ায় করুন। যে সব কাজ আধা দেব হয়ে পড়ে আছে, সেগুলি আগে সারুন। অনেক গ্রামে দেখি, অকেজো নলকূপ প্রচুর। সেগুলি সারাই করাই কি প্রথম কর্তব্য নয়? নিশ্চয়ই গ্রামবাসী পল্লীতে নলকূপ না থাকলে সেখানে নলকূপ বসাবার কাজকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। গ্রামে যাঁরা কাজ করছেন, এমন অনেক সমাজসেবীকে চিনি। তাঁরা অনেকেই বলেছেন, দেখুন, কাজ করতে চাইলে টাকার অভাব হয় না। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও বুঝি সত্য। অবশ্য কিছু ব্যাপক অর্থে ধরতে হবে। গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রম কি কম মূল্যবান? 'নিজের গ্রাম, নিজে গড়ব,' এ স্লোগান বোধ হয় খুব উপযুক্ত আজ। করুন না ছোট খাল, নিকাশী নালা সংস্কার, গ্রাম্য পথ মেরামত জনসহযোগিতায়। তারপর বড় পরিকল্পনা নিতে পারেন সংস্থান সমতি অনুসারে, সে তো সোনায় সোহাগা। যেমন সেদিন ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনকেন্দ্রের কাঁটি গ্রামে গিয়েছিলাম, দেখি অজস্র নারকোল গাছ, কিন্তু নারকেল ছোবড়ার কোনও ব্যবহার নেই। নবনির্বাচিত একজন সি পি আই এম পঞ্চায়েতপ্রধান দেখার শিক্ষক, বলছিলেন, সমবায়ের মাধ্যমে ছোবড়া শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে। এতে অনেক বেকার ছেলেরও কাজ জুটবে। হাঁ, একেই বলছি, বড় প্রকল্প। স্থানীয়ভাবে এরকম অনেক প্রকল্পই নেওয়া যেতে পারে বৈকি। মোট কথা, নজর থাকা চাই। নিশ্চয়ই সরকারী আনুকূল্য, আর্থিক সাহায্য দরকার। সে তো আগেই বলেছি, সংখ্যাধিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ঘটলে পূর্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর একটা কথা, কেন্দ্র, জাতীয় স্তরে গ্রামের আজ হারানো মর্যাদা। টাকাও যথেষ্ট আসছে, আসবে। বরং মূল সমস্যাই হল সদ্ব্যবহারের। তা এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত যথার্থ নাসরক্ষক, প্রহরি হতে পারেন বৈকি। সংখ্যাধিক্যের সুযোগ বর্তমান, সময় ও সুসময়।

বিগত পঞ্চায়েতের আমলে কোথাও কোনও কাজ হয়নি, এমন রায় যিনি বা যাঁরা দেন, দিন, আমরা দিই না। আমরা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সমষ্টি সেচ প্রকল্প দেখেছি, কৃষকদের সমবায়ে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা দেখেছি। তবে অস্বীকার করি না, সে নজির কম। কিন্তু আগেই বলেছি, পশ্চিম ভারতে সকল পঞ্চায়েতের সাক্ষ্য বর্তমান। কেরলে গৃহহীনদের জন্য এক লাখ ঘর তৈরির প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। মিনি শিল্প উদ্যোগেরও নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ যা বলতে চাইছি, পঞ্চায়েত অসাধ্য সাধন করতে পারেন। পঞ্চায়েত পুরোপুরি গ্রামীণ, ঘটাই গ্রামের মানুষের আপনাজন। সুটকুট পরা প্রশাসনিক অফিসার, ঘটাই সহানুভূতিশীল হোন না কেন, গ্রামের মানুষের পক্ষে তাঁকে আপনজন বলে ভাবা কঠিন।

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সবুজবিপ্লবের কুশীলব

ডঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮। স্বাধীনতার বয়স হ'ল ৩১ বছর। এই দীর্ঘ ৩১ বছরে কৃষি কতখানি এগোল? আর এই প্রগতির সংগে স্বল্পবিত্ত ও প্রান্তিক চাষীরাই বা কতখানি সামিল হতে পেরেছেন? প্রথমে কৃষি প্রগতির বিচার করা যাক। কিন্তু এই বিচারের মাপ-কাঠিটি কি হবে? গড় ফলনের মাপ-কাঠিতে নিশ্চয়ই ভারতের কৃষি অনেক এগিয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যশস্যের ফলন হয়েছিল সাড়ে তিন কোটি টন। ১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ টনে। এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে ৩.৬ গুণ।

শুধু ধান, গম, জোয়ার, বাজরা নয়, ফলন বেড়েছে অন্যান্য সব ফসলেরই। গত ৪-৫ বছরের কৃষিপ্রগতির হিসাব কষে অনেকেই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা শুধু নয় অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য রপ্তানির সম্ভাবনার কথাও বলে থাকেন। ওঁদের এই আশাবাদী চিন্তাভাবনার ভিত্তি হিসাবে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের কথাই বলা হয়ে থাকে। আর সবুজ বিপ্লবের বুনিয়াদ হল অধিক ফলনশীল বীজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক চাষবাস। বিগত দশকে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বেড়েছে। চাষবাস বিজ্ঞানভিত্তিক করা শুরু হয়েছে। সারের ব্যবহার বেড়েছে। চাষের কাজে শক্তির ব্যবহার বহু গুণ বেড়েছে। ট্রাক্টর, পাম্পসেট, স্প্রেয়ার ডাস্টার ইত্যাদির ব্যবহার বেড়েছে। রোগ-পোকা দমনের ওষুধের প্রয়োগ বেড়েছে। সেচের এলাকা বেড়েছে। সেই সংগে আবাদি জমির পরিমাণও বেড়েছে। এক ফসলী জমি দুই ফসলী হয়েছে। দুই ফসলী জমি তিন ফসলী হয়েছে।

১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭৬-৭৭ সালের মধ্যে সারের ব্যবহার বেড়েছে শতকরা ২৪৬.৫৮ ভাগ। ১৯৬৬ সালে প্রতি ১০০০ হেক্টর জমিতে ট্রাক্টরের ব্যবহার ছিল ০.৫৭ শতাংশে। ১৯৭২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১.১২। ১৯৭১ সালের আগে দেশে ২ কোটি ২৬ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচের ব্যবস্থা ছিল। সেচের এলাকা বাড়িয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ হেক্টর করা হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীর শেষে আশা করা যায় এলাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২২ লক্ষ হেক্টর। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর শেষে আবাদি জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৩ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর। ২ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিকে একাধিক ফসলী করা হয়। এক কথায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী থেকেই সারা দেশে যে ব্যাপক কৃষিকর্মযজ্ঞের মহড়া চলেছে, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কৃষিপ্রগতির বর্তমান রূপটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই প্রগতির ব্যাখ্যা করতে কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তর গত দুই দশকের বিপুল অর্থ-বরাদ্দের অঙ্কের কথা বলবেন। বলবেন তাঁদের ব্যাপক উদ্যোগের কথা, কৃষি-শিক্ষা, কৃষিগবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের কথা। কৃষিশিক্ষাকে ছেলে মানুষে দেশে ২২ টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত কৃষি কারিগরেরা শিক্ষা নিয়ে অধিক ফলনের - লড়াই এ সামিল হচ্ছেন। সারা দেশের গবেষকদের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে অধিকফলনশীল বীজ উদ্ভাবন ও চাষপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাকে জোরদার করা হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা নতুন নতুন অধিকফলন-শীল বীজ, নতুন নতুন ফসলপর্যায় এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষবাসের নয়া কলা-কৌশল উদ্ভাবন করে চলেছেন। সম্প্রসারণ

কর্মীরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে চাষবাসের রোজনামচার তালিকা চাষীবন্ধুদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। ফলে চাষীরা প্রশিক্ষিত হচ্ছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ-বাস ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। কৃষিপ্রগতির এই ধারা ক্রমশ এগিয়ে চলছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই ধারায় শতকরা কতভাগ চাষী সামিল হতে পেরেছেন? ফলন-বৃদ্ধির বাৎসরিক মাত্রা কতখানি বাড়তে পেরেছে? কৃষি প্রগতির এই ধারা একর প্রতি ফলনই বা কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে?

হিসাব করলে দেখা যাবে যে, বিগত দুই দশকে কৃষি ব্যবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও দেশের শতকরা

৪৬ ভাগ লোকই কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নীচেই আছেন, খাদ্যোৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার রয়ে গেছে ২.৫৪। একর প্রতি ফলনের মাত্রাও বিশেষ বাড়েনি। আন্তর্জাতিক হিসাবে খাদ্যোৎপাদনে ভারত ৮৭তম দেশ। খাদ্যোৎপাদনে ভারতের বার্ষিক বৃদ্ধির হার যে কোনও উন্নতিশীল দেশের চাইতে কম। কম মিশর, সিংহল এবং পাকিস্তান থেকেও। একর প্রতি ফলনের কথায় পশ্চিমবাংলার হিসাব দেখা যাক। ধান উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা ভারতের মধ্যে প্রথম। এই রাজ্যে ১০০ লাখ একরে আমন, ২৫ লাখ একরে আউস এবং ৮ লাখ একরে বোরো ধানের চাষ হয়। ধান চাষ নিয়েই তোড়জোড় সব চাইতে বেশী। বেশী গবেষণা, বেশী প্রশিক্ষণ, বেশী সম্প্রসারণ। অথচ একর প্রতি এমন কি বোরো ধানের ফলনও বিশেষ এগুচ্ছে না। ১৯৭১-৭২ সালে এই ধানের একর প্রতি ফলন ছিল ১২.৪২ কুইন্টাল, ১৯৭৩-৭৪ সালে ১০.০৮ কুইন্টাল, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১১.৩৬ কুইন্টাল। অথচ জাপানে একর প্রতি ধানের ফলন হল প্রায় ১৭-১৮ কুইন্টাল। গমের ফলনও একই কথা বলবে। গম চাষে পাঞ্জাব প্রথম। পাঞ্জাবে একর প্রতি গমের ফলন হ'ল ১১২ কেজি। অথচ আমেরিকায় একর প্রতি গমের ফলন হল ১৯০ কেজি। এই সব ঘটনা থেকে কৃষি প্রগতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। আসলে কৃষি প্রগতির বর্তমান ধারাটি সাধারণ চাষীদের সামিল করতে পারে নি। কেননা মোট আবাদি জমির মোটা অংশেই তা ছুঁতে পারেনি।

কিন্তু কেন এমন হল? অনেক সমীক্ষকদের মতে, টেকনোলজিকাল গ্যাপ অর্থাৎ কারিগরীবিদ্যার বৈষম্য। এঁদের মতে সাধারণ চাষীরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষবাসের কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছেন না। প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক চাষীর মতে এটি ঠিক নয়। ওঁদের মতে প্রয়োজনমত অর্থের অভাব। সমীক্ষকেরা অবশ্য এই যুক্তিটির কথাও স্বীকার করেন। সাধারণ চাষীদের আর্থিক সুবিধা মেটাতে তাই বিভিন্ন প্রকল্পও হয়েছে। যথা এস্. এফ্. ডি. এ, এম্. এফ্. এ. এল্. ডি. এ, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। তবুও কাজ বিশেষ এগুচ্ছে না। গরীব সাধারণ চাষীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকছেন। তাহলে গলদ কোথায়? কেন সাধারণ চাষীরা বিজ্ঞানভিত্তিক চাষবাসের সামিল হতে পারছেন না?

আরেকটি প্রশ্ন হল, এই সাধারণ চাষী কারা? এরা হলেন স্বল্পবিত্ত আর প্রান্তিক চাষী। রাজ্যে রাজ্যে এঁদের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। তবে অর্থনৈতিক অবস্থা মোটা-মুটিভাবে একই রকমের। শ্রেণীগত বিচারে এঁদের আর এক দোসর আছেন, নাম ভূমিহীন শ্রমিক। স্বল্পবিত্ত, প্রান্তিক, ভূমি-হীন এই তিনে মিলে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্র। সামাজিক বৈষম্যে আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে স্বল্পবিত্ত জমি খুইয়ে প্রান্তিক হন, পরে হন ভূমিহীন শ্রমিক। তাই ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় আর একশ্রেণীর চাষবাসী আছেন। নাম. ভাগচাষী। মালিকের জমিতে চাষ করেন। চাষবাসের দায়দায়িত্ব তাঁর। ফসল মালিকের গোলায় তুলে দিয়ে এসে নিজে কিছুটা ভাগ পান। প্রকৃতপক্ষে এই চার শ্রেণীর মানুষ হলেন সমুদ্রবিপ্লবের প্রত্যক্ষ সৈনিক। এঁদের জীবন কাটে দারিদ্র্যসীমার অনেক নীচে। এঁদের অধিকাংশই নিরক্ষর। এঁরা এক-টানা সামাজিক শোষণের শিকার। এঁরা গ্রামের মানুষ। পশ্চিমবাংলার ৫৪,৯২০টি গ্রামে এঁরা বাস করেন।

গ্রামবাংলার শতকরা ১৩ ভাগের বেশী পরিবার এই সব শ্রেণীভুক্ত। এঁদের কেউ এক একরের কম জমির মালিক, কেউ ১ থেকে ২.৪ একর জমির মালিক, কেউ ২.৪ থেকে ৪.৯ একর, অথবা ৫ থেকে ৯.৯ একর অথবা ১০ থেকে ১২.৪ একর জমির মালিক। কেউ বা অন্য জমির মালিক এবং ভাগচাষ করেন। কারোর জমি নেই শুধু ভাগচাষ করেন। অন্যেরা শুধুই কৃষিমজুর। শতকরা ১৬ ভাগ পরি-বারের জমির পরিমাণ এক একরের কম। শতকরা ৩০ ভাগ পরিবারের জমির পরিমাণ ১ একর থেকে ২.৪ একর। শতকরা ২৭ ভাগ পরিবারের জমির পরিমাণ ২.৪ থেকে ৪.৯ একর। শতকরা ১৯ ভাগ পরিবারের জমির পরিমাণ ৫ থেকে ৯.৯ একর। শতকরা ৪ ভাগ পরিবারের জমির পরিমাণ ১০ থেকে ১২.৫৪ একর। শতকরা ৪ ভাগ পরি-বারের জমির পরিমাণ ১২.৫৪ একরের বেশী।

১৯৭১ সালের হিসাবে দেখা গেছে যে, চাষীর সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ কমে গেছে। এবং কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৮৩.৫ ভাগ বেড়ে গেছে। শতকরা ১১ ভাগ প্রান্তিক চাষী জমি হারিয়ে কৃষিমজুর হয়েছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিমজুরের সংখ্যার হার গেছে আরও অনেক বেড়ে। ১৯৭১-এর পর আর কোনও হিসাব নেই। তবে গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ কৃষি-প্রগতির চেহারা মোটামুটি একই রয়ে গেছে বলা চলে পারে। শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে বিজ্ঞান ছুঁতে পারে না। গ্রামের

শতকরা ৯৫ ভাগ পরিবার সামাজিক দোষে ধুঁকছে। ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তাহলে সবুজবিপ্লব হল কোথায়? সবুজবিপ্লব হয়েছে। সবুজ-বিপ্লব হয়েছে শতকরা ৪ ভাগ বিত্তবান ও শতকরা ৪ ভাগ মধ্যবিত্তচাষীদের ক্ষেত্রে। এঁরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফসল বাড়িয়েছেন। এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী করেছেন। এঁদেরই সুবাদে আপাতত কৃষিব্যবস্থার লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারী তরফের আইনমত সুবিধাগুলিও এরাই ভোগ করছেন এবং বিত্তের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন।

প্রান্তিক, স্বল্পবিত্ত ও ভাগচাষীদের সমস্যা আজ নতুন নয়। ১৯২৮ সালের রয়্যাল কৃষি কমিশনেও এঁদের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে জে. সি. কুমারাপ্পা কমিটি শুধু এঁদের নিয়ে নয় সামগ্রিক-ভাবে ভূমি ও কৃষি সমস্যা নিয়ে সুপারিশ পাশিল করেছিলেন। এই সুপারিশ মেনে নিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা হয়েছিল। মধ্যস্বত্ব লোপ করে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কথা বলা হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানার জমির উর্ধ্ব-সীমা বেঁধে দেবার কথা বলা হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানার জমির নিম্নসীমা বেঁধে দিয়ে ভূমি ভাগ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্তচাষীদের যৌথ চাষবাসের কথা বলা হয়েছিল।

এমনি অনেক ভালো ভালো কথা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সব ভালো ভালো কথা এবং প্রকল্প প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু কিন্তু আইন কানুনও তৈরী হয়েছে। কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে চলতি ব্যবস্থা বহাল রয়েই গেছে। প্রান্তিক, স্বল্পবিত্ত ও ভাগচাষীরা ওঁদেরই জন্য রচিত প্রকল্পের কোনও সুযোগ নিতে পারেননি। সুযোগ নিয়েছেন বিত্তবানেরা। কারণ ওঁরা শিক্ষিত, সুযোগ খুঁজে নিতে বা করে নিতে পটু। প্রান্তিক ভাগচাষী ও স্বল্পবিত্ত চাষীরা অজ্ঞ। দারিদ্র্যের যাতনায় সামাজিক দোষের ঘেরাটোপে বাঁধা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে তাই আইন আরও মজবুত করার কথা বলা হল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নীতি, আইন এবং প্রয়োগের ফারাকের কথা স্বীকার করে স্বল্পবিত্ত, প্রান্তিক ও ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন আইন ও প্রয়োগের বাধ্যবাধকতার কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু তবু অচলায়তন নড়ল না। সুপারিশ আর আইন করে রথের রশি টানবার হাজারো চেষ্টা হলেও দারিদ্র্যের ভগবানের ঘুম ভাঙলো না। স্বল্পবিত্ত, প্রান্তিক ও ভাগচাষীরা বহু পুরাতন পুরাদোসা রোগে ভুগেই চলেছেন। অথচ ওঁদের চাঙ্গা করতে না পারলে কৃষির স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী অগ্রগতি সম্ভব নয়।

উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতার দিকে তাকিয়ে এই ব্যাধির বিচার করলে প্রথমেই আসবে জমির মালিকানা নির্ধারণ বা ভূমিসংস্কারের কথা। তারপর জমির নিম্নসীমা নির্দিষ্টকরণ বা জমির অকিঞ্চিৎকর ভাগ বন্ধ করা। পরিশেষে সমবায়িক বা যৌথচাষে উদ্যোগী করা। কিন্তু কিভাবে এসব সম্ভব হবে? কিভাবে প্রান্তিক, স্বল্পবিত্ত ও ভাগচাষীদের দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি কে দূর করা যাবে?

স্বাধীনতার প্রথম অবস্থা থেকে প্রায় বারেই গ্রামীণ উন্নতির কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। সাম্প্রতিক ভূমিসংস্কার আইন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা গ্রামোন্নয়নের নতুন অঙ্গীকার এনেছে। কিন্তু শুধু সরকারী প্রচেষ্টা বা আইনের উপর নির্ভরশীল হলে এই অঙ্গীকার পূরণ সম্ভব হবে না। সামাজিক ব্যাধি সারাতে সামাজিক উদ্যোগ চাই। কৃষির কর্ম-সূচীতে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই। অবহেলিত বিপুল মানুষ-শক্তিকে চাষ-বাস ও আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের সামিল করে ভিন্ন কৃষিপথের প্রবর্তন চাই।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের এক বছর

অগণিত জনগণের স্বার্থরক্ষায় সরকারের কর্মোদ্যম

২১ জুন, ১৯৭৮—ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের একটি বছর পূর্ণ হয়েছে। এই এক বছরে রাজ্যের বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলায় সরকার একাধিক সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো—গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসাধন। তাছাড়া, এই এক বছরে সরকার—

- বর্গাদারদের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষিত করে আইন তৈরী করেছেন, বেআইনী উচ্ছেদ বন্ধ করেছেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের বাস্তুজমি দিয়েছেন, ৪ একর পর্যন্ত সেচ-সুবিধাযুক্ত এবং ৬ একর পর্যন্ত সেচ-সুবিধাধীন জমির খাজনা রেহাই দিয়ে দরিদ্র কৃষকদের সহায়তা করেছেন।

- পঞ্চায়েত নির্বাচন করে, প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, উন্নয়ন-কর্মসূচীতে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন।

- 'গ্রামের জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর মাধ্যমে বহু গ্রামীণ বেকার কৃষকের কর্মসংস্থান ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করেছেন।

- বেকারভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কর্মপত্রে নাম লেখা বেকারকে।

- শ্রমিকদের ন্যায্য সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এ মদত দিয়েছেন।

- সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ৩৪.১৩ কোটি টাকার ৩২টি শিল্প-প্রকল্প রূপায়িত করেছেন।

- পরিকল্পনা-প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে ৩,২৭০টি পানীয় জল সরবরাহ করার নতুন উৎস এবং খরাত্রাণ কর্মসূচীতে ৮৯০টি উৎস তৈরী করিয়েছেন।

- বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

- শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বস্তরে ঢেলে সাজিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবরকম নৈরাজ্য দূরীকরণের প্রয়াস চালিয়েছেন।

- সবরকম অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছেন এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মদত দিয়েছেন।

আত্মসন্তুষ্টি নয়, জনসাধারণের সক্রিয়
সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগোতে চাই

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই পি আর ৫১৬৩/৭৮

ভারতের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষ কারা এবং তাঁরা কোথায় থাকেন এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র লিখেছেন: "...এক কাঠা জমিও নেই সম্পূর্ণ নিঃস্ব ভূমিহীন গ্রামবাসীর সংখ্যা ১৯৭১-৭২ সালে সারা ভারতবর্ষে ছিল চার কোটির মত। ... এছাড়া ... ছিটেফোঁটা জমি আছে এরকম লোকের সংখ্যা ছিল বিশ কোটির মত। ... এই চব্বিশ কোটির মত লোকেই ভারতবর্ষের দরিদ্রতম অধিবাসী।" (দেশ, ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৮)

ভূমি সংস্কারের পথ ও পাথেয়

বীরেন সাহা

আজ সত্তর দশকের শেষে এসেও এদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণত কৃষিনির্ভরই রয়ে গেছে। ভারতের বড় শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকা এখনো কৃষিই। সুতরাং তাঁদের মধ্যে এদেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়ার ঘটনাটিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং গ্রাম ভারতের বর্তমান চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যের চিত্র তত হতাশাজনক মনে না হলেও উল্লিখিত শ্রেণীর দরিদ্রতম ব্যক্তিদের অনুপাত এ রাজ্যে বেশী। তার একটি বড় কারণ, এ রাজ্যে কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় বেশী,—৭৫ শতাংশ। আর এদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই ভূমিহীন খেতমজুর এবং ছোট স্তরের চাষী যাঁদের এক কাঠা করেও জমি নেই। ১৯৭১ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী এ রাজ্যে কৃষিকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭২ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ৫৩ লক্ষই চরম ভূমিহীন। ২৬তম পর্যায়ের সরকারী নমুনা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ১৯৭০-৭১ সালে এরাজ্যের ৫৫ লক্ষ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ৩৮ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ গড়ে আড়াই একরের নীচে ছিল। ১৫ একরের উর্দ্ধে চাষের জমির মালিকের সংখ্যা এসময় ছিল ৪১ হাজার। কিন্তু তাঁরাই এরাজ্যের কৃষিজমির শতকরা ৫২.৬ ভাগ জমি ভোগ করছেন। বাকী কৃষিজমির মধ্যে (এ রাজ্যে মোট কৃষি-জমির পরিমান ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর) ২২ শতাংশ বাদ দিয়ে উল্লিখিত ৩৮ লক্ষ পরিবারের জন্যে যে ছিটেফোঁটা জমি আছে তা থেকে তাদের অনেকের পক্ষেই জীবন ধারণ অসম্ভব। কিন্তু, যে কথা একটু আগেই বলা হল, তাঁরা ছাড়াও এ রাজ্যের অর্থনীতিতে অন্যবাসী এক বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবি রয়েছেন, যাঁদের হাতে কোন জমি নেই, তাঁরা জমিতে মজুরি খেটে পেট চালান। তাঁদের সংখ্যাটা হিসেব করলে আঁতকে উঠতে হয়। কেননা এ রাজ্যের কৃষিজীবি জনগণের মধ্যে তাঁরা শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ, সংখ্যায় প্রায় তেইশ লক্ষ। প্রায় ১৩ লক্ষ প্রান্তিক কৃষিপরিবার (যাঁদের এক কাঠা করেও জমি নেই) এবং ২০ লক্ষ ভূমিহীন খেতমজুর পরিবার -এঁরাই পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম মানুষ। এবং প্রতি পরিবারে পাঁচজন করে সদস্য-সংখ্যার ভিত্তিতে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো চলে যে মোট ৫৫ লক্ষ পরিবারের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে চরমতম দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। অথচ মুখ্যত এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই স্বাধীনতার পরে গত তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ফসলের উৎপাদন একশ ভাগ বেড়েছে। শুধু ধানচাষে নয়, অধিকন্তু নানা ফসলেও উৎপাদনের এই অভাবনীয় উর্দ্ধগতি আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু যাঁদের পরিশ্রমে ধানচাষের উৎপাদনে এই অসাধারণ

জনসংখ্যা তাঁরাই অর্থাৎ এই ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ এই সমৃদ্ধির সুফল থেকে প্রায় বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, গত তিন বছরে তাঁদের জীবনযাত্রার মান ক্রমনিম্নগামী হয়েই রয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নীচ থেকে ওপরে ওঠানো দূরের কথা। গ্রাম-বাংলার যে দরিদ্রতম ৩৫ লক্ষ কৃষিশ্রমিক পরিবার বা তাদের মোট জনসংখ্যার যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষের কথা বলা হল তাঁরা ছাড়া আরো ২৩ লক্ষ কৃষি পরিবার বা ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রার মানে তেমন হেরফের ঘটেনি। কাজেই আজ যখন সারা দেশে গ্রামাঞ্চলের জনজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গে স্বভাবতই এই প্রায় তিন কোটি লোক যে প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

অবশ্য তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হয়েছিল সেই স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রথম দশক থেকেই। ভূমি-নির্ভর এই বিপুল জনসমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থাটি সবার আগে নেওয়া হয়েছিল তা হল এই কৃষল ফলানোর কারিগরদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বড় অবলম্বন যে জমি সেই জমির অধিকার দেওয়া। ১৯৫৩ সালে তাই সারা দেশে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর কলঙ্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিজনিত মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারী প্রথার অবসান ঘটানো হল। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হল। চাষীরা এর ফলে সরাসরি সরকারের অধীনে এলেন। পশ্চিমবাংলাও ১৯৫৪ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন পাশ হল। এ রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এই আইনে প্রাক্তন জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিনে নেওয়া কৃষি জমি কীভাবে ভূমিহীন এবং দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে তার নির্দেশনা ছিলনা, ছিলনা বর্গাদারী প্রথার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। তাই ১৯৫৫ সালে পাশ হল ভূমিসংস্কার আইন। ১৯৭২ সালে এই আইনের সংযোজিত সংশোধনীতে কৃষিজমির সর্বোচ্চ মালিকানা আরো কমিয়ে পারিবারিক ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছিল। তাতে দুই থেকে পাঁচ সদস্যের পরিবার নিজ জমির সর্বোচ্চ মালিকানার পরিমাণ ধার্য হল সেচ এলাকায় ১২.৩৬ একর এবং অসেচ এলাকায় ১৭.৩ একর।

আশা করা গিয়েছিল, এই দুই আইন বলবৎ করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যে মুষ্টিমেয় বৃহৎ জোতদারদের হাতে বিপুল পরিমাণ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল তার থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ একর পরিমাণ জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন খেতমজুর ও ছোট জোতের চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের দারিদ্র্যমোচনে সহায়তা করা যাবে। কিন্তু জমির মালিকানার ওপর এভাবে ঊর্ধ্বসীমা আরোপ এবং ঐ সীমার অতিরিক্ত জমি উদ্ধারের কাজ নানা কারণে খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কারণ, যেসব বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের হাতে এ রাজ্যের কৃষিজমি কেন্দ্রীভূত ঔপনিবেশিক ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর করেও তাদের হাত থেকে অনেক জমিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কেননা অনেক জমিই তাঁরা নানাভাবে বেনামী করে রেখেছেন। তাছাড়া বেশ কিছু জমি সিলিং-বহির্ভূত মেহগনি, চা-কফি বাগান, দেবোত্তর, পুকুর প্রভৃতি জমি হিসেবে দেখিয়ে তাঁরা জমির ওপর অধিকার পুরো বজায় রেখেছেন। ফলে বিগত ২৪ বছরে এরাজ্যে যে পরিমাণ জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পেরেছেন তা বণ্টন করে মোট ভূমিহীন কৃষিপরিবারের তিনভাগের একভাগের ন্যূনতম জমির চাহিদাও মেটানো যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরাজস্বমন্ত্রী গত মার্চ মাসে রাজ্য বিধানসভায় বাজেট ভাষণে জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য—পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ মার্চ, ১৯৭৮ সংখ্যা), জমিদারী গ্রহণ ও ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগ করে এ রাজ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একর কৃষিজমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। তার মধ্যে নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একর জমি সরকার দখল নিতে পেরেছেন এবং তা থেকে ঐ সময় পর্যন্ত ছয় লক্ষ সাতাশ হাজার একর জমি এ রাজ্যের নয় লক্ষ ছিয়াশী হাজার ভূমিহীন এবং গরীব চাষী এবং খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। গড়ে প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষক জমি পেয়েছেন এক একরের দুই-তৃতীয়াংশ। তাছাড়া আট হাজার সাতশ একর জমি ভূমিহীনদের বসতভূমি তৈরীর জন্য দেওয়া হয়েছে। বাকী আড়াই লক্ষাধিক একর কৃষিজমির মধ্যে প্রায় দু লক্ষ একর জমি বণ্টন করা যায়নি। তার কারণ প্রায় ৭৩ হাজার একর জমি সরকারী দখলে আসার পর আদালতের ইনজাংশনে আটকে আছে এবং প্রায় এক লক্ষ সাতাশ হাজার একর জমি কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযোগী বলে জানা গেছে। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে আরো জানিয়েছেন, দেওয়ানী আদালত ও হাইকোর্টের ইনজাংশনে আবাদযোগ্য প্রায় দুলক্ষ একর কৃষি জমি সরকার দখল নিতে পারছেন না।

এভাবেই গত ২৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের কাজ এগিয়েছে। আর তার ফলে এ রাজ্যের মোট কৃষিজমির প্রায় শতাংশে মাত্র গত আড়াই দশকে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা সম্ভব হয়েছে। এই হিসেব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ১৩ জানুয়ারী, ১৯৭৮ সংখ্যায় এ রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থার এক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার ভূমিহীন খেতমজুর এবং ১৫ লক্ষ প্রান্তিক চাষী রয়েছেন যাদের জমির চাহিদা অবিলম্বে মেটানো প্রয়োজন। এঁদের পরিবার পিছু এক একর জমি দিতে হলে মোট ৩৫ লক্ষ একর জমি দরকার। সে জায়গায়, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া

হিসেব, মাত্র ৬ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। কাজেই গ্রামবাংলার বিপুলসংখ্যক মানুষকে আশাবাদী করে তুলবার, তাদের মুখে অন্তত দুবেলা অন্ন তুলে দেবার চেষ্টা খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি।

কাজ পশ্চিমবঙ্গের যে ২৯ লক্ষ দরিদ্রতম কৃষিজীবি বেঁচে থাকার অবলম্বন এক একরের মত কৃষিজমির অধিকার এখনো পেলেন না তাঁদের বর্তমান ভূমিসংস্কার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে জমি পাওয়ার আশা রয়েছে কিনা এরকম একটা প্রশ্ন অর্থনীতিবিদ মহলে উঠেছে। কেননা জমির সর্বোচ্চ মালিকানার উর্ধসীমার অতিরিক্ত বেনামী জমি এখনো বড় বড় জোতের মালিকদের হাতে রয়েছে তা উদ্ধার করা গেলেও তাঁদের সবাইকে জমা বিলি করার মত জমি পাওয়া যাবে না। রাজ্য ভূমিরাজস্বমন্ত্রী তাঁর "বাংলার ভূমি ব্যবস্থার রূপরেখা" পুস্তিকায় স্পষ্টতই বলেছেন: "প্রান্তিক চাষীর ওপরের দিকে কিছু বাদ দিয়ে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী নিয়ে অন্তত ৩০ লাখ পরিবারের জন্য, পরিবার পিছু ১.৫ একর করে দিতে ৪৫ লাখ একর জমি দরকার। জমিদারদের কোন জমি না রাখতে দিয়ে সমস্ত জমি নিলেই একমাত্র তা পাওয়া সম্ভব।" (পশ্চিমবঙ্গ, ২৬ আগস্ট, ১৯৭৭ সংখ্যা)

কিন্তু এই সমস্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের জন্য কীভাবে নিয়ে নেয়া যেতে পারে? জমির মালিকানার উর্ধসীমা আইন বজায় রেখে তা সম্ভব নয়। এজন্য এরাজ্যের বা সারা দেশের ভূমিহীনদের এবং ছোট গরীব চাষীদের জমি দিতে হলে দেশের বা রাজ্যের সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে তার পুনর্বণ্টন করতে হবে। অবশ্য সে প্রশাসনিক সাধন যদিই বা করতে পারা যায় তবু তার দ্বারা সত্যিকারের ভূমির সংস্কার সাধন হবে না বা দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর কৃষিজীবির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। কেননা কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিপদ তা সহায়ক হবে না। সাম্প্রতিক কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এর কারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯৭১ সালের গণনা থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ ০.১৩ হেক্টরেরও কম। এই সামান্য পরিমাণ জমিও যদি প্রত্যেক ভূমিহীন পান তাতে তারা কস্মিন্‌কালেও নিজের ভরণের পরে উঠতে পারবেন না। কারণ কেউ কেউ হিসেব করে দেখিয়েছেন, একটী চাষী পরিবারকে কৃষি থেকে ভরণপোষণ করতে হলে কমপক্ষে ১০ একর করে জমি দিতে হবে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য, যে নয় লক্ষ ছিয়াশী হাজার ভূমিহীনকে গত কয়েক বছরে প্রায় দুয় লক্ষ সাতাশ হাজার একর জমি দেয়া হয়েছে (প্রত্যেককে গড়ে এক একরের দুই-তৃতীয়াংশ করে) তাঁরা সে জমি নিয়ে সবাই যে ব্যক্তিগতভাবে চাষাবাদ করছেন তা নয়। অর্থনীতিবিদ অনেকে কৃষ্ণ তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী জমি পাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা ১০ শতাংশ বেড়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা অনেকেই অভাবের তাড়নায় বা জমি চাষ করার মত সঙ্গতি না থাকায় হয় সে জমি বিক্রী করে দিচ্ছেন, নয়তো মাঝারি ও ধনী চাষীদের হাতে বর্গা প্রথায় চাষ করবার জন্য দিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে ক্ষুদ্র জমির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এ ঘটনা শুধু নতুন পাওয়া জমির ক্ষেত্রেই ঘটছে না। ২৬তম-পর্যায়ের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, আধ একর বা তার কম জমি রয়েছে এমন পরিবার ৯৯ ভাগ চাষীরই জমিচাষ করার মত হাল ও লাঙ্গল নেই। সেচের ও সারের ব্যবস্থা তো দূর অস্ত। এই সমীক্ষার আরো প্রকাশ, ১.২৫ একর থেকে ২.৫০ একর আয়তনের জমি করছে এমন চাষীর শতকরা ২৫ ভাগেরই হাল বলদ নেই। ফলে অনেকেই তাঁদের জমি বর্গা হিসেবে ধনী ও মাঝারি চাষীদের দিয়ে দেয়া এবং একেবারে বিক্রী করে দিয়ে ক্ষেতমজুর হয়ে যাওয়ার পথ নিচ্ছেন। সম্ভবত একারণেই ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা এরাজ্যে বেড়েই চলছে।

অবশ্য সরকার এ অবস্থার প্রতিকারে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে পাশ করা একটী আইনে যেসব দুয় ক্ষুদ্র চাষী (২ হেক্টরের কম জমির মালিক) অর্থনৈতিক কারণে তাঁদের জমি বিক্রী করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ১৬ হাজার চাষী এ ব্যবস্থার সুযোগ পেয়েছেন, যদিও আবেদন করেছিলেন দেড় লক্ষ চাষী।

এছাড়া বর্তমান রাজ্য সরকার ছোট জোতের চাষীদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণের ব্যাপক ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। কিন্তু দরিদ্রতম চাষীদের অনেকের পক্ষে তা নিয়ে এতদিন উন্নত প্রথায় চাষ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই যেসব ছোট চাষী ভূমিসংস্কারের ফলে জমি পেয়েছেন এবং যাঁদের জমির পরিমাণ এক একরেরও কম তাঁরা যদি সমবায় প্রথায় জমি চাষ করেন তাহলে তাঁদেরও উপকার হবে এবং সেই সঙ্গে

জমির ফলনও বাড়বে। রাজ্য ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর এবারের বাজেট ভাষণে এ প্রসঙ্গেই ছোট ছোট চাষীদের নিয়ে সাভিস কো-অপারেটিভ গঠনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "ছোট ছোট চাষীদের নিয়ে সার্ভিস কো-অপারেটিভ গঠন করলে এবং সে সব সমবায়কে উপযুক্ত বীজ, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষির উপকরণ দিলে চাষীর এবং চাষের পক্ষে বেশি উপকার হবে। একথা আমরা স্বীকার করি যে, একজন ভূমিহীন চাষীকে শুধু এক একরের মত জমি দিলেই তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা কৃষি দপ্তর এবং সমবায় দপ্তরের সঙ্গে একযোগে এই বিষয়ে কাজ করতে চাই।" (পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ মাঘ, ১৩৭৮ সংখ্যা)।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকমাস আগে অনুষ্ঠিত ভূমি-সংস্কার সম্পর্কিত এক আলোচনাচক্রে কৃষি-অর্থনীতিবিদ ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন যে ছোট জোত কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিপন্থী। ফলে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীনদের মধ্যে এক একরের দুই-তৃতীয়াংশ করে জমি বণ্টনের যে চেষ্টা চলছে তাতে চাষ এবং চাষী কারুর পক্ষেই লাভজনক হবে না। কিন্তু রাজ্য ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী যে সার্ভিস কো-অপারেটিভ গঠনের কথা বলছেন তা যদি বাস্তবে রূপ পায় তাহলে ডঃ মণ্ডল-কথিত সমস্যার সুরাহা হয়। উল্লিখিত আলোচনাচক্রে ভূমি-সংস্কার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অধ্যাপক অসিত ভট্টাচার্য বলেছেন, এক্ষেত্রে বর্তমানের মত অস্থায়ী সমাধান নয়, ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। তাঁর মতে, চাষ করবেন যিনি জমির মালিকানা একমাত্র তিনিই পাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে জমির ছড়ানছিটানো একটা বড় বাধা হয়েই থাকবে। কেননা সমস্ত চাষীদের এক একর করে বণ্টন করবার মত কৃষি জমি এরাজ্যে নেই। জমি এমন সম্পদ যা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মত বাড়ানো যায় না। সুতরাং যতদিন না এমন প্রযুক্তিবিদ্যা আমরা কৃষিক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে পারছি যাতে জমির প্রয়োজনটা কৃষি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ততদিন ভূমিহীনদের জমির ভুষা মেটাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই কৃষি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে ছোট জোতের চাষীদের দ্বারাও বড় পরিকল্পনার মেলে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন অসম্ভব কিছু নয়। তবে ভূমিহীনদের জমির মালিকানা দেবার কর্মসূচীকে সফল করতে হলে সমস্ত জমিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। খাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ ভরদ্বাজ সহ উল্লিখিত আলোচনাচক্রের সমাপ্তি ভাষণে জমির এই আংশিকরূপের প্রয়োজনীয়তার ওপরেই জোর প্রয়োগ করেছেন।

অবশ্য জমির সমস্যা মিটলেও গ্রামবাংলার উল্লিখিত দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের সমস্যা থেকেই যাবে যদি না গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত কৃষিনির্ভর শ্রমশক্তি পরিপূরক জীবিকা হিসাবে কুটীর এবং কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্রশিল্পে নিয়োজিত করা যায়। সুখের কথা, সরকারের সামগ্রিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এবিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছে

ইতিমধ্যে ভূমিসংস্কারের যে স্থায়ী সমাধানের কথা বলা হল, তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম ভূমিহীন খেতমজুর ও ছোট চাষীদের স্বার্থে রাজ্য সরকার কয়েকটি আশু কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করছেন। তার একটি হল, জমির মালিকানার বর্তমান সিলিং-এর ঊর্দ্ধে যে সমস্ত বেনামী জমি করে রাখা হয়েছে, তা উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা। দ্বিতীয়ত, ভূমিহীন বা ছোট জোতের যেসব চাষী বর্গাদার হিসেবে চাষ করে বর্তমানে ভরণপোষণ করছেন তাঁরা যাতে ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বড় জমির মালিকদের দ্বারা জমি থেকে উৎখাত না হন তার জন্য রাজ্য সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাদারদের সম্পর্কে একটি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা বর্গাদারদের অন্যায় ও অহেতুক উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য ভূমি সংস্কার আইনে 'ব্যক্তিগত চাষ' কথাটির সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারী খতিয়ানে তাদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সেটেলমেণ্টের যে কাজ চলছে তাতে বেনামী জমি উদ্ধার ও বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্তির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। গত সেটেলমেণ্টে এ রাজ্যে ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। এবার রাজ্য সরকারের আশা, ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত হবে। এই রেকর্ডভুক্তির দরুণ বর্গাদারেরা শুধু যে আইনগত সুবিধা পাচ্ছেন তা নয়, উন্নত প্রথায় অধিক ফসল ফলানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকেও এর ফলে তাঁরা ঋণ পেতে পারবেন। ফলে জমির মালিকদের কাছে তাদের জমির জন্য আর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হবে না।

গ্রাম বাংলার সবচেয়ে দলিত অংশ ক্ষেতমজুর, সেই ২০ লক্ষ ভূমিহীন খেতমজুরের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁদের সবাইকে জমির মালিকানা দেয়া স্পষ্টতই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁদের আশু ত্রাণের কিছু ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিয়েছেন মজুরী বৃদ্ধি করে। এই বর্ধিত মজুরী তাঁরা সবক্ষেত্রেই সত্যিসত্যি পাচ্ছেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এই প্রয়াস তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তা সুনিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করা চলে।

পল্লীবিকাশে সমবায়

নিরঞ্জন হালদার

সর্বশেষ আদমশুমারি অনুসারে ভারতের শতকরা আশি জন অধিবাসী এখনও গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। আবার দীর্ঘদিন ধরে শিল্প ও শহর উন্নয়ন সত্ত্বেও কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত অন্যান্য দেশের মতো হ্রাস পায়নি। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ওই সময়ে দেশের মোট কর্মীর ৭৪ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল, ১৯৭১ সালের আদম-শুমারিতেও কৃষির উপর নির্ভরশীল কর্মীর ওই একই হার বজায় থাকতে দেখা যায়। শিল্প ও কৃষির উন্নতি সত্ত্বেও এখনও দেশের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অধিবাসী দরিদ্র এবং এদের বেশীর ভাগ গ্রামেই বসবাস করেন। কাজেই ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে-কোনো প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের উপর বেশী জোর না দিয়ে উপায় নেই। অনেকে অবশ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়নের ব্যাপারে আজকাল দুটি প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন: এক, সমবায়, দুই, পঞ্চায়েত। আদর্শ হিসাবে বহু-দলীয় গণতন্ত্রে অধিবাসী হয়ও অনেকে পঞ্চায়েতকে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের মাধ্যম করতে চাইছেন। কিন্তু ভারাণ্ড্ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের একটা বিকল্প সমাজব্যবস্থা হিসাবে এদেশে সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন না। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার হয় এবং বিভিন্ন দেশে উৎপাদন-সমবায়, সেবা সমবায়, সমবায়-ব্যাঙ্ক এবং ক্রেতা সমবায় গড়ে ওঠে। বর্তমানে যে-সব দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, সে-সব দেশেও সমবায়-বিপণির একটা ভূমিকা আছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা চালু করে সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকেন।

গত শতাব্দীতে ইউরোপে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য দেখে এদেশে বরোদায় প্রথমে মহারাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য ইংরেজ সরকার সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। ভারতে প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ১৮৮৯ সালে, সমবায় সমিতি আইন পাস হওয়ার ১৫ বছর আগে। বরোদায় মহারাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত এই সমবায় ব্যাঙ্কের নাম ছিল "অন্যন্যা সহায়কারী মাণ্ডলী লিমিটেড"। ১৯০৪ সালে চালু সমবায় আইনে ব্যবস্থা হল প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি গঠনের। সরকার এই সমিতির মাধ্যমে কৃষি-ঋণ বিলির ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ সালের আইনে অন্য ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না, প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির কাজকর্মের সমন্বয়ের জন্য কোনো সংস্থা গঠনের ব্যবস্থাও আইনে ছিল না। ১৯১২ সালে সমবায় আইন সংশোধনের পর প্রাথমিক সমবায় সমিতি, জেলা-স্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রদেশ-স্তরে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুযোগ হয়। ১৯১৯ সালের ভারতীয় সংবিধানে "সমবায়" প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের আওতায় আসে এবং তখন থেকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান ও আইন হতে থাকে।

যাই হোক, বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৮টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক অন্তত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের বেশীর ভাগ জায়গায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি সম্ভব করেছে। সার, বীজ, কৃষি, শিল্প, পশুপালন, মৎস্যচাষ ও মৎস্য শিকার, পরিবহন, বাসগৃহ-নির্মাণ, পণ্য বিক্রি প্রায় সর্বত্রই সমবায়ের উপস্থিতি কম-বেশী লক্ষণীয়। সমবায়-ভিত্তিতে পরিচালিত চিনি-কলগুলি বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত চিনি-কল মালিকদের ক্ষমতা খর্ব করেছে। গুজরাতে সমবায়-ভিত্তিতে পরিচালিত ডেয়ারিগুলির মধ্যে "আমূল" উৎপাদন-সংস্থা তো এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়-বিপণন আন্দোলনে গতি দুলতে সচেষ্ট হলেও এই আন্দোলন এখনও শহর-এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। ১৯৬৯ সাল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে কম-খরচে ঋণ দেওয়ার জন্য প্রাথমিক সমবায়সমিতিকে বেছে নিচ্ছেন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সালে গঠিত গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ দিতে সচেষ্ট। কৃষি-পণ্য কেনাবেচার ব্যাপারে সরকার সমবায় সংস্থাকে মদত দিলেও কৃষকদের নিকট থেকে ভুট্টা, পাট বা গ্রামাঞ্চ কেনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলি, যেমন

জুট কর্পোরেশন, তুলা কর্পোরেশন, অনেক সময় সমবায় ও কৃষকের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছেন বলে অভিযোগ শোনা যায়।

১৯৬১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলের জন্য ক্ষুদ্র চাষী ও প্রান্তিক চাষীর উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বত্য বা উপজাতি এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি চালু করেছেন। এগুলির সঙ্গে সমবায়-সমিতির কাজের সমন্বয়ের অভাবে গ্রামাঞ্চলে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন। যে-সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা সমবায়-মন্ত্রীদের বর্তমান গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর মতো সমবায়-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নেই, সেই সব রাজ্যে সমবায়-দপ্তরের কর্মীরাই কার্যত সমবায়-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করেন। জনসমর্থনের ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতাও ওইসব রাজ্যে হ্রাস পাচ্ছে। কোথাও কোথাও সমবায়-মন্ত্রী বদল হলে সমবায়-সমিতির পুরানো পরিচালকমণ্ডলী ভেঙে দিয়ে সেখানে নিজের দলের লোক নিয়ে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গড়া হয় নতুবা প্রশাসকের উপর সংস্থার পরিচালনভার দেওয়া হয়। সমবায়-সমিতির পরিচালকমণ্ডলীতে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা মহারাষ্ট্রের মতো মাত্র কয়েকটি রাজ্যেই আছে। সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সম্মেলনে এবং গত ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সমবায়-মন্ত্রীদের সম্মেলনে বেসরকারী ব্যক্তিদের দিয়ে সমবায় সংস্থা পরিচালনার উপর জোর দেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মোহন ধারিয়াও সরকারী অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ থেকে সমবায় আন্দোলনকে মুক্ত রাখার মাধ্যমেই সমবায় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা সম্ভব বলে মনে করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে রাজস্তরে এই মনোভাব দেখা যাচ্ছে না।

গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন খুবই দুর্বল। অবিভক্ত বোম্বাই রাজ্যের ডঃ ভি. আর. গাডগিল, বৈকুণ্ঠভাই মেহেতা প্রভৃতি দল-নিরপেক্ষ, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মতো কেউ এ-রাজ্যে সমবায় আন্দোলনে যুক্ত থাকেননি। এ-রাজ্যের শক্তিশালী আরবান ব্যাঙ্কে প্রধানত কলকাতা শহরের সীমাবদ্ধ। সমবায় বাসগৃহ নির্মাণ ঋণদান সমিতি গত বছর তিন কোটি টাকার মতো ঋণ দিলেও তা পেয়েছে প্রধানত কলকাতার বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের মালিক ও মফস্বলের শহরে এলাকার কিছু উঁচু বেতনের লোক। এবং প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে ওই ঋণের টাকা ও সুদ আদায় করা হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও সমবায় সংস্থার পক্ষে রেশন দোকান চালানো সম্ভব হয়নি দোকানের হিসাব-পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অডিট-ফি'র দরুন। পরিচালন ব্যবস্থায় পলাদ, যোগ্যতার বদলে জানাশোনার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ ছাড়া টাকার লেনাদেনের পরিমাণের ভিত্তিতে অডিট-ফি নির্ধারণও ক্ষেত্রে সমবায়ের দোকসানের কারণ। এসব সত্ত্বেও, রাজ্যের এই একটি প্রতিষ্ঠান শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলকে যুক্ত রেখেছে। এ-রাজ্যে শিল্প-সমবায়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ হলেও তাঁতশিল্প সমবায় প্রতিটি জেলাতেই ছড়িয়ে আছে। পরিবহণ, মৎস্যচাষ, ফল সংরক্ষণ সমবায়ও বিভিন্ন জেলায় দেখা যাবে। কৃষি-সমবায়গুলি আজকাল কেবল

ঋণই দেয় না, সার, বীজ, নিয়ন্ত্রিত-দরে কৃষিপণ্যের কাপড়ও বিক্রি করে থাকে। জুট কর্পোরেশন আরও বেশী সংখ্যক সমবায়-সমিতির মাধ্যমে ন্যায্যদামে চাষীর ঘর থেকে পাট কেনার কথা ভাবছেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কম-খরচে ঋণ দেওয়া ও টাকা আদায় করা সহজ বলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কে এ-রাজ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে বহু ছোটখাট কৃষক ও বস্ত্রশিল্পীদের ঋণ দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত দামে দরিদ্র মানুষের অতি প্রয়োজনীয় আটটি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করছেন। একমাত্র সমবায় বিপণনের মাধ্যমেই ওইসব পণ্য গ্রামবাসীদের নিকট সহজলভ্য করা সম্ভব। সমবায় সংস্থাই খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করতে পারেন, তাঁতশিল্পীদের প্রয়োজনীয় সুতোও নিয়ন্ত্রিত দামে সরবরাহ করতে পারেন।

সমবায় সংস্থাগুলিকে লক্ষ্যোন্নয়নের কাজে লাগাতে হলে এক দিকে সমবায়-সমিতির মধ্যে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের নিয়ে আসতে হবে এবং অন্যদিকে কৃষির প্রয়োজনীয় ঋণ, সার, বীজ, কীটনাশক, খাবার তেল, কেরোসিন প্রভৃতি সরবরাহ ছাড়া, কৃষিপণ্য ও কুটির শিল্পজাত পণ্য বিক্রি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান প্রকল্পও হাতে নিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সমবায় সমিতি থেকে কম-সুদে ঋণ ছাড়া নিয়ন্ত্রিত দামে সিমেন্ট, লোহা প্রভৃতির বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রের জনতা সরকার ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট তৈরির জন্য টাকার বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। সমবায়-সমিতির মাধ্যমে ইঁট কাটা ও রাস্তা তৈরির কাজ সম্ভব হলে বরাদ্দ টাকার

সম্ভার হবে। সমবায়-সমিতির মাধ্যমে নতুন নতুন বাজার করে সদস্যদের স্ব-নির্ভরশীল দোকানদার হওয়ারও সুযোগ দেওয়া যায়।

সমবায় সংস্থাগুলিকে দিয়ে এইসব দায়িত্ব পালন করাতে হলে সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালন ব্যবস্থা অনেক উন্নত করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকেরা প্রায়শ ঋণ নিয়ে সদস্যদের আনুগত্য কেনেন, সেইজন্য অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। ঋণের টাকা অনাদায়ী রাখাই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের দুর্বলতার প্রধান কারণ। রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য ও ডঃ অতিন্দ্রিয় দত্ত নদীয়া জেলার সমবায় ব্যবস্থা (কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং ইন ইন্ডিয়া : কো-স্টাডি অব নদীয়া, ১৯৭৭) সমীক্ষা করে বলেছেন : ব্যাংকের প্রধান পরিচালক ব্যাংকের কর্মী নন, সমবায় দপ্তরের লোক। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছাড়া উঁচু স্তরের প্রায়শই অফিসার সমবায়-দপ্তর থেকে ডেপুটেশনে এসেছেন। ব্যাংকের কোনো স্টাফ-পলিসি নেই বা ব্যাংকের কর্মীদের ট্রেনিংয়ের ভাল ব্যবস্থা নেই। পরিচালকমণ্ডলীর সভার বিবরণী থেকে দেখা যায়, কোনো সভাতেই কৃষি ঋণ সম্প্রসারণ, অ-কৃষি সমবায় সমিতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার নিয়ে আলোচনা হয়নি। পরিচালকমণ্ডলীতে আছেন তিন জন সরকারী প্রতিনিধি, ৫ জন বেনী-জমির মালিক, দুজন আইনজীবী, একজন ব্যবসায়ী, একজন ডাক্তার ও দুজন স্কুল-শিক্ষক। (পৃঃ ১৭)। এদের মধ্যে হিসাব-জানা বা সমবায়-বিশেষজ্ঞ কেউ নেই। অথচ ব্যাংকের কোন্ অফিসার হিসাব রাখবেন, কে রিটার্ন ও স্টেটমেন্ট তৈরি করবেন, তা পরিচালকমণ্ডলীই স্থির করেন। এই প্রশাসন দেখার ভার ব্যাংকের ম্যানেজার ডিরেক্টরেরও নেই। সমবায়-ব্যাংক কর্তৃক ঋণের ব্যবহার তদারক করার কথা, কিন্তু তদারকির কোনো ব্যবস্থা নেই। ডঃ ভট্টাচার্য ও ডঃ দত্ত তাঁদের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির নিয়ম-কানুনের ৬০ ধারা সংশোধন ছাড়া আরও অনেক সুপারিশ করেছেন। সমবায় ব্যাংকের প্রশাসন দক্ষ ও দুর্নীতি-মুক্ত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার উপরেই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের ভূমিকা নির্ভর করছে।

এদেশে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি ও পল্লীবাসীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে সমবায় সমিতির কোনো বিকল্প নেই। সরকারী কর্মীদের উপর নির্ভর করেও সমবায় আন্দোলনের ত্রুটিগুলি দূর করা যাবে না। এ-সব কথা মনে রেখে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর মতো সমবায়-আন্দোলনকে অঘোষিত গুরুত্ব দেন, তা হলেই এ-রাজ্যে সমবায় সংস্থাগুলির কর্মক্ষেত্র আরও বাড়ানো এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, বর্তমান সমবায় আইনের ত্রুটিগুলিও সংশোধিত হবে এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের মতো সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সমবায়-আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসা সহজ হবে। এতদিন পরে বর্তমান যোজনায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের উপর অঘোষিত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সমবায় আন্দোলন আগের মতো আর অবহেলিত থাকবে না, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

(৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফলে থাকে ফলে উন্নয়ন উদ্যোগে জনগণকে অংশীদার করা, সে কাজ তাঁদের দিয়ে হয় না। পঞ্চায়েতদাররাই যথার্থ গ্রামের নায়ক। সেবকও কি নন? তাঁরাই পারেন গোটা গ্রামকে গ্রামের কাজে সাথী করতে। অন্য রাজ্যে যা সম্ভব, এ রাজ্যে তা হবে না, মানবো কেন? তবে একথা ঠিক, নিছক দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সব কিছু যেন মাপা না হয়। না, এ আশঙ্কা করি না। করি না এজন্যই, পঞ্চায়েতরাজের অনুসঙ্গ যা, যথা, সমবায়, ধর্মগোলা স্থাপন, এ সব কথা রামসুন্দর নেতৃত্বরাই বলছেন। ফলে আমরা আশান্বিত। ঠিক, কৃষি-মজুরের ন্যায্য মজুরির কথা বললে তেমন কিছু সম্পন্ন চাষী ক্ষুব্ধিত হতে পারেন। এ রকম কিছু আলোড়ন, ওলটপালট হতেই পারে। সেজন্য আমরা চিন্তিত নই। তবে এ কথাটাও বলব, কেবল বিত্তবান চাষীদের জন্যই নয়, সাধারণ, মাঝারি চাষীদেরও কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া চাই। এ কথা তোলার উদ্দেশ্য, স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোতে হবে, তবেই না উন্নত গ্রামের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। সবশেষে আবার বলি, এ যেন অনেকটা রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা বটে, কারণ পঞ্চায়েতের এই সবে সূচনা। কথাটা খাঁটি। তাহলেও বলব, একটা বিরাট কর্মযজ্ঞের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেই আজ সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই।

COAL INDIA–
GIVING A NEW LIFE TO SIX LAKH COAL MINERS

A child a whole generation ahead.
life beckons... the mischief of flowing tap water... a radio voice singing a popular tune—these are some of the sounds which will greet an observer in a coal miners colony today. Small signs which give a glimpse of Coal India's efforts at providing a better life for its gallant six lakh miners.

Already, 30,763 houses have been built. Over 2 lakhs are getting filtered water. 12 colleges meet the need of higher education, while 524 schools at primary, middle and high school levels are imparting basic education to miners' children. 19 school buses are also plying. Adult literacy classes have gained momentum. So far, 43 hospitals, 357 dispensaries have been provided in addition to specialised health centres to look after the health of miners. Banks, credit stores and co-operatives are an important part of miners' lives while playgrounds, mobile cinema units, etc., are providing greater recreation. The miners are living their new life style... that's how Coal India wants it to be.

Coal India Limited
(A Government of India Enterprise)
10 [illegible] Road, Calcutta-700 001.

SUBSIDIARIES :
Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.
Central Coalfields Limited, Ranchi. Eastern Coalfields Limited, Sanctoria. Western Coalfields Limited, Nagpur.
Central Mine Planning & Design Institute Limited, Ranchi.
Directly Administered : North Eastern Coalfields, Margherita.

পশ্চিমবঙ্গের [redacted] গ্রামীণ বেকার

রাখাল দত্ত

পরিকল্পনার যুগে ভারতে বেকার সমস্যার তীব্রতা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটি আমরা আশা করি নি—এমন যে হবে তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমরা ভেবেছিলাম বেকারত্বের অভিশাপ অনুন্নত অধিক ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা কমিয়ে আনা কঠিন হবে না এই ছিল আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে এই আশা বা বিশ্বাস পূর্ণ হয়নি।

আমাদের দেশে কত লোক বেকার এ নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। বেরোজগারির সংজ্ঞা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। আবার তার পরিমাণ নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন কাজ বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থবিজ্ঞানীরা ভারতে সামগ্রিক বেকারত্ব পরিমাপের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত 'কমিটি অন্ আন্-এমপ্লয়মেন্ট' ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে একটা হিসাব দিয়েছিলেন। এই কমিটি বেকারত্ব মাপবার জন্য জাতীয় স্যাম্পল সার্ভের ঊনবিংশ দফার তথ্যের সঙ্গে ১৯৭১-এর আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার করেছেন। জাতীয় স্যাম্পল সার্ভের হিসাবে কোনও ব্যক্তি যদি তথ্য সংগ্রহের পূর্বের সপ্তাহে এক দিনের জন্যও কাজে নিযুক্ত থাকেন তাহলে তাঁকে বেকার বলা হয় না। পূর্বোক্ত কমিটি ১৯৭১ সালে ২০ লক্ষ এমন লোক ছিলেন বলে হিসাব করেছেন যাদের এরকম একদিনের কাজও ছিল না বলে বেকার মনে করা যায়। কমিটি এই সংখ্যার সঙ্গে তাদেরও যোগ করেছেন যারা সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টার কম কাজ করেছে। এই কারণে আরও ৯৭ লক্ষ লোককে বেকার বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, কমিটির মতে ১৯৭১-এ ভারতে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮৭ লক্ষ। এই সংখ্যা ভারতের কর্মরত জনসংখ্যার (১৮ কোটি ৩৬ লক্ষ) ১০.২ শতাংশ। অন্য একটি হিসাবে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, ভারতে বেকারদের সংখ্যা ১ কোটি ৯৯ লক্ষ থেকে ২ কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে। পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান সদস্য অধ্যাপক রাজকৃষ্ণের মতেও ভারতে বেকারদের সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। কাজেই বলা যায় বর্তমান ভারতে বেকার বা প্রায় বেকার অন্তত ২ কোটি লোক। সংখ্যাটি এতই বড় যে দু'এক লাখের এদিক ওদিক হলে কিছু যায় আসে না। আগামী দশ বছরে আরো ৫ কোটি লোক কাজের অনুসন্ধান করবে এই অনুমান মেনে নিলে দশ বছরের মধ্যে ৭ কোটি লোকের কাজের সংস্থান করতে পারলে ভারতে শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। কয়েক বছর আগের একটা সরকারী হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ২৮ লক্ষের মত। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ গ্রামাঞ্চলে থাকে এবং ১১ লক্ষের মত থাকে শহরাঞ্চলে। বেসরকারী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। সরকারী যে হিসাব দেওয়া হল তাও ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের। কাজেই যদি ধরে নেওয়া হয় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বেকার তাহলে খুব বেশি ভুল করা হবে না। এই অনুমানও যুক্তিযুক্ত যে এদের মধ্যে ২৫ লক্ষের মত বেকার গ্রামাঞ্চলে। কোনোই সন্দেহ নেই এদের অধিকাংশকে কাজ খুঁজে নিতে হবে কৃষি ও কৃষির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে। অন্যান্য রাজ্যের মতই এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্রমাক্ষয় নিম্ন। তাহলেও বলা যায় কৃষি উন্নয়নের অনেক কাজই এই রাজ্যে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির পরিমাণ ৮৮.৫২ লক্ষ হেক্টর। এই জমির ৭৩ শতাংশের মত চাষের উপযোগী এবং বাদ বাকি ২৭ শতাংশে চাষ সম্ভব নয়। মোট জমির ৬৬ শতাংশের সামান্য বেশি বা চাষের উপযোগী জমির ৮৩ শতাংশে চাষ আবাদ করা হয়। সহজেই বোঝা যায়, এই রাজ্যে নতুন নতুন জমিতে কৃষি সম্প্রসারিত করার সুযোগ খুবই সীমিত। একথাও মনে রাখা ভাল, ১৯৭৫-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট চাষের জমির (৫৮.৭২ লক্ষ হেক্টর) মধ্যে মাত্র ২.৫৮ হেক্টর জমিতে সরকারী প্রকল্পে সেচের ব্যবস্থা ছিল। বেসরকারী সেচ-ব্যবস্থা একত্র করলে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে খরিফ মরশুমে মোট চাষের জমির মাত্র ৫০ শতাংশে জমি সেচের জল পায় এবং রবি মরশুমে পায় মাত্র ১৫ শতাংশে জমি। অন্য দিকে পাঞ্জাবে মোট চাষের জমির প্রায় ৭৫ শতাংশেই সেচের ব্যবস্থা রয়েছে সারা বছর এবং উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতেও ৪০ শতাংশে জমিতে সেচের জল দেওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের সব জমিতেই সেচের জল দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেচের সুযোগপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ এ রাজ্যের মোট জমির ৫০ বা ৬০ শতাংশ কেন বাড়ানো যাবে না তার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে গত বছর ভারতে যে রেকর্ড খাদ্যশস্য (৯২ কোটি ৫৫ লক্ষ টনের বেশি) উৎপাদিত হয়েছে

তার পেছনে রয়েছে মাত্র এক বছরে ২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সংযোজন। কাজেই এই রাজ্যে আজ আমরা যদি একটা ব্যাপক সেচ প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করি তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন ধরণের সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ব্যাপক বিনিয়োগের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে শ্রমনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি। সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রধানত নির্মাণকার্যের মধ্যে পড়ে। মাটি কাটা, বাঁধ তৈরি ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত শ্রম-নিবিড় এবং গ্রামাঞ্চলেই এসব কাজ চালাতে হবে। একই সঙ্গে যদি রাস্তাঘাট বানানোর মত কাজেও হাত দেওয়া হয় তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই বহু বেকারকে কাজ দেওয়া যেতে পারে। রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মতই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বছরের কোন কোন সময় রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাটের ভাল ব্যবস্থা না থাকলে চাষী তাঁর ফসলের ভাল দাম নাও পেতে পারেন কারণ ফসলের মধ্যেই তাঁকে তাঁর পণ্য বেচে দিতে হয়।

নির্মাণ কাজে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ছাড়াও সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার অর্থ জমিতে একবারের বেশি ফসল উৎপাদন এবং নতুন ধরণের চাষের ব্যবস্থা করা। এই দুই কারণেই আরও বেশি লোককে চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে। সারা বছর সেচের জল দিতে পারলে যে দুটি বা তিনটি ফসল তোলা যায় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বর্ষার সময়েও সেচ ব্যবস্থার ও জল নিষ্কাশের প্রচলন করতে পারলে আরও সুফল পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে যে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে আউস, আমন আর বোরো—এই তিন রকমের ধান চাষই হয় ১ কোটি ৩৪ লক্ষ একর জমিতে। আর শুধু আমনই হয় প্রায় ১ কোটি একর জমিতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বোরোর তুলনায় এ রাজ্যে আমন জমির চাষে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার সামান্যই বেড়েছে। এখন পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ ধানের জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়েছে। আমন ধানের একর প্রতি ফলন এ কারণেই এ রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। এই ফলন বাড়াতে হলে ব্যাপক সেচ ও জলনিষ্কাশ ব্যবস্থার দরকার। কারণ, বর্ষাকালে মোট জমির মাত্র ৩০ শতাংশে এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে জল বেশি হয় এবং জল নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় ধান নষ্ট হয়। অনেক জায়গায় আবার জলের অভাবে ফসল নষ্ট হয়। সেচের ব্যবস্থা করে উচ্চ ফলনশীল আমনের চাষ আরও বাড়াতে পারলে আমরা দুদিক দিয়ে লাভবান হব। আমাদের একর প্রতি ফলন বাড়বে এবং অধিক ফলনশীল ধান আগে কেটে নেওয়া যায় বলে একটা দ্বিতীয় ফসল তোলার কাজও সহজসাধ্য হবে।

স্বপ্ন উঠতে পারে সেচ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের কাজে যে টাকা লাগবে তার ব্যবস্থা কীভাবে হবে? আনন্দের কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক নির্মাণ কাজের সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। গত বছর এপ্রিল মাসে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। প্রথমে দুবছরের জন্য এই প্রকল্প চালু রাখা হবে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার একটা স্থায়ী অঙ্গ হিসাবেই এই প্রকল্প থাকবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারের হাতে বিশাল পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। এক সময় এই মজুতের পরিমাণ ছিল ২ কোটি মেট্রিক টন। এখন প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য সরকারের হাতে। অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বেকার ও অর্ধবেকার। মজুত খাদ্যশস্যের কিছু অংশ কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির অংশ হিসাবে দিতে পারলে একই সঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এক, আমাদের ১ কোটি ২০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য মজুত রাখলেই উৎপাদনে ঘাটতিজনিত অভাব মেটানো চলে। এর চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য মজুত রাখা বাহুল্যমাত্র। দুই, খাদ্যশস্যই দরিদ্রতর অংশের প্রধান প্রয়োজন। তাদের আয়ের সিংহ ভাগই খাদ্যশস্য কিনতে ব্যয়িত হয়। এই জন্য মজুরির অংশ হিসাবে খাদ্যশস্য দিতে পারলে সুবিধাই হবে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প অনুসারে গম ও মাইলো (প্রধানত গম) বিনা মূল্যে রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হবে। টাকার হিসাবে এই খাদ্যশস্যের পরিমাণ হবে গ্রামাঞ্চলে সরকারী নির্মাণকার্যের চলতি ব্যয়ের ৬০ শতাংশ। শ্রমিকদের মজুরি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই খাদ্যশস্য থেকে দেওয়া যেতে পারে। গত বছর ২০ কোটি টাকা বা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য এই জন্য রাখা হয়েছিল। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয়

সরকার এই প্রকল্পের পরিধি আরো বাড়িয়েছেন। বর্তমানে বড়, মাঝারি ও ছোট সেচ ব্যবস্থা, বনায়ন, জল নিষ্কাশন, মাটি ও জলের সুরক্ষা, বন সংরক্ষণ এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে। রাস্তাঘাট, আন্তর্জাতিক সড়ক ও রাজ্য সড়ক এবং শহরাঞ্চলের রাস্তাও এই প্রকল্পের অধীন হতে পারে। তাছাড়া নালা খোঁড়া, জমির উচ্চতা সমান করা, সরকারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধীন বিদ্যালয় ও সমাজ-কেন্দ্র নির্মাণও এই প্রকল্পের সাহায্যে হতে পারে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীভানুপ্রতাপ সিংহ কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন প্রায় ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের ১০ লক্ষ টন গমের বদলে প্রায় ৪০ কোটি শ্রম-দিবস সৃষ্টি করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার গম দেবেন আর রাজ্য সরকারদের নগদ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে যার পরিমাণ হবে ৭৫ কোটি টাকা। আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের এই প্রকল্পের পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন। বস্তুত, ১৯৭৭-৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্প অনুসারে সবচেয়ে বেশি গম পেয়েছে যার পরিমাণ ৪১ হাজার টন। কেন্দ্র থেকে ঐ সময়ে দেওয়া হয়েছিল মোট ১৭ হাজার টন গম ও মাইলো।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যে কর্মসংস্থান বাড়ানো সে কথা তাঁরা বারে বারে বলছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ২১৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। গত বছর এজন্য ধরা হয়েছিল ১৪৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। বর্তমান পরিকল্পনাও জোর দিচ্ছে কর্মনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর উপর। বর্তমান খসড়া পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বাড়ানোর কৌশল নির্ভর করছে (১) আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশে শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি গ্রহণ (২) শ্রমনিয়োগ অব্যাহত রাখতে ও বাড়াতে প্রযুক্তিবিদ্যা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) পূর্ণ নিয়োগের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের উপর। উত্তর প্রদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এক একটি উন্নয়ন কেন্দ্রে ১৭।১৮টি গ্রাম থাকবে। পশ্চিমবঙ্গেও এ রকমের গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

একথা বলা চলে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ বাড়ানোর সম্ভাবনা অফুরন্ত। বাস্তবে কতটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে তা নির্ভর করবে রাজ্য সরকারের যথাযথ পরিকল্পনা রচনা ও তার সার্থক রূপায়ণে। একই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে বেকারত্বসমস্যার স্থায়ী সমাধান তখনই হবে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানের বাৎসরিক ২½ শতাংশ থেকে অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে। পশ্চিমবঙ্গও এ দিক দিয়ে ব্যতিক্রম হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন আনতে হবে যাতে কায়িক শ্রমে বিমুখতা, যা পশ্চিমবঙ্গে খুবই প্রবল, দূর হয়।

আর্থিক উন্নতি ও গ্রামের মানুষ

(৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কোনো পরিষ্কার প্রকাশ নেই। টাকার ব্যবস্থা হলেই যে উন্নতি হয় না, তা আমরা আগে বহুবার দেখেছি। তবু, আশা করা যায় যে প্রধান প্রয়োজনগুলি যদি একবার স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় এবং সেদিকে পদক্ষেপের সূচনা করা হয়, তাহলে পাঁচ বছরে না হোক, দশ-পনেরো বছরের মধ্যে কোথায় বাধা, কোথায় কোন্ পথ নিয়ে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে এ সব-ও স্পষ্টতর হবে। প্রধান কথা এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। যাঁরা শহরে থাকেন, যাঁরা বড় শিল্পের উন্নতির দিকে তাঁদের নজর আবদ্ধ রাখেন, তাঁরাও এটা বুঝতে পেরেছেন যে গ্রামের লোকের ক্রয় ক্ষমতা না বাড়লে বড় শিল্পের উৎপাদন বিক্রি হবে না, গ্রামের উন্নতি না হলে শহরের উন্নতি হবে না, গ্রামের দরিদ্রতম স্তরের লোকদের কাজ এবং খাদ্যের জোগে শহরে চলে আসা বন্ধ হবে না। গ্রামবাসীর আর্থিক উন্নতির সমস্যা দেশের শতকরা আশি ভাগ লোকের জীবনযাত্রার সমস্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা সমগ্র দেশের সব শ্রেণীর সমস্যা।

গ্রামীণ ভারতের শিল্পায়ন

রমেন মজুমদার

সেই আপ্তবাক্যের মত কথাটি বার-বার স্মরণ করা হয়— India lives in villages। বাংলা করে বলতে পারি, 'গ্রাম নিয়েই ভারত'। ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকটা আসে কৃষি থেকে। কিন্তু তবু ভারত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পা মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না, তার অগ্রগতিতে ত্বরণ নেই। কারণ, শুধু কৃষির ওপর ভরসা করে ভারতের মত জনবহুল দেশের উন্নতি করা যায় না। পৃথিবীর কোনো দেশ শুধু কৃষি করে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারেনি। ব্রিটেনের মতো ছোট্ট একটা দেশ প্রায় সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছিল—সে কৃষির জোরে নয়। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপান্তর এসেছে। আজকের পৃথিবীতেও সমস্ত উন্নত দেশের পিছনে আছে শিল্প। শিল্প ছাড়া উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং কৃষির সঙ্গে শিল্পও চাই। দুটির মধ্যে একটা অন্বয়।

পরিধি ও জনসংখ্যা দুদিক থেকেই ভারত বৃহৎ দেশ। কিন্তু তার উন্নতির জন্য ক্ষুদ্রশিল্পের দরকারই বেশি। অর্থাৎ, গ্রামীণ শিল্পের। গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে কৃষকসমাজের উন্নতিও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। গ্রামীণ ভারতের সকল অধিবাসীকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। কৃষিকর্মের বাইরে যে অযুত-সংখ্যক লোক পড়ে আছে তাদের কর্ম-সংস্থানের জন্য দরকার গ্রামীণ শিল্প—ক্ষুদ্র আর কুটিরশিল্প।

স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ ভারতের উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামের শিল্পায়ন ছাড়া গ্রামময় ভারতের উন্নতি অসম্ভব।

গত কুড়ি বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি-প্রস্তাব দ্বারা। ১৯৭৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর সরকারের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ যাবৎ সরকারী শিল্পনীতিতে প্রধানত বৃহৎশিল্পের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, কুটিরশিল্প রয়েছে অবহেলিত, ক্ষুদ্রশিল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাকে অত্যন্ত নিম্নস্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে। সরকার এই অবস্থার পরিবর্তন চান, এবং সেই উদ্দেশ্যে এক কঠোর নীতি প্রবর্তন করেছেন। সরকারের নতুন শিল্পনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে পল্লী অঞ্চলে ও ছোটো ছোটো শহরে এই শিল্পের সমাবেশ বিস্তার ঘটানো হবে। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে যেসব পণ্য উৎপন্ন হতে পারে তা কেবল এই শিল্পেই উৎপাদন করা হবে।

সরকারের নতুন শিল্পনীতির অনেক-গুলি লক্ষ্য আছে। তার মধ্যে প্রধান,—শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা, কর্ম-সংস্থানের স্তর দ্রুত উন্নীত করা, উৎপাদন বাড়ানো, শিল্প-শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি করা, এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের পরিব্যাপ্তি ঘটানো। দেশের শিল্পনীতিতে যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে চলেছে তার উদ্দেশ্য—একটা নিরপেক্ষ ও ন্যায়সম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠা, যে সমাজে শিল্পোন্নতির সমস্ত সুফল সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারবে।

নতুন শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য, পল্লী অঞ্চলে ও ছোটো ছোটো শহরে ব্যাপক-ভাবে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলা। ক্ষুদ্রশিল্পে কোন্ কোন্ পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে তা নির্ধারণের জন্য কিছুদিন আগে খুঁটিনাটি ভাবে এক সমীক্ষা চালানো হয়। আগে এই শিল্পে ১৮০টি পণ্য উৎপন্ন হত, এই সমীক্ষার পর ৫০৪টি পণ্য কেবল ক্ষুদ্রশিল্পেই উৎপন্ন হবে বলে স্থির হয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদনের জন্য এই পণ্যগুলি সংরক্ষিত থাকবে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পে এগুলি উৎপাদন করা যাবে না।

ক্ষুদ্রশিল্পের একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী যে শিল্পে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বাবদ দশ লক্ষ টাকার অধিক বিনিয়োগ করা হয়নি সেই শিল্পই ক্ষুদ্র-শিল্প।

ক্ষুদ্রশিল্পের চেয়েও ক্ষুদ্রশিল্প আছে। তাকে অতি ক্ষুদ্রশিল্প বলা যেতে পারে। যে শিল্পে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বাবদ অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার বিনিয়োগ তা-ই অতি ক্ষুদ্রশিল্প নামে পরিচিত। গ্রামাঞ্চলে ও যেসব শহরে ১৯৭১ সালের আদম-শুমারি অনুযায়ী অনধিক ৫০,০০০ লোকের বাস সেখানে এই শিল্প স্থাপনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। দেশের শিল্পোন্নয়নে বিনিয়োগ কর্মপরিকল্পনাগুলি যাতে যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করে তার জন্য কুটির ও গৃহশিল্পের স্বার্থ রক্ষা করা বিশেষ দরকার, এবং তা রক্ষা করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের কথা ভাবা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এখনও বড়ো বড়ো শহরে আর রাজ্য-রাজধানীগুলিতে। এই কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে এখন জেলা সদরদপ্তরে স্থানান্তরিত

করার ব্যবস্থা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা শিল্পকেন্দ্র থাকবে। তার কাজ হবে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সমস্ত প্রয়োজন মেটানো,—একই জায়গা থেকে কাঁচা-মাল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং ঋণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।

ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজন থেকে কুটির ও গৃহশিল্পের প্রয়োজন কিন্তু আলাদা। জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলিতে একটি করে পৃথক বিভাগ থাকবে, তার কাজ হবে কুটির ও গৃহশিল্পের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটানো।

আগামী চার বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত জেলায় শিল্প কেন্দ্র চালু হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কাজ এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে বর্তমান আর্থিক বছরেই সমস্ত জেলাকেন্দ্র খোলা হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। গ্রামীণ শিল্পপরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে যে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় তা-ও আগামী চার বছরের মধ্যে দেশের সব জেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। ক্ষুদ্রশিল্প এবং গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পে ঋণদান একটা বড়ো ব্যাপার। তাদের এই ঋণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতের শিল্পায়ন ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ পৃথক একটা বিভাগ স্থাপন করেছে। ক্ষুদ্রশিল্প এবং গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প যাতে দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে তার জন্য এই বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দেবে। ক্ষুদ্র কিংবা গ্রামীণ শিল্পের কোনো লাভজনক কর্মোদ্যোগ যাতে ঋণের অভাবে পরিত্যক্ত না হয় তা দেখাও সরকারের একটা প্রধান নীতি।

১৯৬২-৬৩ সালে মাত্র ৪৯টি গ্রামীণ শিল্পকেন্দ্র গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার আওতায় পড়েছিল তিন থেকে পাঁচ লক্ষ লোক। ১৯৭১-৭২ সালে স্থির হয়, এই প্রকল্প সারা দেশে পর্যায়ক্রমে চালু হবে এবং মোটা জেলার সাহায্য পরিকল্প

নকশা অনুযায়ী—ছাঁচে তৈরী। অনেক বেশি অর্থাগমের আশা নিয়ে কয়লাকারার কারখানায় ফিরে আসে

প্রযোজ্য হবে। তবে যেসব শহরের লোক-সংখ্যা পঁচিশ হাজারের বেশি সেইসব শহর এই পরিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বর্তমানে এই গ্রামীণ শিল্পায়ন কর্মসূচীতে ১১২টি প্রকল্প আছে।

গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে খাদির একটা বিশেষ স্থান আছে। খাদি-আঁশের সঙ্গে পলিএস্টার-আঁশ মিশিয়ে সুতো তৈরির এবং কাপড় বোনার একটা সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় খাদিশিল্পে এক নবদিগন্তের উন্মোচন হতে চলেছে। এই খাদি-র বিরাট কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আইন সংশোধন করা হচ্ছে। আধুনিক পরিচালন-কৌশল অবলম্বন করে এইসব শিল্পের যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হচ্ছে এবং বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হচ্ছে।

খাদিশিল্পের পাশাপাশি তাঁতশিল্পও সাধারণ মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাঁতশিল্পের উন্নতি হলে আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার স্থির করেছেন, সংঘবদ্ধ কাপড়কল আর বিদ্যুৎচালিত তাঁত-প্রতিষ্ঠানগুলির বয়ন-ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হবে না। সরকারের আরও সঙ্কল্প আছে, কতকগুলি কাপড় কেবল হস্তচালিত তাঁতেই তৈরি হবে বলে নির্ধারিত করে দেওয়া হবে।

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পৃথিবীর অনেক দেশের থেকেই ভিন্ন। ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ সরকারী শিল্পনীতির একটা অঙ্গীভূত অঙ্গ। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎপাদন যাতে বাড়ে, শ্রমিকদের আয় যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য ছোটো ছোটো সরল যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

তাঁত—কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প

গ্রামের শিল্পায়নে বৃহৎশিল্পেরও একটা ভূমিকা আছে। ক্ষুদ্রশিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের বিস্তার ঘটিয়ে জনসাধারণের মূলতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর যে পুরুষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার সঙ্গে বৃহৎশিল্পের ভূমিকা অন্বিত রয়েছে। সরকারী নীতি অনুযায়ী সাধারণভাবে বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্র হবে: (১) মৌলিক শিল্প, যেমন ইস্পাত, লৌহেতর ধাতু, সিমেন্ট, ইঞ্জিন-নির্মাণ প্রভৃতি,—ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ও তার বিকাশে যার প্রয়োজন অত্যধিক, (২) মূলধনী পণ্য শিল্প,—মৌলিক শিল্প এবং ক্ষুদ্র-শিল্পের যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাতে যা অত্যাবশ্যক, (৩) উচ্চমানের প্রযুক্তি-বিদ্যানির্ভর শিল্প, যেমন সার, কীটনাশক, পেট্রো-রাসায়নিক প্রভৃতি,—যা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করতে হয় এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতিতে অপরিহার্য, এবং (৪) অন্যান্য শিল্প, যেমন মেশিন টুল, জেট ও রকেট রাসায়নিক ইত্যাদি,—যা ক্ষুদ্র-শিল্পের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতির উন্নতিতে যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ক্ষুদ্রশিল্পে এখন প্রায় ২,৪০০ পণ্য উৎপন্ন হয়। নিত্যব্যবহার্য বহু সামগ্রীর প্রস্তুতকারক আজ ক্ষুদ্রশিল্প। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রের অনেক আধুনিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, মোটরগাড়ি আর রেল এঞ্জিনের অনেক উপকরণ, মেশিন টুল প্রভৃতি অনেক কিছুই এখন ক্ষুদ্রশিল্পে প্রস্তুত হচ্ছে। হালকা মূলধনী পণ্য উৎপাদনেও ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য।

ক্ষুদ্রশিল্প এ যাবৎ যে সাফল্য লাভ করেছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। ১৯৭৩ সালে এই শিল্প মোট ৩,৪২০ কোটি টাকার পণ্য উৎপন্ন করেছিল, ১৯৭৬ সালে হয়েছিল ৬,৭০০ কোটি টাকার। ১৯৭৭ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৫৭০ কোটি টাকা। এক বছরের শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ বৃদ্ধি। শিল্প মন্ত্রকের ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য আছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৭ সালে ক্ষুদ্র-শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লক্ষ।

১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত পণ্য রপ্তানি করে যত কোটি টাকা আয় করেছিল তার মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ ছিল শতকরা ১৫.২৭ ভাগ। ১৯৭৬-৭৭ সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৭.০৭ ভাগ। ১৯৭৫-৭৬ সালে ক্ষুদ্রশিল্প উৎপন্ন পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৫৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় ৮৭৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এক বছরে শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি।

১৯৭৮-৭৯ সালে অনগ্রসর অঞ্চলে ও পল্লী অঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। গত আর্থিক বছরেই কতকগুলি নতুন গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প আরম্ভ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বছর প্রায় ১৫০টি নতুন জেলাকে গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প কর্মসূচী ও গ্রামীণ কারু পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে বলে স্থির হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পায়নের মধ্যে এখনও বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে সারা দেশে যাতে একটা সুষম শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করা যায় তার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। কিন্তু এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা বড়ো ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা—রাজ্য সরকারগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধন এবং সম্পূরক পরিকল্পনা গ্রহণ।

অলোক সেন

কৃষি নির্ভরতাই ভারতকে আজ বিশ্বসভায় তার নিজ গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। খাদ্য উৎপাদনে আমরা তাই গর্ব বোধ করি। অন্য যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় আজ আমরা আর বিন্দু মাত্র পিছিয়ে নেই। স্বয়ম্ভরতার সীমারেখা ছাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন এগিয়ে চলেছে ক্রমোন্নতির পথে।

কিন্তু কৃষি কি মোচাতে পারে জীবনের সব দারিদ্র্য? দিতে পারে সমস্ত গ্রামীণ মানুষকে তার প্রয়োজনীয় উপজীবিকা? গ্রাসাচ্ছাদনের নির্ভরতা? জীবনযাত্রার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের নূনতম সরবরাহ?

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেই গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছেও বিষয়টি ছিল একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিদেশী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন চেয়েছিল কুটির শিল্পে নব রূপায়ণের। খাদি ও গ্রামোদ্যোগের আন্দোলন এই নব রূপায়ণের একটি অগ্রবর্তী শরীক হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত চরকার ধীগতি ও উৎপাদনশীলতার অভাব খাদি উৎপাদনে যে জড়িরতা এনেছিল তা দূর করার অভিপ্রায়ে গান্ধীজী নিজেই বারবদা কারাগারে বসে এক নতুন চরকার উদ্ভাবন করলেন বহু গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে। দ্রুত ঘূর্ণনক্ষম ও ওজনে হালকা এ চরকাটি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করল। গ্রামে গ্রামে এর ব্যাপক প্রচলন খাদি আন্দোলনে সেদিন নতুন আলোর সন্ধান দিল।

আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক একম্বরনাথ এই নতুন চরকায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে সূতা উৎপাদনের গ্রামীণ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটালেন। নিছিল-গতি প্রাচীন চরকায় যেন নতুন প্রাণের জোয়ার বইল। মিনিটে দশ হাজার পাক খেয়ে চরকার তাকা সূতা উৎপাদনে গুজরাটের গ্রামে গ্রামে স্বাবলম্বিতার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলো। সেদিনের অম্বর চরকার তারপরে ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। একটি মাত্র চরকার পায়ে ঘণ্টা বাঁধিয়ে এবং মিনিটে ষোল হাজার পাক ঘুরিয়ে একই হাতে তালানো চরকা আজ বিদ্যুৎচালিত সূতাকলের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে এগিয়ে চলেছে। অথচ এ রকম একটি আধুনিক চরকার দাম মাত্র একশো পঁচাশি টাকা।

অবিশ্বাস্য রকমের উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন এমন চরকার প্রচলন কিন্তু আজও আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। খাদি উৎপাদন কেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের সমস্ত সীমানায়। কিন্তু কারিগরী দক্ষতার ও ফসলটুকু কেন পৌঁছায় না গ্রামে গ্রামান্তরে?

অন্ধ্র প্রদেশে করিমনগর জেলার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম কোদুরুত্তা। হাজার হাজার ভারতীয় গ্রামের মতোই কৃষি ও পশুপালন নির্ভর। অধিকাংশই কৃষি শ্রমিক—অন্যের জমিতে বহু কষ্টে প্রাণধারণের চেষ্টায় দিনাতিপাত করতো। উপযুক্ত সারের অভাবে জমিও ছিল অনুর্বর। বছরের একটি বড় অংশে কাটতো বসে জ্বালানী সংগ্রহে, পশুপালনে এবং বেকারত্বে। নির্ভরতার একমাত্র সম্বল ছিল গোপালন।

হঠাৎ একদিন এখানে এলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার সংস্থার একজন বিজ্ঞানী। গ্রামবাসীকে এক নতুন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করলেন। স্থাপিত হল একটি কেন্দ্রীয় খেলনার গোস কারখানা। গ্রামবাসীরা তাঁদের সমস্ত খড়ের গোরুর সঙ্গে নিজে তৈরি করলেন এই উৎপাদন কেন্দ্রটিকে। শুরু হল সভ্যতার পথে নবীন যাত্রা। একদিন সমস্ত পরিবারে এলো অভূতপূর্ব পরিবর্তন। একদল বেকার যুবক কারখানা পরিচালনার ভার নিলেন। ঘরে প্রস্তুতির উনান নিয়ে মেয়ে, ছেলেরা গোবর-কুড়ানো, জলে উঠলো ঘরের অন্ধকার কোণে পথে পথে গোবরের জ্বালানী। ঘরের অন্ধকার মুছিরও সূচনা হল একই সঙ্গে। এই অভিনব প্রকল্প প্রসূত উৎকৃষ্ট জৈবসারে জমির উর্বরতাকে বাড়িয়ে তুললো অবিশ্বাস্যভাবে। মাত্র দুতিনটি বছরের ব্যবধানে কোদুরুত্তা গ্রামটি অন্য হাজার হাজার গ্রামকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো স্বাবলম্বিতার পথে। জীবন-যাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিতে নয়, এক সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনমুখী আনন্দ গ্রামবাসীকে নতুন নতুন দুঃসাহসী কৃতিত্বেও প্রেরণা যোগালো। কর্মহীনতার প্রতিশাপ কাটিয়ে কোদুরুত্তা এখন প্রতিবাধক।

কিন্তু এমন প্রচেষ্টা কেন ছড়িয়ে পড়েনা এমনই আরও শত সহস্র গ্রামে?

রাঁচী-পুরুলিয়া রোড যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে ছোটনাগপুর রেঞ্জ-এর গায়ে গায়ে গড়ে উঠেছে রাঁচী হেভী

ইলেকট্রিক্যালস্, উমা মাটিন প্ল্যাকের ওয়ার-রোপ ফ্যাক্টরী এবং এমনই আরও বহু কলকারখানা। বিগত চার পাঁচ বছরে এই এলাকার চেহারা একেবারে পালটে গেছে।

সাতটি বড় শিল্পসংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের বেকার পরিবারবর্গের উন্নতিকল্পে এখানকার উনসত্তরটি গ্রামে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে সূচনা হ'য়েছিল এক নতুন উদ্যোগের। এ সাতটি কারখানার পরিচালকবর্গ গ্রামে নিয়ে এলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণ, এলো গ্রামবাসীদের নানা শিল্পভিত্তিক পরিকল্পনা। উন্নত প্রথার চাষ ব্যবস্থা, বড় কারখানায় ব্যবহৃত নানা ছোট সরঞ্জাম তৈরীর জন্য গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কলকারখানা এলো। এলো বিদ্যুৎ, এলো গ্রামীণ কেন্দ্রীয় গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট, উন্নত দুগ্ধ প্রকল্পের জন্য পশুপালন কেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে শিক্ষার্থী কেবলে শিক্ষাই পায় না শিক্ষাকালে পায় মাসিক নগদ অর্থ সাহায্য এবং শিক্ষান্তে দুগ্ধ-উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের গরু, মোষ। এলো পানীয় ও ব্যবহার-যোগ্য জলের সরবরাহ ব্যবস্থা। গ্রামে পথ তৈরী হ'ল গ্রামবাসীর অবসর সময়ের পরিশ্রমে। মাঠের ফসল, এবং কুটির-উৎপাদিত ছোট যন্ত্রসরঞ্জাম শহরে বিক্রয় কেন্দ্রে বাহিত হয়ে উন্নতমানের পণ্য-পসরাই। সেখানে গ্রামে গ্রামে স্কুল, বিদ্যুতের আলো, গ্যাসের উনুন এবং বাড়ীতে বাড়ীতে পানীয় জলের সরবরাহ আজ অব্যাহত। গ্রামে তাই কুসংস্কার নেই, নেই বেকারত্বও।

একদা ভারতের শিল্পায়ন শুরু হ'য়েছিল জব চার্নকের পুরনো কলকাতায়। ছোট বড় হাজার হাজার কলকারখানা আজো ছড়িয়ে রয়েছে গঙ্গার তীরে তীরে। এ কারখানাগুলি যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষকে টেনে এনেছে বাংলার বাইরে থেকে। কিন্তু প্রসার ঘটেনি গ্রামীণ শিল্পের। বড় কারখানার ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরীতে হাজার হাজার গ্রামের একটি দৃষ্টিও অংশ নিতে পারেনি। তাই এখানকার শহরে গ্রামে জন্ম নিয়েছে শিক্ষিত অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ বেকার। আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার অভাবে এরা তাই কলকাতামুখী।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী—গ্রামের চেহারা পুরো বদলাচ্ছে

অবশ্য উদাহরণের অভাব নেই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও। বেশীদূরে নয়। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে একদিন যে পথে হাওড়া-আমতা লাইট রেলপথটি চালু ছিল সে পথেই হাওড়া জেলার জনসংখ্যাবহুল শহরের প্রধানকেন্দ্র বড়দাহিয়া। বড়দাহিয়া থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে অল্প দূরে এগোলেই পাওয়া যাবে মানসিংহেপুর গ্রামটি।

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে সুধীর চন্দ্র কর নামে এক যুবক এসে বসবাস শুরু করেছিলেন এই মানসিংহেপুর গ্রামটিতে। সঙ্গে এনেছিলেন এক অভূতপূর্ব কারিগরী দক্ষতা ও জ্ঞান। গ্রামেরই আর পাঁচজন যুবককে বিনা পারিশ্রমিকে শিখিয়ে নিয়ে শুরু করে-ছিলেন ভালোচোবি তৈরীর কারখানা। বিগত ষাট বছরে এই একটি কারখানার অনুকরণে ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছে ছোট ছোট এমনই বেশ কয়েকটি কলকারখানা। মানসিংহেপুরের ভালোচাবি আজ ভারতের গ্রামে গঞ্জে শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিরাট এক ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিয়ে। মানসিংহেপুরে একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে আরও বহু শিল্প। এখানকার তৈরী বৈদ্যুতিক নানা সরঞ্জামের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ চালে যায় কলকাতা এবং বাংলার বাইরের বহু বহু কলকারখানায়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় এ গ্রামের লোকে যখন বিদ্যুৎ চোখে দেখেনি তখনই এরা হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈরী করেছে বৈদ্যুতিক মিটার, সুইচ ইত্যাদির যন্ত্র

অন্যতম। শিল্পসমৃদ্ধ এ গ্রামটিতে বেকার তাই বিরল।

মানসিংহপুরের আশেপাশে কয়েকটি গ্রামে তৈরী হয় নকল সোনার গহনা। কিন্তু তৈরীর পরে চলে যায় দিল্লী বোম্বে এবং মাদ্রাজে। সেখানে ছাপ পড়ে ঐ সব শহরে অবস্থিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের। তারপর নতুন বাক্সে ভরে সেগুলি চলে আসে কলকাতায়।

বহু বছরের দাদন ব্যবস্থায় চলে এ শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন। তাই এ শিল্পটি গ্রামের সীমানায় অনুন্নত রয়ে গেছে। সরকারী উদ্যোগ, উন্নত শিক্ষণ-ব্যবস্থা, নতুন যন্ত্রপাতি এই শিল্পটির প্রভূত উন্নতি ঘটাতে পারে এবং কারিগরী শিক্ষার প্রসার অন্য গ্রামেও প্রেরণা যোগাতে পারে।

হোসিয়ারী শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছিল আমাদেরই এই কলকাতায় ১৮৯৩ সালে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব এ শিল্পটি এখন অনেক পিছনে। কলকাতার আধুনিক বাজার জুড়ে রয়েছে গুজরাট বোম্বাই ও মাদ্রাজের হোসিয়ারী পোষাক। কারণ সেগুলি গুণগত মানে শ্রেষ্ঠ, দামে কম। অথচ পশ্চিমবাংলার এ শিল্পটির বিস্তৃতি ঘটা উচিত ছিল বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে গ্রামে গঞ্জে।

পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পের সূচনা হয়েছিল অন্তত একশো বছর আগে। কুল, কুসুম প্রভৃতি গাছের ডালে লাক্ষা-কীটের চাষ করে সেই লাক্ষাকীটের দেহ নিঃসৃত লালা দিয়ে তৈরী হয় সেলাক। সামান্য লালা থেকে শুরু করে গ্রামোফোন রেকর্ড—সেলাকের ব্যবহার আজ বহুবিস্তৃত। আর এ শিল্পে নিযুক্ত চাষী ও শিল্পীর সংখ্যাও নগণ্য নয়।

লাক্ষার চাষ বহু গ্রামীণ পরিবারকে অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য এনে দিতে পারে অতি সহজে। দেশে ও বিদেশের বাজারে এর চাহিদাও বাড়ছে দিনে দিনে। কিন্তু এ শিল্পটিকে একটি জেলার সীমানায় রাখার কোন অর্থ নেই। লাক্ষা শিল্পটিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় আরও বহু জেলায়। বহু মানুষের কর্মসংস্থান ঘটাতে পারে এ শিল্পটি।

পুরুলিয়ার কাঁসাই তৈরী হয় বাসন তৈরীর ধাতু, হাতুড়ী, লাঙলের ফলা, কাস্তে, কোদাল, কাঁচি, ছুরি প্রভৃতি লোহা ও ইস্পাতজাত নানা পণ্যসামগ্রী। আর এ কাজটি চলেছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। এর বিস্তৃতি ঘটানো যায় আশেপাশের বহু গ্রামে। কর্মসংস্থান ঘটানো যায় বহু গ্রামবাসীর।

পশ্চিমবাংলার নানা জেলায় ছড়িয়ে আছে শত শত শিল্পকেন্দ্র। কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ, বাঁকুড়ার ঘোড়া কিংবা চালমাপা কুনকে, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ, শোলাশিল্প, সরল মটকা রেশম, কাঁসা প্রভৃতি নদীয়ার হাঁড়ি বস্ত্র এমনই শত শত শিল্প সহস্র সহস্র যুবকযুবতীকে আত্মনির্ভরতার পথে নিয়ে যেতে পারে।

স্বাধীনতার বহু আগে ১৯৩৪ সালে কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী এক নতুন ধরণের সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বি. এন. কোঠারী, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতাকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে একই সঙ্গে বিস্তার ঘটে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং গ্রামীণশিল্পের। উদ্যোক্তা ও অনুপ্রেরণার অভাব না থাকলেও কোন একটি ব্যবস্থারও যে বিস্তার বাংলার কোন গ্রামেই ঘটেনি তাতে সন্দেহ নেই।

প্রতি বছর ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার টন "সাগর সুইট" যা সাগরদ্বীপের উপযুক্ত নৌকাবাহিত হয়ে পৌঁছে যায় কলকাতার ফড়েপুকুর বাজারের আড়তদারদের গুদামে। চাষী দাম পায় প্রতি কিলো-গ্রামের জন্য পনের থেকে পঁচিশ পয়সা। কলকাতার বাজারে যার দাম বারো আনা থেকে এক টাকা। মাঝখানের বিরাট অঙ্কটি চলে যায় ব্যবসাদারের পকেটে। অথচ এই মরশুমী ফসলটি চাষী এবং স্থানীয় গ্রামবাসীকে এক বিরাট আর্থিক সম্ভাবনার পথ দেখাতে পারে। যার অল্প পুঁজিতে তৈরী হতে পারে অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয় যা বোতলে ভরে বাজারে পাঠাতে পারলে দাম পাওয়া যাবে অন্তত পক্ষে দশগুণ।

প্রবৃত্তি বিলায় এমনতর সামান্য ব্যাপ্তি যেখানে গ্রামে গ্রামে সাফল্যের জোয়ার আনতে পারে সেখানে কেন আমরা আজও পশ্চাৎপদ? কেন শুধু জ্বালা-বিড়ম্বনা ও হতাশা মূলধন করে আজও আমরা এই অস্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রায় দিনযাপন করছি? কে এনে দেবে সৌভাগ্যের সম্পদ?

সে সম্ভাবনা একমাত্র যোগাতে পারে আমাদেরই শুভবুদ্ধি, কর্মের আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তির সকল ব্যবহার এবং আত্মো-ন্নতির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।

গার্ডেনরীচের প্রতিটি যন্ত্রপাতি আজ জাতীয় অগ্রগতি ও স্বয়ম্ভরতায় অবদান যোগাচ্ছে।

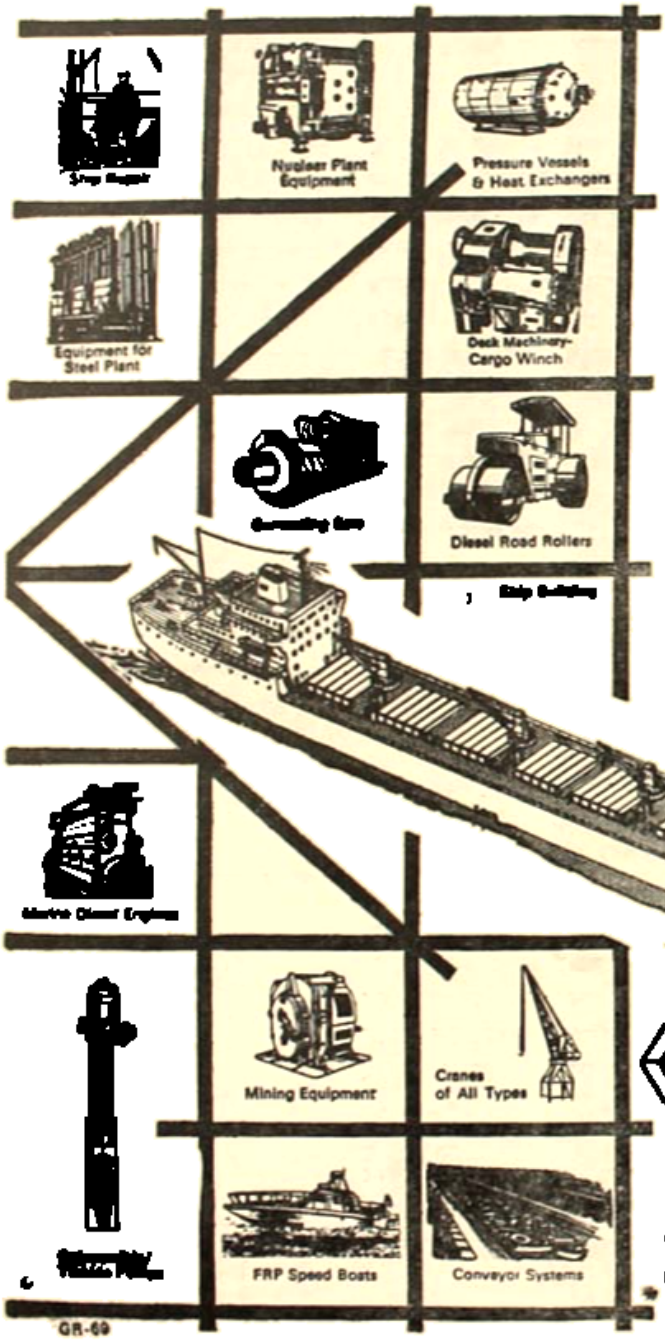

আজ আমরা শুধু ৩০,০০০ ডেড ওয়েট টনের সমুদ্রগামী জাহাজ এবং বিশেষ ধরণের ট্রেজার, ট্রাগ ও অনুসন্ধানী জাহাজই তৈরী করছি না, আমরা তৈরী করছি নানা ধরণের জাহাজী সাজসরঞ্জাম—যার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ দেশজ।

আমরা ইস্পাত, সার ও রাসায়নিক কারখানা স্থাপনেও অংশ গ্রহণ করছি।

জাহাজ চালানোর ইঞ্জিন ছাড়াও বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরীতে আমরা বহুদূর। কনভেয়র, ক্রেন, ফর্কলিফট তৈরীতেও আমরা বিশেষ পারদর্শী।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানা ধরণের পাম্পও আমরা তৈরী করি। আমাদের তৈরী যন্ত্রপাতি আজ অসংখ্য এবং সেগুলি গুণেও অতুলনীয়।

গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
৪৩।৪৬, গার্ডেনরীচ রোড, ঃ কলকাতা-৭০০০২৪
ফোন : ৪৫-১৭২১ (৭ লাইন)
Gram : Combine Telex : 021-7839 & 2283
মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন প্ল্যান্ট, ধারোয়া—রাঁচি (বিহার)
মেকানিক্যাল ইউনিট, নাগপুর (মহারাষ্ট্র)

চার দেয়ালের বাইরে

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

'নন ফরমাল এডুকেশন' অর্থাৎ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা বা বিমুক্ত শিক্ষা—এই কথাটি নিয়ে এখন সারা দুনিয়ার শিক্ষাবিদ মহলেই কম বেশী আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষাকে শুধু পাঠ্য-সূচীর ধরা-বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে আটকে না রেখে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে। কাজের মধ্য দিয়ে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা নতুন জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করবে এই হল 'নন-ফরমাল এডুকেশনের' উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে অনেক আগেই এই নন-ফরমাল এডুকেশনের কথা ভাবা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন সেটি হল গোপাকী 'বিদ্যালয় শিক্ষার' সঙ্গে 'বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার' যথা-সম্ভব সামঞ্জস্যবিধান। গান্ধীজীর নঈ তালিম শিক্ষা পদ্ধতিতেও বিদ্যালয় বহির্ভূত পাঠ্যসূচীকে অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একবার আলিগ্রামে সর্বসেবা সংঘের আশ্রমে গিয়ে দেখেছিলাম ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে অথচ কোন বই নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল: কিতাব জরুরি নেহি হ্যায়।

আমাদের দেশে যে বয়সে ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া শেখার কথা তাদের বেশীর ভাগই পড়াশোনার সুযোগ পায়না। যারা সুযোগ পায় তাদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন রাজ্যে লেখাপড়ার বয়সে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছেনা এমন ছেলেমেয়েদের একটি হিসাব দেওয়া হল:

রাজ্য	বয়স ৬-১১	বয়স ১১-১৪	মোট সংখ্যা
	(লক্ষের হিসাবে)		
১। অন্ধ্র	২১	২৫	৪৬
২। বিহার	৪০	২৮	৬৮
৩। জম্মু ও কাশ্মীর	৪	২	৬
৪। মধ্যপ্রদেশ	৩৭	২৯	৬৬
৫। ওড়িশা	৯	১২	২১
৬। রাজস্থান	২৪	১৭	৪১
৭। উত্তরপ্রদেশ	২৪	৪৩	৬৭
৮। পশ্চিমবঙ্গ	২১	২২	৪৩
মোট	১৮০	১৭৮	৩৫৮

এতো গেল যারা একেবারে স্কুলে যায়না তাদের সংখ্যা। আর যারা স্কুলে যায় তারাও দু-এক ক্লাস পড়ে পড়া ছেড়ে দেয়। প্রথম শ্রেণীতে যত ছাত্র-ছাত্রী ভরতি হয় তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪০ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিঁকে থাকে। আর শতকরা ২৫ জন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাস করতে পারে। এর ফলে সারা দেশে এখন ১৪ বছরের ওপর বয়সী নিরক্ষরদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি ১৭ লক্ষ। এদের মধ্যে ৯ কোটি ৮২ লক্ষ নিরক্ষরের বয়স ১৫ থেকে ৩৫।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এখন দুধরণের শিক্ষা প্রসারের দিকে জোর দিয়েছেন। এক হল, আরও বেশী করে ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা। এটা হল সার্বজনীন শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, ১৪ বছরের উপর বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। এই বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু অক্ষর জ্ঞান দেওয়া নয়, দায়িত্বশীল সুনাগরিক হবার মত বুদ্ধিবৃত্তি অর্জন করানো। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক শিক্ষার নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বয়স্ক শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন তার মধ্যেই নন-ফরমাল এডুকেশনের কথা অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে।

এ শিক্ষা কখনও স্কুলের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। উন্নত দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীভুক্ত শিক্ষার বাইরে শিক্ষার অসংখ্য শাখা প্রশাখা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টিং এডুকেশন বা চলতি শিক্ষা। অর্থাৎ যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। এই শিক্ষা চলে কর্মশালা, আলোচনা চক্র, পারট টাইম কোর্সস, করেসপনডেন্স কোর্সসের মাধ্যমে। তবে নন-ফরমাল এডুকেশন চলতি শিক্ষার চেয়ে আরও ব্যাপক। চলতি শিক্ষার নির্দিষ্ট পাঠ্য-সূচী থাকে, বয়সেরও পরীক্ষাও থাকে, সার্টিফিকেট থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ শিক্ষা ফরমাল। কিন্তু নন-ফরমাল এডুকেশনের এসব কিছুই নেই। নেই কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকা, সময় সূচী, পরীক্ষা পদ্ধতি। ফরমাল এডুকেশন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেয়না। শিক্ষার্থীকে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রোজ হাজির হতে হয় স্কুলে। কিন্তু নন-ফরমাল এডুকেশনে এসবের বালাই নেই। এখানে শিক্ষক নিজেই ছাত্রদের সুবিধা মত তাঁদের কাছে গিয়ে হাজির হন। শিক্ষক এখানে নীরস অযোধ্য ক্লাস লেকচার দিয়ে কর্তব্য সারেন না। তিনি ছাত্রদের মেধা ও বুদ্ধির উপযোগী করে নানান চিত্তাকর্ষক উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয় হাজির করেন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রধান ও প্রধান উদ্দেশ্য হল কর্মক্ষম শিক্ষিত করে তোলা—ইংরাজিতে একে বলা হয় functional literacy। অর্থাৎ শুধু লেখাপড়া শিখলেই হলনা, সেই লেখাপড়া এমন হওয়া চাই যে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে লাগে। ইউনেসকো বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে বার করেছেন যে কেউ যদি স্বাধীনভাবে করণও সাহায্য ব্যতিরেকে কাজ করতে চায় তাহলে আঠারোর মুখে তাকে হেরো বছর বয়সের কোন ছেলে ছাত্রের মত শিক্ষা অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ তার অন্তত অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা থাকা দরকার। পুরোপুরি নিরক্ষর নয় আবার কর্মক্ষম শিক্ষিতও নয় এমন যে সব অসংখ্য ব্যক্তি আছেন তাদের বলা যেতে পারে আধা শিক্ষিত। এই আধা শিক্ষিতরা গড় গড় করে রিডিং পড়তে পারেন না। একমাত্র সহজ সোজা ভাষার লেখা ছাড়া একটু জটিল বাক্যের মর্ম বুঝতে অক্ষম হন। অন্য দিকে কর্মক্ষম শিক্ষা শুধু বাক্যের অর্থ বুঝতেই সাহায্য করেনা বই পড়ার যে মানসিক আনন্দ সে আনন্দের স্বাদও এনে দেয়। ইউনেসকোর ১৯৬৫ সালে প্যারিস সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, বয়স্ক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান দেওয়া নয়, এমনভাবে কর্মশিক্ষা দেওয়া যাতে উৎপাদন বাড়ে, মানসিক জীবনে জনসাধারণ বেশী করে অংশ নিতে উৎসাহ বোধ করেন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পৃথিবী সম্পর্কে আরও ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেন। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গেলে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

এদেশে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা যাদের উপযোগী তাদের আমরা তিনস্তরে ভাগ করতে পারি:(১) নিরক্ষর, এদের সাধারণ স্কুলের আওতায় আনা মুস্কিল। যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শিশু বয়স থেকে পেটের দায়ে রুজি রোজগারের খোঁজে থাকে তাদের স্কুলে আকৃষ্ট করা যায় না। এদের জন্য বিদ্যালয় বহির্ভূত বিশেষ শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন করা হচ্ছে। (২) অর্ধ শিক্ষিত যা ড্রপ আউটরা যাতে কর্মক্ষম শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে।

(৩) শিক্ষিত, কর্মক্ষম শিক্ষার অধিকারী (এককথায় সাধারণ শিক্ষিত) ব্যক্তিরা যাতে নিজেদের রুচি ও কর্মের উন্নতি ঘটাতে পারেন তার জন্য চলতি শিক্ষা। বিভিন্ন

রুচি ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রমের কথা ভাবা হচ্ছে।

শিক্ষাকে স্বৈরতান্ত্রিক করা হলেও এদেশে সমাজের অনুন্নত শ্রেণী ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা সে শিক্ষা গ্রহণে অপারগ। কারণ যখন স্কুলের সময় তখন তাঁদের অন্ন চিন্তা করতে হয়। একারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রধান বাহন হবে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষাদান পদ্ধতি।

আগেই বলেছি মন-করমাল এডুকেশন প্রথা বহির্ভূত। কাজেই তার মাধ্যম একটি নয়, বহু। সে মাধ্যম নির্বাচনের সময় শুধু দৃষ্টি দিতে হয় তা সহজলভ্য কিনা। টেলিভিশন ও রেডিও এই দুটি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার বড় মাধ্যম। পৃথিবীর বহু দেশে এই দুটি গণ প্রচার মাধ্যমের বিশেষ বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ আছে। এক্ষেত্রে বিবিসির ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এই দুটি প্রচার মাধ্যমকে সুচিন্তিতভাবে বয়স্ক শিক্ষার কাজে লাগানো হয়নি যদিও স্কুল প্রতিষ্ঠান বাদ একটি বিভাগ অনেকদিন ধরে চালু আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষে মাত্র ২ কোটি রেডিও সেট ও ৫ লক্ষ টিভি সেট আছে। এগুলি বেশীর ভাগ শহরে। গ্রামের পরিণত নিরক্ষর ও আধা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেই রেডিও ও টিভি শোনার বা দেখার সুযোগ পাননা। আধা সাক্ষরদের ক্ষেত্রে অবশ্য সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচারও শহরে। তাছাড়া সংবাদপত্রের ভাষা আধা শিক্ষিতদের বোঝা কঠিন। এসব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র নানান বিনোদন মাধ্যম ও খেলাধূলা বার করেছেন যার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গুরুসদয় দত্ত যে ব্রতচারীর প্রবর্তন করেছিলেন তা ওই বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষারই একটি সুন্দর প্রকাশ।

কলকাতায় বয়স্ক শিক্ষার রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র বেরল সোসাল সারভিস লীগের সতোন মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি দেখালেন কতগুলি ইনডোর খেলা যা তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। এই খেলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বয়স্ক নাগরিক কৃষি ও সমবায় বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারবেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লোকশিক্ষা পরিষদ বহু বই প্রকাশ করেছেন যা অতি সহজ ভাষায় লিখিত এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলাই যার উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার ধারা এত বহুমুখী যে এখানে বই পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। তবে এ বই সাধারণ ক-খা-ক-খ বই নয়। এ বইও লেখা সম্পূর্ণ প্রথা বহির্ভূত ভাবে, ছাত্রদের শ্রেণী-মানসের কথা মনে রেখে যেমন বেরল সোসাল সারভিস লীগ বস্তিবাসী ও গ্রামবাসীদের জন্য সাক্ষর তানের আলাদা আলাদা বই বার করেছেন। একটি বইএর নাম 'নগর বাসীর লেখাপড়া'। এখানে অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা তাদের পরিবেশকে জানছে। যেমন প্রথমে শিক্ষক ছাত্রদের একটি কলতলার ছবি দেখালেন।

(৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পল্লী স্বাস্থ্য রক্ষার পুরোধা গীতা মালিক এবং আরো অনেকে

শিশিরকুমার রায়

কুড়ি বছর বয়স্কা গীতা দে নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ-নাসপাড়া গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছেন গ্রামের লোকের সেবায়। মুখে উজ্জ্বল হাসি, কাঁধে ওষুধের ব্যাগ, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গরীব দুঃস্থ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যাদি জানতে ও তার প্রতিকারে সাহায্য করতে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীর কাজ তাঁর কেমন লাগে। জবাবে ছিল আন্তরিকতায় অনাবিল স্বচ্ছতা। গীতা বলেছিলেন—দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবা করে তিনি পান অলৌকিক আনন্দ।

মোকামপাড়া গ্রামে আর একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী মালিক চ্যাটার্জীকেও প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর মনোভাব জানতে। তাঁরও উত্তরে শুনেছিলাম প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবীর কণ্ঠস্বর। গীতা দে ও মালিক চ্যাটার্জীর মত অনেক স্বেচ্ছাসেবী আজ ছড়িয়ে আছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত কতকগুলো গ্রামে। এঁরাই হলেন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের পুরোধা। আর যেসব গ্রামের অধিবাসীরা আপাততঃ এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে তাদের মধ্যেও দেখে এলাম প্রচণ্ড উৎসাহ। তপশীলি সম্প্রদায় অধ্যুষিত একটি গ্রামের ৪০ বছর বয়স্ক দাশরথি দাস ও ৭০ বছর বয়স্কা সন্তোষী দাস দুজনেই আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, এই গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের দৌলতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আজ তাদের ঘরের দুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে। গরীব গ্রামবাসীদের ঘরের দোর গোড়ায় চিকিৎসার সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই হল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, যে প্রকল্প গত বছর ১৫ই অক্টোবর পাঞ্জাবীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে চালু করা হয়েছে নূতনতর প্রয়োজন কর্মসূচীকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে।

এই গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে গ্রামের অনুন্নত লোকেদের সার্বিক স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। এবং গ্রাম বাংলায় ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প যে সাড়া জাগিয়েছে তা খুবই আশাপ্রদ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা এগিয়ে আসছে এই জনসেবাধর্মী কাজে যোগ দিতে। প্রদত্ত নূনতম শিক্ষায়তে মান রাখা হয়েছে মধ্য শ্রেণী পর্যন্ত, সেখা যাচ্ছে স্নাতক ছেলেমেয়েরাও গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী হতে উৎসাহী। যেসব গ্রামে এই প্রকল্প চালু হয়েছে সেখানে, বিশেষ করে অতি দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকেদের মধ্যে, ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা এসে গেছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের গুরুত্ব কি তা আজ আর তাদের অজানা নেই।

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যপ্রকল্পে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধের উপর। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীর মুখ্য কাজ হল কিভাবে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায় এবং রোগের প্রতিরোধ

মহিলা গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী গ্রামের কয়েকটি শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করছেন

করা যায় সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া। ধীরে ধীরে প্রত্যেক গ্রামবাসী যাতে স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়মাবলী রপ্ত করে নিজেই নিজের স্বাস্থ্যরক্ষক হতে পারে সেটাই হল প্রকল্পের আসল লক্ষ্য, অর্থাৎ জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব জনগণের হাতেই ন্যস্ত করা হবে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই প্রথম এই গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম-

বাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের একটি সার্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। আশা করা যায় এই প্রকল্প গ্রামেরই সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ। সেই কারণেই গ্রামবাসীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরই মধ্য থেকে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী নির্বাচিত করার। সাবেকী চিকিৎসা পদ্ধতি, যোগাসন ইত্যাদি আমাদের সনাতন ব্যবস্থাদিও যথাযথ স্থান পেয়েছে এই প্রকল্পে। এই প্রকল্প অনুযায়ী স্বাস্থ্যের মৌল নীতি, সাধারণ রোগ, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যসম্পর্কে গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন

হয়। তারপর তাঁকে দেওয়া হয় একটি ওষুধের ব্যাগ যার মধ্যে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয় সবরকম চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাথমিক ওষুধগুলো থাকে। আর দেওয়া হয় একটি নির্দেশ-পুস্তিকা যেখানে স্বাস্থ্যোন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ এবং সাধারণ রোগের প্রতি-কারের সহজ উপায়গুলো সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। এক একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী একদিকে যেমন স্বাস্থ্য-সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন গ্রামের প্রতিটি ঘরে তেমনি আবার অন্যদিকে গ্রামবাসী ও চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে তিনি সংযোগ রক্ষায় রেখে চলেছেন। গ্রামবাসীদের তিনি স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি নিষেধ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আবার সাধারণ রোগের চিকিৎসাও নিজেই করে চলেছেন। যেসব রোগের চিকিৎসা তাঁর ক্ষমতার বাইরে সেইসব রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবারও ব্যবস্থা করছেন। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী সরকারী কর্মচারী নন। প্রতিদিন তিনি দুটি তিন ঘন্টা জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং প্রতি মাসে তাঁকে মাত্র ৫০৲ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার একটি করে ব্লকে চালু করা হয়েছে। এক একবারে প্রতিটি ব্লক থেকে ২০ জন করে স্বেচ্ছাসেবীকে সেই ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ গ্রামে জনসেবায় নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে এই বছরের গোড়া থেকেই গ্রামে গ্রামে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রথম পর্যায়ের ফলাফল মূল্যায়নের পর অন্যান্য ব্লকেও এই প্রকল্প সম্প্রসারিত করা হবে। যদিও পরিশেষে একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী ১,০০০ পর্যন্ত গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আপাতত ১,৫০০ থেকে ২,০০০ গ্রামবাসীদের দায়িত্বই তার উপর অর্পণ করা হয়েছে।

একটি সুসংবদ্ধ গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য সংস্থা গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে এই গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পটিকে সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্য-কর্মী প্রকল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প আগে থেকেই চালু আছে। পুরাতন গ্রামীণ স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-সংস্থার বিভিন্ন শাখার চিকিৎসা কর্মীদের এক মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্যকর্মীতে পরিণত করা হচ্ছে। তাঁদের জনস্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যের সবরকম বিষয়ে জ্ঞান থাকবে। এই সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্য-কর্মী একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরোপুরি সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী তাঁর উপর একটি নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায় আপাতত চালু আছে এবং ইতিমধ্যে ১,৩৫০ জন পুরুষ ও ৩৫০ জন মহিলা কর্মী তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ করে কাজ করে যাচ্ছেন। চলতি বছরে এই প্রকল্প আরো দুটি জেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা হল, ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে প্রতি ৫,০০০ গ্রামবাসীর জন্য একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী তাঁর নিজস্ব গ্রামের লোকেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করবেন, অন্য দিকে একজন সর্বার্থসাধক

স্বাস্থ্যকর্মী একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁর জন্য নির্ধারিত বছরের এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিন পরিদর্শনে যাবেন। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী প্রয়োজনে সর্বার্ধসাধক স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেবেন এবং সর্বার্ধসাধক স্বাস্থ্যকর্মী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের পরিচালনায় কাজ করে যাবেন।

সর্বার্ধসাধক স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম প্রয়োজন উপকেন্দ্রগুলি, যা সর্বার্ধসাধক স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গ্রুপ হিসাবে অথবা স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে যে ১০০০-এর অধিক পরিবার কল্যাণ উপকেন্দ্র বর্তমানে এই রাজ্যে চালু আছে সেগুলোকেও ন্যূনতম প্রয়োজন উপকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই ধরনের

৩৮৬টি উপকেন্দ্র আছে এবং চলতি আর্থিক বছরে আরও ২০০টি উপকেন্দ্র স্থাপিত হবে। রাজ্যের ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে ৩১৮টি ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা হল ৭৩৩ এবং গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা ২। ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৭০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১১টি গ্রামীণ হাসপাতাল বর্তমানে নির্মীয়মান অবস্থায় আছে এবং চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৫টি

সর্বার্ধসাধক স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েদের [illegible]

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৪টি গ্রামীণ হাসপাতালের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। আরো ২টি গ্রামীণ হাসপাতাল তৈরীর মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। প্রতি ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে একটিকে শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে এবং বিশেষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গ্রামীণ হাসপাতালে পরিণত করা হবে।

এখন পর্যন্ত যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। তবে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতখানি তার সঠিক পরিমাপ এখনই সম্ভব নয়। এই রাজ্যে মোট ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ১৫টিতে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। স্বভাবতই সমস্ত ব্লকের প্রতিটি গ্রামে প্রকল্পটি সর্বতোভাবে চালু করা পুরুহ কাজ। তবে এই প্রকল্পের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে হলে এর ক্রমরূপায়ণের ফলাফলের প্রকৃত মূল্যায়ন সঙ্গে সঙ্গেই করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে সংশোধনী পদক্ষেপ অবিলম্বে নিতে হবে।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীর প্রশিক্ষণ মানের উপর। এবং প্রকল্পটি দ্রুত রূপায়ণের আগ্রহে আমরা যেন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বিধানে কোন গাফিলতি না করি। প্রশিক্ষণের জন্য যে তিন মাস সময় নির্ধারিত হয়েছে তা পর্যাপ্ত কিনা সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন। একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীকে অনেক কিছুই জানতে হবে এবং তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি। স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁকে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই দুটি বিষয়েই তাঁর নিজের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধের শুধু নিয়মাবলী জানলেই চলবে না, প্রত্যেকটি অবস্থার কার্যকারণ সম্পর্কেও তার সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীকে নানাবিধ সাধারণ অসুখের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হবে এবং কোন দুর্ঘটনায় লিপ্ত লোকের প্রাথমিক চিকিৎসাও তাঁকে করতে হবে। সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেমন তাঁকে জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সদ্যোজাত শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়গুলি। মজলা জল ওষে নেওয়ার পর, বসতবাড়ী সংলগ্ন শাকসব্জীর

যাবার, কম্পোস্ট সারের গর্ত বা ধোঁয়াবিহীন উনান কিভাবে তৈরী করতে হয় সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী হলেন সর্বাঙ্গীন জনস্বাস্থ্যের রক্ষাকর্তা। এমন একজন লোকের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ যেমন ত্রুটিহীন হওয়া দরকার তেমনি দরকার কর্তব্যরত অবস্থায় কিছুদিন পরপর তার জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা।

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীকে সব সময়ই কর্মচঞ্চল থাকতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে তাঁকে নিয়মিতভাবে ওষুধ সরবরাহ করা যাতে ওষুধের অভাবে কখনও তাঁর কাজ ব্যাহত না হয়। অনেকের মতে, ওষুধ যোগানের একটি নিরবচ্ছিন্ন-যোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে যোগান-ব্যবস্থা তেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। একথা মনে রাখা দরকার যে একজন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মী প্রয়োজনের সময় ওষুধের অভাব দেখালে গ্রামবাসী তাঁকে ক্ষমা করবে না এবং এরূপ পরিস্থিতির ঘন ঘন উদ্ভব হলে এই প্রকল্পের উপর তাদের আস্থাও শিথিল হয়ে যাবে।

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হল গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারদের গ্রামে যেতে অনীহা। অথচ গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হলে যোগ্যতাসম্পন্ন আরো অনেক ডাক্তারের প্রয়োজন। এইসব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদেরই সর্বাধি-সাধক স্বাস্থ্যকর্মী এবং তাঁর মাধ্যমে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কর্মীকে তাঁদের কাজে পরিচালিত করতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের যে সমস্ত পদের কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলে অথবা অনুন্নত এলাকার রয়েছে সেইসব পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী সহজে পাচ্ছেন না। যেখানে শহরের মোহ গ্রামাঞ্চলের জনসেবার আগ্রহের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করে সেখানে ডাক্তারদের গ্রামমুখী করবার জন্য বিশেষ উৎসাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা হল অন্যতম। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যের সর্ত হল তিনটি—কর্মসূচীর সঙ্গে গ্রামবাসীদের একাত্মবোধ থাকতে হবে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের নিঃস্বার্থ জনসেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং কর্মসূচীকে সর্বতোভাবে রূপায়িত করবার জন্য সজাগ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রী নন্দী ভট্টাচার্যের কথায় বলতে গেলে, সর্বাঙ্গীন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীটির রূপায়ণ এক ধরণের গণ আন্দোলন এবং এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে তখনই যখন সমাজ-সচেতন স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হবে।

নিরাপদ ভ্রমণের জন্য

আপনার নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিতে টিকা করবার ও সমাজবিরোধী গ্রেপ্তারের পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।—

(ক) ৮৭ মাইল। ৮৮ মাইল — হাওড়া-পাটনা এক্সপ্রেস (হাওড়া এবং মোকামার মধ্যে)।
(খ) ২ মাইল। ১ মাইল — হাওড়া-দেওঘর মেল (হাওড়া এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে)।
(গ) ৩০ মাইল। ২৯ মাইল — হাওড়া-দেওঘর এক্সপ্রেস (হাওড়া এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে)।
(ঘ) ৮৯ মাইল। ৯০ মাইল — হাওড়া দিল্লি মেল-এক্সপ্রেস (হাওড়া এবং মোকামার মধ্যে)

নিরাপত্তা এবং ভদ্রতার স্বার্থে সমাজবিরোধী আপনার কিছু ক্ষতিকর ক্ষতি এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হবে।

ট্রেনের সমস্ত কামরাতেই রেলরক্ষী অফিসার অভিযোগ গ্রহণ করবেন। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলে এই সব ট্রেনে কর্তব্যরত পুলিশ অথবা রেলরক্ষীবাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আপনার মালপত্রের নিরাপত্তার জন্য রাত্রিবেলায় কামরার দরজা-জানালা ছিটকিনি আটকিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।

ট্রেনে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আপনার নজরে এলে পুলিশকে খবর দিন।

ট্রেনের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধান এবং অপরাধীকে ধরা—এই উভয় কাজেই পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

জেলা শিল্প কেন্দ্র গ্রামীণ শিল্পে নতুন উদ্যোগ

ডঃ অমরনাথ দত্ত

গ্রামীণ শিল্পায়ণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেলা শিল্পকেন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ জাতীয় শিল্পনীতি ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, অচিরেই এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ অর্থনীতির শিল্পায়ণে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাবে। গ্রামের কোটি কোটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের বিরাট শিল্পব্যবস্থাকে কোনমতেই সচল করে তোলা সম্ভব নয়। ভারতের সমস্ত গ্রামে এজন্য ঘটাতে হবে ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পায়ণ এবং একই সঙ্গে শিল্পের বৈচিত্র্যসাধন।

প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে শিল্পায়ণের যে নতুন রূপরেখা সংযোজন করা হয়েছে তার মূল ভিত্তি-ভূমি হিসেবে জেলা শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে আগামী চার বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু সংশোধিত কর্ম-সূচী অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে চলতি আর্থিক বছরের শেষেই দেশের সব-কটি জেলাতে শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠবে।

দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত গ্রামীন অর্থনীতির বনিয়াদ নতুন করে কীভাবে গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে নানান সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে একমাত্র এগুলির মাধ্যমেই বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক প্রকল্প গড়ে তোলা ও ফলে বহুল কর্ম-সংস্থান সম্ভব হবে। গ্রামীণ শিল্পায়ণে যে সব প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলি হ'ল ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, অতি ক্ষুদ্র শিল্প, চাহিদা-ভিত্তিক শিল্প ও সম্পদ-ভিত্তিক শিল্প যার মাধ্যমে রোজগার-নিয়োগের পরিসর ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে।

নতুন এই পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করতে যেসব কর্মসূচীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে কার্যক্রম অনুযায়ী এভাবে সাজানো যেতে পারে:

(১) জেলা পর্যায়ে এমন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন যাতে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো যায় ও সহায়তা করা যায়। কুটির ও গার্হস্থ্য শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই কেন্দ্রের একটি পৃথক শাখা থাকবে।

(২) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মৌলিক শিল্পবনিয়াদ গড়ে তোলা। এগুলির মধ্যে রয়েছে জমি, জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রাথমিক সুবিধার বন্দোবস্ত করা যাতে নতুন শিল্পোদ্যোগগুলি কোন অসুবিধায় না পড়ে।

(৩) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পগুলির জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান মারফৎ ঋণের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া ও ঋণপ্রাপ্তির সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া।

(৪) ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্যকারী বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কম মকুবের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান।

এই আর্থিক বছরের মধ্যেই ৪৬০টি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। এর মধ্যে ২১২টি জেলা শিল্প-কেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। এই শিল্পকেন্দ্রগুলির উপরে অনেক দায়িত্ব একই সঙ্গে অর্পণ করা হয়েছে। উপরের কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র শিল্পোদ্যোগ চালু করলেই হবে না। সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে ও লাভজনক হয় তা দেখা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রয়োজন হ'ল নতুন উদ্যোক্তাদের শিল্পসূচী সম্পর্কে অবহিত করা, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও পরিশেষে কারিগরি শিক্ষা ও পরামর্শের মাধ্যমে নতুন এক গ্রাম-ভিত্তিক শিল্প প্রসারে উৎসাহী উদ্যোক্তা-শ্রেণী গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য, এগুলিতে খুবই নৈপুণ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে দরকার অর্থসাহায্য ও শিল্পভিত্তিক কারিগরি দক্ষতার যথাযথ সমন্বয়।

এক একটি জেলায় শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত খরচ পড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ বরাদ্দ করবেন আর রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমির বন্দোবস্ত করবেন। স্থির হয়েছে যে প্রতি বছরে ৫ লক্ষ টাকার মত অনুদান আসবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিকে চালু রাখবার জন্য।

একটি শিল্পকেন্দ্রে পরামর্শদান ও প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাবার জন্য অন্যূনাধিক ৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকবেন। এঁদের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার পদে থাকবেন একজন আর বাকী ৭ জন পেশাভিত্তিক ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত থাকবেন। এঁদের ভার-প্রাপ্ত দপ্তরগুলি হবে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বস্তুপাতি ও সরঞ্জাম, গবেষণা-প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল সরবরাহ, পণ্য বিপণন, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প এবং

গ্রামীণ কারিগর নিয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক কর্মসূচী। এগুলির মূল উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামীণ শিল্পের উৎপাদকদের একই ছাদের তলায় প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পগুলির ভূমিকা কি হবে। বৃহৎ শিল্পগুলি এক্ষেত্রে একান্তিকভাবে তাদের অবদান রাখতে পারে। শুধুমাত্র যন্ত্রাংশের জোগান মারফৎ তারা লাখো হাজার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে জিইয়ে রাখতে পারবে। আর ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের পক্ষেও সেটা একটা মস্ত সহায় ও নির্ভরতার উৎস হয়ে দাঁড়াবে। দুঃখের বিষয়, এরকম একটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। জাপানের মত একটা ছোট দেশে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বৃহৎ শিল্পগুলিকে জোগানের ভার নিয়ে থাকে। আমাদের দেশে সেই অনুপাত হ'ল বড়জোর ৫ থেকে ৬ শতাংশ।

জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে সব কিছুর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে কাজে এগোতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে বিবেচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। এগুলি হ'ল:

(১) বিশেষ প্রকল্পটি কি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণী যেমন প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন চাষী, গ্রামীণ কারিগর প্রভৃতির উন্নতি বিধান করতে সমর্থ হবে?

(২) কতজন গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান ঘটবে?

(৩) স্বেচ্ছানিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কতজন গ্রামবাসী ওই প্রকল্পে নিজেদের একাত্মভাবে অঙ্গীভূত করতে পারছেন?

(৪) গ্রামবাসীরা এর ফলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন তা কতকাল ধরে বজায় থাকবে?

যদি কোন প্রকল্প উপরোক্ত সর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে তাহলে তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসূচী পূরণে নিশ্চয়ই সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজটি যে কত তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে তার একটা নমুনা হাতে কলমেই মেলে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে গত মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই ৮টি জেলায় শিল্পকেন্দ্র কাজ সুরু করে দিয়েছে। এই জেলাগুলি হ'ল দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণা। ইতোমধ্যেই যে সব জেলায় গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পগুলি চালু ছিল সেগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদানের সাহায্যে আরও উন্নত করে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন করে জেনারেল ম্যানেজার ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। এইসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়নী সংস্থা তাঁদের কাজ চালু করে দিয়েছেন। স্থির হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই শিল্পকেন্দ্রগুলি এবছরের মধ্যেই কাজ সুরু করে দেবে।

অগ্রগতির এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। তবে সবচাইতে বড় কথা হ'ল, শিল্প উদ্যোগের বিভিন্ন ঝামেলা খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বিবেচনা ও যাচাই করে দেখতে হবে। এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি প্রয়োজন রয়েছে দেশজোড়া প্রচার, ব্যাপক সমন্বয় ও পারস্পরিক আদান প্রদানের। সরকার, জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক স্তরে নানাভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। এখন প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাথমিক সংঘাত বা impulse তৈরী করা। চার বছরের এই কর্মসূচী এক বছরের রূপায়িত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছাড়া কিছুই নয়। এই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলার মধ্যেই গড়ে উঠবে নতুন অর্থনীতি। জেলা শিল্পকেন্দ্র তারই অগ্রদূত।

চার দেয়ালের বাইরে

(৩২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বলছেন, 'এই দেখুন ভাই, এটা হল কমলালেবু।' সঙ্গে সঙ্গে ক বর্ণটি দেখানো হল। কমলালেবুর ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বস্তিবাসীদের পানীয় জল সমস্যার কথা বলছেন। এই সমস্যার প্রতিবিধানও বাতলে দিচ্ছেন। এখানে বই থাকতে পারে। তবে এসব ছবি দেখাতে হবে ডাইরেক্টের মাধ্যমে। শ্রবণ-দর্শন পদ্ধতি হল এই শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি।

কৃষক সাক্ষরতাও শুরু হচ্ছে ঠিক এই ধরণের শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে। যেমন শিক্ষক বলবেন: নব একজন চাষী। নব নিজ জমি চাষ করে। নব ও একর জমি চাষ করে। নবর জমি দো আঁশ মাটি। এই বাক্যগুলির মাধ্যমে ন ব র জ ইত্যাদি বর্ণ দেখানো হয়। কিন্তু বর্ণ পরিচয় একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আগেই বলেছি বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষার শেষ নয়, শিক্ষার শুরু। সারা জীবন ধরে চলে এই শিক্ষা। নাচ, গান, পুতুল নাচের মাধ্যমে, অভিনয়, পোস্টার ও ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে এই অবিরাম শিক্ষা-পদ্ধতি চলতে থাকে। তখন এটি আর নিছক শিক্ষার পর্যায়ে থাকেনা, এটি পরিণত হয় কমিউনিকেশনে। মিডিয়াম আর মেসেজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। শিক্ষক পরিণত হন কমিউনিকেটরে, আবার কমিউনিকেটর মানে সম্প্রসারণ কর্মী, জনসংযোগ কর্মী, তথ্য অফিসার, সমাজকর্মী, কমারশিয়াল শিল্পী, সাংবাদিক, অভিনেতা সবাই শিক্ষকের পর্যায়ে উন্নীত হন।

গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক ব্যাপক গণশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সরকার আশা করছেন, ১৯৭৮-৮৩ সালের মধ্যে নয় বছরের ওপর ১ কোটি ২০ লক্ষ ও ১১ থেকে ১৪ বছরের (অধিকাংশ ড্রপ আউট, বাকীরা নিরক্ষর) ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়েকে নন-ফরমাল পারট টাইম শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসবেন। এ ছাড়া বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য আলাদা কর্মসূচীরও আছেই।

চাষীর কুঁড়ে: আজ আর কাল

দুর্গা বসু

দক্ষিণ বাংলার গ্রামে থাকি। চাষীদের গ্রাম। আশী ভাগই মাটির একতলা বাড়ী, হয় খড়ের, নয় টালির চাল। মেরামতি দেখেই বোঝা যায়। গ্রামে কোন মেথর নেই, কাজেই নেই খাটা পায়খানা। শতকরা এক ভাগ বাড়ীতে স্যানিটারী পায়খানা আছে। বাকি সবার ভরসা খাল, বিল, মজাপুকুর, মাঠের কোণবাড়। বাসনমাজা, কাপড়কাচা, স্নান এমন কি অনেক বাড়ীর রান্না ও খাবার জলেরও উৎস ওই সব দূষিত খাল, বিল, মজা পুকুর। পঞ্চায়েতের টিনাট টিউবওয়েলই ভরসা। মশা মাছির পাট নেই-ই। ছাঁচা বেড়া আর খোড়ো রান্নাবাড়ী, গোয়াল, ছাগল বাঁধার ঝুপড়িগুলোর প্রায়ই আগুন লাগে—বিশেষ করে শীতকালে। ঠাকুরের কৃপা, এ পর্যন্ত বড় আগুন লাগেনি। সমকল বলতে সেই বারো মাইল দূরে টালিগঞ্জের 'অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র'। গাড়ী আসতে গ্রাম উজাড়। এলেই বা কি! গ্রামের প্রধান রাস্তাটাই তো কাঁচা সাত ফুট চওড়া কাদার নর্দমাবিশেষ। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—এই তিনমাস হাঁটু জল ভেঙে চলাফেরা করতে হয়—পুলের অভাবে। এপথে দমকল, অ্যামবুলেন্স, মাটি পরীক্ষার ভ্যান বা পুলিশের গাড়ী ঢোকা তো দূরের কথা, শীতকালটা বাদ দিলে বাকি ন মাস সাইকেল রিক্সাও ঢোকে না।

সারা ভারতবর্ষের ৫,৭৫,৯৩৩টি গ্রামে কম বেশী এই একই ছবি। রাস্তাঘাট অন্তর্ভুক্ত, নালানর্দমা নেই। স্যানিটারী পায়খানার অভাবে নদী, পুকুর, ডোবা, গাভকুয়ো তামাম দূষিত। পাঁচটা গ্রামে পড়ে একটা ডাক্তার, একটা প্রাইমারী স্কুল আছে কিনা সন্দেহ। অথচ আজ ৫১ কোটি লোক থাকে এই সব গ্রামেই। বাকি ১৩ কোটি নাধা ও'জেছে ৫,২২২টি শহর বা আধা শহরে যেখানে গড়ে উঠছে ডেভালাপমেন্ট অথরিটি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কি নিদেন পক্ষে আবাসন পরিষদ আর মিউনিসিপ্যালিটি: সীমিত হলেও অন্তত একটা চেষ্টা চলছে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষকে ন্যূনতম আবাসিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে। কিন্তু গ্রামীণ ভারতে এই সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা এখনো দূর অস্ত। দলফুট বাই বারো ফুট ঝুঁড়েঘরে, এক গণ্ডা অসুস্থ ছেলে মেয়ে, গরুর, শাওড়ী, দুটো বলদ, একপাল হাঁস মুরগী, ভাল, জোয়াল, লাঙল, মই আর এক কোণে ইটপাতা কাঠের উনুন ঘরতে আঁচ ওঠে একতাল, ধোঁয়া ছেড়ে তিনতাল—এই নিয়ে সংসার করছে চাষীর বউ। স্বভাবতই চাষীকে ছেলেদের নিয়ে রাত কাটাতে হয় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে বা ওটি ওটি এগুতে হয় ধানক্ষেতে—পাহারা দেবার জন্য যেখানে ঝুপড়ি বাঁধা আছে। ওটিয়ে ওটিয়ে ওলে দু তিন জনকে ধরে যায়। বিশ তিশ মাইল দূরে শহরের বহুতল বাড়ীর নিভৃতে বসে কোন হাউসিং কমিশনারের পক্ষে এই আশীভাগ দেশবাসীর দুঃখ দূর করা শক্ত, বেশ শক্ত।

তবে গ্রাম বাংলার সামনে আজ এসেছে অভূতপূর্ব সুযোগ। পঞ্চায়েতের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে গ্রামের যুবশক্তি। সরকারী বা বেসরকারী সমাজ কল্যাণ কর্মসূচিকে গ্রাম গ্রামে পৌঁছে দিতে এই যন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারে। পাঁচ বছরে পশ্চিম বাংলায় এক অপূর্ব বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। নগর পরিকল্পনা আর গ্রাম পরিকল্পনা ঠিক এক ধাঁচের নয়। বহুতল বাড়ী, প্রশস্ত রাজপথ বা নয়নাভিরাম উদ্যান নয়, গ্রাম বাংলার প্রয়োজন পাকা রাস্তা বা অন্ত ওয়েদার রোড, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বাঁধানো নর্দমা, কম্যুনিটি-সেপটিক-ট্যাঙ্ক—মৃদু স্যানিটারী পায়খানা, এমন কিছু টিউব-ওয়েল যাতে জল ওঠে। বেশ কিছু হেল্‌থ সেন্টার আর প্রাইমারী স্কুল যাতে দুধের বাচ্চা আর গর্ভবতী মাকে দু মাইলের বেশী হাঁটতে না হয়। পরিবার পিছু একখানা করে ট্রেঞ্চলেট দু-কামরা আস্তানা। দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে হাইস্কুল, টেলেক্সিসিটি, পাম্প করা পাইপ বাহিত জলের কল আর বাড়ী পিছু তৃতীয় ঘরখানা। এই সব বাড়ীর দেয়াল হবে সিমেন্ট বাঁধা ইটের, ভিতরে বাইরে চুনকাম করা। ঘর প্রতি থাকবে অন্তত দুটো জানলা ৫'×৪' সাইজের—যা যাবে, শীতে বা বর্ষায় ভিতর থেকে আটকানো যায়। ছাদে থাকবে অ্যাসবেস-টসের ঢালু চাল—যাতে আগুন না লাগে, জল না পড়ে, বছর বছর পাল্টাতে না হয়। ইটের মেঝেতে থাকবে সোডা মেশানো সিমেন্ট বালির প্রলেপ যাতে ঘামে উঠে সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া না হয়।

বর্ষাপ্রধান ঘেমো আবহাওয়ায় ঘরের মধ্যে প্রয়োজন প্রচুর রোদ, আলো, বাতাস। ঢালু অ্যাসবেসটসের চাল ও বড় বড় জানলা গ্রাম বাংলার পক্ষে একান্ত দরকারী। ঘরের কোণে রান্নাঘর ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে, ওমই দিনে ভোগায় ধিংড় বিপ্রদরের জ্বালায়। এর এককোণে স্বল্প খরচে পড়া যায় রান্নাবাড়ী যাতে ঘর-গুলো বাঁচে ঝুল, কালি, ধোঁয়ার হাত থেকে। উনুনে কাঠ ও ঘুঁটের বদলে গুল কয়লার ব্যবহারে ধোঁয়া হবে না, আঁচ বেড়ে খরচ কমবে, বেঁচে যাবে অনেক বনসম্পদ আর জৈবসার যা

গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে অনুকূল। আর সৃষ্টি হবে শুধু কারিগরী—গ্রামীণ শিল্প, ভৌগলিক জোগাবে নিরন্ন গ্রামবাসীকেই।

আর এক ধরণের বাড়ী গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করা যায়। এবাড়ী তৈরী হবে খুঁটি বা পিলারের উপর মাত্র দুফুট উচ্চতায় মাচা বেঁধে। আমেরিকান স্টিলেটেড হাউসের দেশীয় সংস্করণ। সিমেন্ট খরচ কমবে অথচ ভ্যাপ বা ঘাঁতা উঠবে না। পোকা, তক্ষক আর সাপের নাগালের বাইরে মাচায় থাকবে মানুষ। তলায় গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী আর ভরোসা। চুরির ভয় কমবে। অবশ্য বেড়ো রুপীরা আমার উপর চটবেন। কিন্তু এ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে সস্তা অথচ উঁচুমানের মুহ, অনাড়ম্বর কিন্তু উঁচু মানের গ্রাম। গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থা বা রুরাল হাউসিং-এর এই উঁচুমান আনতে হলে নয়াদিল্লীর ন্যাশানাল বিল্ডিং অর্গানিজেশনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি এঁরা সুলতানপুর গ্রামে দু-কামরা বাড়ী তৈরী করেছেন। খরচ পড়েছে ১৬৭০ টাকা। রোদে পোড়া ইট আর 'ওয়াটার-প্রুফ' প্লাস্টার দিয়ে গাঁথা এ বাড়ীর ছাদ শুধু মেঙ্গলো খড় দিয়ে ছাওয়া যাতে গোরু মানুষ না বাসা বাঁধে। প্রয়োজনে আরো একটি ঘর সহজেই যোগ করা যাবে। রুচি, সঙ্গতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে তৈরী করার মত বহু বাড়ীর নকশা তৈরী করেছেন এই সংস্থা। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এঁরা সব রকম কারিগরী সাহায্য দেবেন।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও গ্রামীণ গৃহহীনদের জন্য এক প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। তাতে জমি ছাড়াও ছাদ ও দেয়ালের মালমশলা বাবদ মোট প্রতি ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। গৃহহীনকে জোগাতে হবে কায়িক শ্রম। প্রায়ই দেখা যায় অভাবী গ্রামবাসী আর্থিক অনুদান নষ্ট করে ফেলেন। সরকারের উচিত আর্থিক অনুদানের বদলে এঁদের হাতে গৃহনির্মাণের মালমশলা দেওয়া আর সেই মালমশলা কাজে লাগানোর কর্তৃত্ব দেওয়া পঞ্চায়েতকে।

এখনো এক শ্রেণী গ্রামের লোক গ্রামবাসীর এরকম কুঁড়েঘরও নেই

জীবন বীমা কর্পোরেশনের গৃহ-নির্মাণ খাতে জীবন বীমার পরিবর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থায় মস্ত সুবিধা ধার শোধের আগে গৃহদের মৃত্যু হলে, বীমার টাকা থেকেই বাকি ঋণ শোধ হয়ে যায়। বাড়ী মৃতের পরিবারেরই থেকে যায়। এই প্রকল্প সবেতেই সীমাবদ্ধ। তবে আবাসন সমবায়ের মাধ্যমে সাহায্য চাইলে কর্পোরেশন তা গ্রামাঞ্চলেও দিয়ে থাকেন। আবাসন সমবায় গড়তে সাহায্য পাবেন ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ হাউসিং ফিনান্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (এক্সটেনশান), কলিকাতা-২২ ঠিকানায়। আবাসন সমবায়ের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই সফল নয়। এই অসাফল্যের কারণ ব্যক্তি-স্বার্থ। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর সেক্রেটারী প্রেসিডেন্ট সরল গ্রাম মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আখের গোছান। কারিগরী ব্যাপারে অনভিজ্ঞ গ্রামীণ মানুষ এদের মারপ্যাঁচ বোঝে না বা বুঝলেও শহরে সরকারী সমবায় কর্তাদের মেরে আনতে সমর্থ হয় না। সারা দেশে এক কোটি পনেরো লক্ষ গ্রামীণ পরিবার গৃহহীন। এদের মধ্যে ৭৩ লক্ষ বাস্তু জমি বণ্টন করা হচ্ছে। এর তিনের এক ভাগ অর্থাৎ ২৪ লক্ষ বাড়ীও যদি সমবায়ের মাধ্যমে হয়, তবু কয়েক সরকারী সমবায় কর্মীর পক্ষে কড়া নজর রাখা অসম্ভব। আর এইখানেই লুকিয়ে আছে আবাসন সমবায়ের মূল ব্যর্থতা। আমার মতে, গ্রামীণ আবাসন সংস্থাগুলির উপরও কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হোক পঞ্চায়েতকে। এতে গ্রামীণ গৃহ-হীনদের ঠকতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার হবে . . সর্বনাশ হবার আগেই। পাঞ্জাবে ১১০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাসন সমবায় সমিতি আজ সাফল্য লাভের পথে। সরকারী অনুদান ৮৪ লাখ টাকা দিয়ে তৈরী হচ্ছে হাজার হাজার গ্রাম বাড়ী।

ইউনাইটেড নেশানসের মতে উন্নতিশীল দেশে প্রতি হাজার পরিবারে বছরে ১০টি বাড়ী গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের দেশ হচ্ছে ৩টি। তাও শহরে হিসেবে। গ্রামে গতি আরো মন্থর। তিন ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পাঁচশো পরিবারের গ্রামে গড়ে প্রতি দু বছরে একটি গৃহহীন পরিবার বাসা বাঁধতে পারছেন। কি করুণ অবস্থা। আসুন না, পাঞ্জাবীদের মতই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চেষ্টা করি ঘর বাঁধার হেটাকে কুড়ি গুণ বাড়িয়ে তুলতে।

কৃষ্ণ দেবনাথ

কথা ও কাজ

অন্ধকার থেকে আলোকে

সাক্ষরতার লক্ষ্যে

কালো ছাপটা চক চক করছে।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের কালি-মাখানো সুক্ষ্ম রেখাময় ছাপটা বি. ডি. ও অফিসের ফাইলের পাতায় একনজরেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। নিজের হাতের আঙুলের ছাপটা দেখেই বয়স্ক নিরক্ষর রায়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। কেমন যেন কুণ্ঠিত মনে হয়। নিজের নামটাও সে সই করতে পারেনা। কি লজ্জা! কৃষি-ঋণের টাকাটা নিতে হচ্ছে তাকে টিপসই দিয়ে। টিপসইতে নয়, যেন কলঙ্কের কালি ফাইলের পাতায় লেপটে দিয়েছে। এ কলঙ্ক অবশ্য নিরক্ষর রায়ের কেবল নিজের নয়। এ কলঙ্ক দেশের বেশির ভাগ মানুষের। কলঙ্ক সারা দেশের। সমগ্রজাতির। এ কলঙ্ক নিরক্ষরতার।

নিরক্ষরতার এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য এবার দেশ জুড়ে এক কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে। সে সাক্ষরতার অভিযান। সারাদেশের বুক থেকে এই কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য বিশেষ অভিযান সূচনার তারিখটির নির্ঘণ্ট নির্দিষ্ট হয়েছে আগামী দোসরা অক্টোবর। জাতির জনকের জন্ম-জয়ন্তীদিনে। সেদিন থেকে দেশের কোনে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচী শুরু হবে। এই জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। লেখাপড়া শেখানো হবে পনের থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মানুষদের। এই কর্মযজ্ঞের সুফল বর্তাবে দেশের দশ কোটি মানুষের ওপর। তারা অশিক্ষার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ হবে।

এটা সৎসঙ্কল্প, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু পিছন ফেরা যাক। দেখা যাক অতীতের অভিজ্ঞতা। সেই সন্ধানী মনোনে উদ্ভাসিত উত্তর-স্বাধীনতা পর্বটাকে একবার সমীক্ষা চালানো যাক। কিন্তু সে ছবিটা যেমন খুব স্পষ্ট নয়—নয় তেমন সুন্দরও। স্বাধীনতার ঠিক বছরে স্বাক্ষরতা ছিল তখন মানুষ মাত্র এগারোজন আনাকের একজন। উনিশ শ একাত্তর সালে যাঁদের বয়স ছিল পনের থেকে পঁয়ত্রিশ তাদের শতকরা প্রায় বাইশজনই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। সাধা গুনতিতে সে হিসাব তখন ছিল ন কোটি পঁচাত্তর লাখের মত। এই আট বছরে ছত্রাবতই সেই অঙ্কটা বেড়ে আরও অনেক বড় হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে অক্ষরের আলোকে আলোকিত করতে হবে অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্কল্প তাই

অবশ্য সঙ্কল্প গ্রহণ আর সঙ্কল্প সিদ্ধি এককথা নয়। সংবিধানের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেটা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কুলনই সমস্যাসীমা বাড়ানো হয়েছে। এতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে নিরক্ষরের সংখ্যা। বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ সক্রিয়তা আসেনি। উচ্চশিক্ষা যতখানি সরকারী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তার প্রসারে মত অর্থব্যয় হয়েছে, প্রাথমিক কিংবা বয়স্কশিক্ষা কিন্তু তত-খানি গুরুত্বের মর্যাদা এতদিন পায়নি। জনতা সরকারের শিক্ষানীতি সেদিক থেকে অনেক বাস্তব এবং সুদূরপ্রসারী। এবারকার শিক্ষাখাতে বাজেটবরাদ্দের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই নির্দিষ্ট হয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক আর বয়স্ক শিক্ষার খাতে। বর্তমান যোজনার ব্যয়বরাদ্দে মোট ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকাই এইখাতে ব্যয় করার প্রস্তাব রয়েছে। সরকার শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্প উপলব্ধি করতে পেরেছেন, শুধু মাথায় ভূত চাপাই যথেষ্ট নয়, দেশকে সত্যিই গড়ে তুলতে হলে মাটির দিকে নজর দেওয়া দরকার। দশ কোটি নিরক্ষর মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা সহজসাধ্য নয়। প্রয়োজন বিপুল উপকরণের। বইপত্র, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও দরকার বিপুল সংখ্যক কর্মী। একমাত্র চীন ছাড়া সারা বিশ্বে অন্য কোথাও এমন বিশাল এক মানব-গোষ্ঠীকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনার—সাক্ষরতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়নি।

এই ব্রত পালনের আসল জায়গাটি কোথায়? সে হল গ্রাম। এই বিশাল ভারতবর্ষ হল গ্রামে গাঁথা মালা।

কুষকের কুটিরে, মজুরের ভাঙা ঘরে, মেথরের বৈসালে, হরিজনের মাটির ঘরে, সাঁওতালদের পল্লীতে শিক্ষার দীপশিখাটি জ্বালাতে না পারলে সব ব্রত ব্যর্থ। কারণ শতকরা সত্তর থেকে আশিজন মানুষ এই পল্লী-এলাকারই বাসিন্দা। সুতরাং গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে বয়স্ক শিক্ষার পাঠশালার পত্তন চাই। কেবল সময়ের সুযোগটি নিয়ে নিতে হবে। দুপুরের অবসরে, বিকেলের বিশ্রামে, সন্ধ্যার আসরে অথবা রাত্রির বিনোদনে গ্রামের মানুষের দরজায় হাজির হয়ে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে শিক্ষার সেই জিওনকাঠিটি। নতুন জীবনের সূচনার সেই হবে শুভযাত্রা।

অবশ্য শুভযাত্রার আগে প্রতিদিনকার যাত্রাপথটি পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। কারণ সামনের যাত্রাপথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়—বরং বলা যায় কণ্টকাকীর্ণ।

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার কত? উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে এই হার ছিল মাত্র শতকরা ০.৭৫ ভাগ। এর আরও প্রায় পঁচিশ বছর পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় এই হার বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৬.৬ ভাগ। একত্রিশ সালে হারটা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ছিয়ত্তর ভাগ। একষট্টি সালের আদম-শুমারীতে দেখা যায়, পনের থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ন কোটি আট লাখ। ওই বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে নিরক্ষরতার হার হল শতকরা সাতষট্টি ভাগ। ওই বয়সের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতার হার আরও বেড়ে গেল পরবর্তী দশ বছরে। তাদের সংখ্যা তখন হল ন কোটি পঁচাত্তর লাখ। একদিকে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুত হারে। সাক্ষরতার সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু আসলে নিরক্ষরতার সংখ্যাও সেই হারে সমানে বেড়ে গিয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার বাবদে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল আট কোটি টাকা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীতে তা বাড়িয়ে করা হয় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। এমনি-ভাবে সাক্ষরতার অভিযান আর নিরক্ষরতার সংখ্যা পাশাপাশি বাড়তে থাকে।

এতো সারা ভারতের চিত্র। কিন্তু এবার আমরা একটু ঘরের দিকে চোখ ফেরাই। সাক্ষরতার নিরিখে দেখি পশ্চিমবঙ্গের হাল হকিকৎ। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষাদীক্ষায় সবার উপরে। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে হালটা কি দাঁড়াল? পশ্চিমবঙ্গ পড়ল পিছিয়ে। রাজ্যওয়ারি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ হল পঞ্চম। উনিশ শ একাত্তরে রাজ্যের মোট লোক সংখ্যা ছিল ৪,৪৩,১২,০১১। তার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ১,৪৭,১১,৭৫১। অর্থাৎ শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় শতকরা ৩৩.২০ ভাগ। এরমধ্যে চার বছর পর্যন্ত শিশুদের বাদ দিলে শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় শতকরা ৩৮.৮৩ ভাগ। পুরুষরা একটু এগিয়ে। শতকরা হার ৪৯.৫৭ ভাগ। মেয়েদের হার শতকরা ২৬.৫৬ ভাগ। পুরুষ শিক্ষিতের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সারা ভারতের রাজ্যগুলির বিচারে ষষ্ঠ। আর কেবল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ধরলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয়।

শহর কলকাতা সারা রাজ্যে এখনও সেরা। সে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিলাসিতায় নয় — শিক্ষাদীক্ষায়ও। কলকাতায় শিক্ষার হার শতকরা ৬৫.৫০ ভাগ। আবার মাদ্রাসা শিক্ষায় পড়ে রয়েছে শিছনের সারিতে। শতকরা হার ২০.৯৬ ভাগ মাত্র।

শিক্ষার অগ্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গ একসময় সারা ভারতে এগিয়ে ছিল। গত সত্তর বছর ধরে এই ধারা চলে আসছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য দ্রুত এগিয়ে যায়। সেই তালে পশ্চিমবঙ্গ পা মেলাতে না পেরে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে শিক্ষার হার উঁচু। কিন্তু ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে সেই হারে আবার শিক্ষার অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার হার হল শতকরা ২১.৩৩ ভাগ মাত্র। আর মেয়ে কৃষি শ্রমিকদের হার হল মাত্র শতকরা ৬.১৬ ভাগ। তবে তপশিলী এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনও শিক্ষাদীক্ষায় বেশী পশ্চাৎপদ রয়েছেন। তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা শতকরা ১৭.৮০ জন এবং উপজাতিরা শতকরা মাত্র ৮.৯ জন এই রাজ্যে শিক্ষিতের পর্যায়ে পড়েন।

দেশের গ্রাম যে গ্রাম সেখানে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গ্রামের অধিকাংশ মেয়েরাই—যাদের লেখাপড়া জানা পর্যায়ে ফেলা হয়, তাদের শিক্ষা শেষ হয় প্রাথমিক পর্যায়ের অথবা মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই। যে সব মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছেন অথবা প্রাক-স্নাতক পর্যায়ের তাদের বেশিরভাগই শহরের বাসিন্দা। এই হল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হাল।

দেশের এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ অন্ধকারের রাজ্যে হাতড়ে মরছেন তাদের আলোকের এলাকায় নিয়ে আসাটাই হল আসল কাজ। একাজ চলেছে অনেকদিন ধরেই। কবে শুরু হয়েছিল বয়স্ক শিক্ষার কাজ সেকথা সঠিক কেউ বলতে পারেনা। তবে যে রেকর্ড পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, সাক্ষরতা আন্দো-লনেরও প্রবর্তক সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরই। তিনিই ভারতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। সে আজ থেকে একশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। আঠারশ তিপ্পান্ন সাল। বীরসিংহে গ্রামে বিদ্যাসাগর গ্রামের নিরক্ষর দিনমজুর

গরীব মানুষ ও চাষীদের নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সারা ভারতবর্ষে এই সংগঠিত প্রচেষ্টা প্রথম। এবছর সেই প্রতিষ্ঠার ১২৫-তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর জন্মদিনে পশ্চিম দিনাজপুরের বড়াবেলা গ্রামকে নিরক্ষরতা মুক্ত করে সেই উদ্যোগের স্মৃতিতর্পণ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সঙ্কল্প: একশ পঁচিশটি গ্রাম পুরোপুরি ভাবে নিরক্ষরতা মুক্ত করে ১৯৮০ সালে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বর্ণ-পরিচয় প্রকাশের একশ পঁচিশতম বার্ষিকী উদযাপন করা হবে।

বয়স্ক শিক্ষার প্রসার বড় কঠিন কাজ। বাধা বিস্তর। আবার এব্যাপারে উদ্যোগ, উৎসাহও আছে অনেক। গ্রামে গ্রামে এইকাজে যারা জড়িত তাদের কয়েক-জনের সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা হল নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিয়ে। তাঁরা মতামত জানালেন খোলাখুলিভাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা আগামীদিনের কর্ম-সূচী রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য করবে। মেদিনীপুরের কেশবপুরের বয়স্ক শিক্ষার সংগঠক রঘুনাথ গাণ্ডা বললেন—এই গ্রামে আড়াই হাজার মানুষের মধ্যে শিশুদের বাদে আমি জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। তাদের নিয়ে কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। এই কাজে প্রথমে লোকেরা আসতে চায়না। বলে, পেটে ভাত নেই, খেতে পাইনে, এই বয়সে আর লেখাপড়া শিখে কি হবে? তখন তাদের বোঝান হয়—দশ টাকা ধার দিয়ে মহাজনরা একশ টাকা লিখিয়ে নিতে পারে। সুতরাং পড়া ও লেখা নিজেদের স্বার্থেই জানা চাই।

প্রশ্ন—গ্রামের লোকদের আর কিছু বলে উৎসাহিত করেছেন?

উত্তর—হ্যাঁ। যেমন বলেছি—চাষবাসে নতুন নতুন বীজ, নতুন জাতের ফসল, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান কত কি আমদানি হচ্ছে। আপনারা যদি লেখাপড়া না জানেন তাহলে সেইসব খবর পাবেন কেমন করে? আপনি ভাল পাঁজরেও বোঝে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই লেখাপড়ায় এগিয়ে আসুন। এরপর অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন। কেন্দ্রে এসেছেন নিয়মিত। কাজ চালাবার গোছের বিদ্যাটা করেছেন আয়ত্ত।

রঘুনাথ গাণ্ডা—বয়স্ক শিক্ষার সংগঠক

রঘুনাথ বাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম—সাক্ষরতা অভিযান সফল করার জন্য কি কেবল বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেই উদ্দেশ্য সফল হবে?

—না কেবল সাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেই লাভ পৌঁছানো যাবেনা। এইজন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ এবং মানসিকতা। লোকে যাতে লেখাপড়া শেখার জন্য আগ্রহী হয় এবং স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে সেজন্য প্রয়োজন প্রবল জনমত সৃষ্টি।

প্রশ্ন—এজন্য কি কি করণীয়?

উত্তর—দেশে একটা নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষক, শিক্ষিকারা, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন—বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাওয়া পরা বাসস্থানের একান্ত প্রয়োজন, ঠিক তেমনিই প্রয়োজন লেখাপড়া শেখাও। নতুবা জীবনটাই নিরর্থক। কারণ জীবনের অজানা অনেক বিষয়ই যেমন এর ফলে অন্ধকারে থেকে যাবে তেমনি পদে পদে বঞ্চিত ও প্রতারিত হওয়ারও আশঙ্কা।

প্রশ্ন—আচ্ছা, সাক্ষরতার কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোনও বাধা পেয়েছেন আপনারা?

উত্তর—তা পেয়েছি। গ্রামের কিছু মোড়ল মাতব্বর আর কায়েমী স্বার্থের লোক যাঁরা অজ্ঞ-নিরক্ষর মানুষের উপর ছড়ি ঘোরায় তাঁরা সাক্ষরতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ্যে, কখনওবা কানাঘুষা প্রচার চালিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যারা গ্রামে এসে এইসব কাজ করছে তাদের ভিতরে ভিতরে অন্য কোনও মতলব আছে। নইলে ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবে কেন?

বিরোধিতার কথা যেমন জিজ্ঞাসা করি তেমনি আবার জানতে চাই এব্যাপারে আগ্রহ ও উৎসাহের কথাও। রঘুনাথ বাবু বললেন—লেখাপড়া জানার জন্য অনেকের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহও লক্ষ্য করেছি। যেমন মুরশিদাবাদের নসরতগ্রামে একজন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক মুসলিম রেশম শিল্পী কেবল নিজে লেখাপড়া শিখতে আসেননি। নিজের আঠার ও পনের বছরের দুই ছেলেরও হাত ধরে সেখানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। আর একটা ঘটনা বলি। মেদিনীপুরের শিলো গ্রামে একটি কেন্দ্র কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। সেখানকার একজন বয়স্ক পড়ুয়া আরও পড়াশুনোর জন্য পাগল হয়ে যায়। তিনি শিক্ষিত এক ব্যক্তিকে ধরে বলেন—কর্তাবাবু, আমাকে পুরো লেখা-পড়া শিখিয়ে দাও। যতপার তোমাকে মুরগি খাওয়াব।

এই সাক্ষরতা নিয়েই কথা হচ্ছিল নারী শিক্ষার প্রচারিকা উত্তর চব্বিশ পরগণার সুদীপ্তা মুখার্জির সঙ্গে। তিনি বললেন—গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারলে শিক্ষার কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। সুতরাং মায়েদের সাক্ষর করাই প্রথম কর্তব্য।

প্রশ্ন—এ ব্যাপারে কীভাবে এগোনো যায়?

উত্তর—মায়েদের বোঝাতে হবে, ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের কাছেই মানুষ হয়। তাই মায়েরা যদি লেখাপড়া শেখেন তাহলে নিজের সন্তানদের মানুষ করা সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—আর কোনও মানবিক আবেদন রাখেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মেয়েরা লেখাপড়া জানলে সুখ-দুঃখের কথা বাপের বাড়ি চিঠি লিখে জানাতে পারেন। আত্মীয় স্বজনের অসুখ-বিসুখের খবর, জরুরি বার্তাও প্রয়োজনে পাঠানো যায়। আর আপনজনকে জানানো যায় মনের গোপন কথা। দূর প্রবাসী স্বামীর চিঠি এলে অন্যের কাছে পড়াতে নিয়ে যেতে হয়না। মনের মতন জবাবও নিজে নিজে লিখে পাঠানো যায়।

প্রশ্ন—আর আমাদের কোনও বক্তব্য রাখেন?

উত্তর—হ্যাঁ, তাও রাখি। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ, 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' এই বক্তব্যের মর্মার্থও বোঝাতে গেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা একান্ত দরকার।

সুদীপ্তা দেবীর কাছে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে জানতে চাই—মহিলাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য কোনও ভারতীয় আদর্শ কি তুলে ধরেন?

—অবশ্যই। জোরের সঙ্গে জবাব দেন তিনি। তারপর বিষয়টা বিশ্লেষণ করার জন্য বলেন—লেখাপড়াটা কেবল পুরুষেরই দরকার অনেক মহিলার এই ভুল বিশ্বাস। আজকালকার মেয়েরা মেয়েসাহেবদের অনুকরণে কেবল লেখাপড়া শিখে বসে থাকে। তাদের সেই ধারণা ভাঙার জন্য বোঝাতে হয়,

সুদীপ্তা মুখার্জী—নারীশিক্ষার প্রচারিকা

লেখাপড়া শেখা, জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাচর্চা করা প্রাচীন ভারতীয় নারীদেরই আদর্শ। তখন উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরি গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী মহিলাদের কথা।

এতে কাজ হয়?

হ্যাঁ, হয়। অনেকে আর এই নিয়ে তর্ক করেন না। বরঞ্চ মহিলাদের শিক্ষাশিবিরে পুকুর ঘাটের ঝগড়া বা দুপুরের মহিলা জমায়েতে মেয়েদের বিরুদ্ধে ছেলের সুর চড়লে যায় পালটা 'কথায় আর যুক্তিতে।

প্রশ্ন—মহিলাদের পক্ষে জরুরি কোনও বক্তব্য তুলে ধরেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কারণ, সমাজে বহু মহিলা লাঞ্ছিত, নিগৃহীত বা বঞ্চিত হন। তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্যই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দরকার। মেয়েদের আজকাল সম্পত্তিতে অধিকার হয়েছে, সামাজিক অধিকারেও সমান অংশ। কিন্তু তা না জানায় সেই অধিকার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হন। আর অর্থনৈতিক-ভাবে স্বাবলম্বী না হলে মেয়েরা কেমন করে স্বাধিকার অর্জন করবে? তাছাড়া অনেক মহিলার স্বামী মারা গেলে সেই কর্মস্থলে চাকরি হয়, কিন্তু স্ত্রী যদি লেখাপড়া না জানেন তাহলে তিপসই দিয়ে কোনও ভাল চাকরি পাওয়া যায় কি?

এবার আসি একটা হৃদয়বৃত্তির প্রশ্নে। মন দেওয়া-নেওয়া কথায়। জানতে চাই, লেখাপড়া শেখায় কি ভালবাসার বেশি বিকাশ হয়? একটু হেসে জবাব দেন সুদীপ্তা—দেখুন, ভালবাসা চিরন্তন। পরিবেশ তাওঘর থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত এর অবাধ বিচরণ। একটি নিরক্ষর মেয়েও একজন নিরক্ষর পুরুষকে ভালবাসতে পারে। লেখাপড়া এতে বাধা নয়। তবে, এই সুকুমার অনুভূতির প্রকাশ হয়ত ভিন্ন হয়। লেখাপড়া জানা পরিশীলিত মনের প্রকাশ হয় পরিশীলিত পথেই। নিরক্ষরেরও ভাষা আছে। সে চোখের ভাষা, ঠোঁটের ভাষা। আর যারা সরস্বতীর সাধনা করেছেন তাদের আরও একটা ভাষা আছে, সে হচ্ছে লেখনীর ভাষা। তারা অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা বাক্যের মালা পরিয়ে দেয় প্রিয়জনের গলায়।

শিক্ষার লেখার আর রেখার ভালবাসা যে কত কাছাকাছি, তাতার মত কত জড়াজড়ি করে পরস্পরকে আপনে রাখতে চায় তারই সদ্য সাক্ষরিত সাক্ষ্য দেখা গিয়েছে ঘোজাতাও গ্রামে। বাংলা-দেশের লাগোয়া চব্বিশ পরগণার সেই গ্রাম—যেখানে সবাই সাক্ষর। আম-জাম-নারকেল-সুপারি গাছের ছায়াঘেরা সেই পল্লীতে ঘরের মাটির দেওয়ালে সাদা চুণ দেখা যুক্তি নাম। মইরম আর রহিম। যেন লায়লা আর মজনু। চিরকালের ভালবাসা এই গাঁয়ে গরিবের মাটির তাজমহল রচনা করেছে। মইরম বিবি আর রহিম আলি। বিয়ের পর দুজনে লেখাপড়া শিখেছে। তারই স্মরণ-চিহ্ন

মনুষ্যত্ব প্রদিকে এগিয়ে এসেছে। আগামী ই. বি. আসনগুলির বয়স্ক ছাত্রীদের ক্লেকপত্রও প্রদত্ত হচ্ছে

শিক্ষানো দেওয়ালে। কেউ কাউকে ছাড়াছাড়ি করেনি। পাশাপাশি দৃষ্টি নাম।

শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে জ্ঞানবাসাই যে কেবল এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে তাই নয়, এখানে বিকলাঙ্গও এগিয়ে গিয়েছে পায়ে পায়ে। মূক হয়েছে মুখর, দৃষ্টিহীন পেয়েছে শিক্ষার আলো। যে হাতে দিনে লাঙল ধরে চাষী, সন্ধ্যায় সেই হাতে ধরে কলম। যোজাতাওয়ার তান হাত কাটা ঠাকুরদাস রায় যেমন বাঁ হাতে লেখায় ওস্তাদ হয়েছেন তেমনি চোখে ছানি পড়া পাগলীদাসীও নিজের নাম লেখায় পাকাপোক্ত। আবার তাদচামী ঘটোন রায় সন্ধ্যার পাঠ নিয়ে এখন টিপসইকে বিদায় দিতে বাধ্য করেছেন। আর বোবা সুরবনীকে কেউ কিছু বললেই শ্লেটে লিখে জানায়—'বসুন'। এই যোজাতাওয়ার নিরক্ষরতার পাপ বিদায় হওয়ায় ১৯৭৩ সালে গ্রানটি কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার পায়। এর উদ্যোক্তারা বলছিলেন: বহু কষ্ট, ত্যাগ আর তিতিক্ষার পর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে সংগঠক ও প্রচারিকাদের এই অভিজ্ঞতা ও কর্ম-প্রণালী আগামী দিনের কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়ক হবে। জাতীয় বয়স্ক শিক্ষার যে কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন তার মূল লক্ষ্য হল, দেশের মানুষের নিজস্ব পরিবেশে আত্ম-উন্নয়নে তাঁরা যাতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন এবং আত্মবিশ্বাসে নিজেরা পরিচালিত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে অতীত দিনের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করা হবে। প্রয়োজনে বয়স্ক শিক্ষার পদ্ধতির প্রয়োজনীয় রদবদল করা হতে পারে এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরিরও ব্যবস্থা করা হবে। এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সুপারিশ ও মতামত কার্যকর করার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এই শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষা ও জনানা অতীত ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রাকৃতিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করার দিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। এই কর্মসূচীতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংঘ-সমিতিকে সক্রিয়-ভাবে যুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্যও সেই দিকে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসূচী সফল করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে, পল্লী এলাকার যে-সব কর্মী কাজ করেন তাদের সঙ্গে বার বার বৈঠকে বসা, শিবির করা। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাদের যথার্থভাবে কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্ম করা। বিশেষ ভাবে গ্রামের শিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক, উচ্চ-শিক্ষারত ছাত্র, গ্রামীণ তরুণ-তরুণী বেকার যুবক ও আধা বেকারদের এই ব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রণী ও অংশীদার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের এন, এস এস কর্মীদেরও এর সঙ্গে পুরোদমে যুক্ত করার কথা হচ্ছে।

ব্রত পালনে পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। এখানেও এব্যাপারে নানান প্রকল্প ও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এরাজ্যের লোকসংখ্যা এখন পাঁচ কোটি ছাড়িয়েছে বলে অনুমান। এরমধ্যে শিশুদের এবং প্রবীণদের বাদ দিলে পনের থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের নিরক্ষর লোক কত হতে পারে? শিক্ষা দফতরের মতে ছিয়াত্তর লাখ। পাঁচ বছরে তাদের সাক্ষর করা হবে। কি হবে এজন্য? শিক্ষা দফতরের মতে প্রতি থানাকে, প্রতি গ্রামে হবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। পুরুষদের জন্য রাত্রে। মহিলাদের বিকালে। বেকার যুবক, আংশিক সময়ের শিক্ষক ও অন্যান্য উৎসাহী মানুষদের এজন্য কাজে লাগানো হবে। পড়ুয়াদের দেওয়া হবে শ্লেট, বই, পেন্সিল, ব্ল্যাকবোর্ড, হ্যারি-কেন। কেরোসিনও সরবরাহের ব্যবস্থা হবে। নাটমন্দির, ক্লাব-সমিতির অফিস, ঘরের দাওয়া, বাড়ির বারান্দা, ছাত্রা সুনিবিড় গাছতলা, মাষ্টার ঘরের আঙিনা হবে পড়ুয়াদের পাঠশালা।

সারা দেশ জুড়ে গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে শিক্ষার অলো জ্বালার যে সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত হলে সত্যিই দেশে নবযুগের সূচনা হবে। কিন্তু কর্মসূচী যদি কেবল ফাইলবন্দী আর খবরের কাগজে প্রচার ও বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে দেখা দেবে দেশব্যাপী নিরক্ষরতার নিশা।

Ambassador *Mark 3* Altogether a lot better

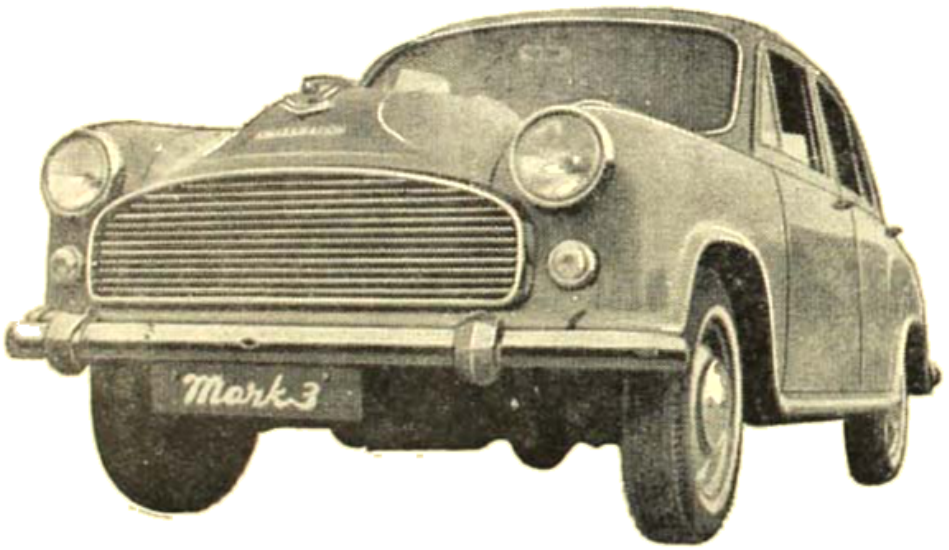

- Better Performance
- More Space Comfort
- Better Road Grip & Clearance
- Greater Sturdiness
- Easier Maintenance

For details please contact your nearest Mark 3 dealer or write to us

HM

AMBASSADOR *Mark 3*

Hindustan Motors Limited
Calcutta 700001

CC-HT-371

গ্রামীণ মনোরঞ্জনের বারো মাস

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

গতবছর বৈশাখের প্রথম দিনে শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সকালবেলা শিল্পী রামকিংকরের বাড়ি গিয়ে দেখলাম শিল্পীর বাড়ির সামনে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। শিল্পী এসে গাড়িতে বসলেন। বললেন—যাবে নাকি কঙ্কালীতলার মেলায়। সকাল থেকেই দারুণ ধুম সেখানে। কাতারে কাতারে পাঁঠা বলি হবে সেখানে। একেবারে রক্ত গঙ্গা বয়ে যাবার মত ব্যাপার। সেখানে লোকজন যেন নিষ্ঠিল করে চলেছে সেখানে। অধিকাংশই আদিবাসী। পূজো, পাঁঠা বলি, হৈ হৈ, নাগরদোলা, সার্কাস, নাচগান, দিনভর হরিনাম কীর্তন। সারাদিন অসংখ্য হাজারে হাজারে ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষের সমাবেশ।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সারা বৈশাখ মাস ধরেই চড়কের মেলা, গাজন, নীলপূজা। গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হর পার্বতী সেজে নাচ গান। ভীড় সেখানেও। মেলা গ্রামের সংস্কৃতির আখড়া। চৈত্র মাস মেলার মাস। সস্তায় সস্তা মাটির হাড়িকুড়ি, কাঠের বারকোশ, বাঁশের ঝুড়ি, মেয়েদের চুড়ি, চাঁদির গয়না, বাঁশের বাঁশি—আরো কত কি? রাতে অনিবার্যভাবে সস্তা টিকিটে যাত্রা উৎসব। সেখানেও গ্রামের ঠেক ভেঙে পড়ছে। যাত্রার জমায়েত এখন গ্রামে গ্রামে।

স্কুল, কলেজ, ক্লাব, হাসপাতাল এখন প্রায় গ্রামে অধিকাংশ জায়গায় চোখে পড়ে। আর এইসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এতে সামিল হয় গ্রামের সংস্কৃতি-বান মানুষজন। ছেলেমেয়ে ছাত্রছাত্রীর সব অংশ নেয় এসব অনুষ্ঠানে। তবে এসব অনুষ্ঠানের অধিকাংশই রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী বিষয়ক। কলমও বা পাড়ার ছেলেরা বছর কয়েক মহড়া দিয়ে চাঁদা তুলে পাড়ার ক্লাব তৈরি করে রামের সুমতি, ডাকঘর বা ডাকাতে চাই।

অন্যদিকে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এমনকি গ্রামের গৃহস্থ বধূরা গ্রামের একমাত্র সিনেমা হলে সস্তা টিকিটের বিনিময়ে দেখতে চলেছেন বাবা তারকনাথ বা মহাতীর্থ কালীঘাট বা জয় সন্তোষী মা। পলাতক বা বালিকা বধূর টিকিট সেখানে হট কেকের মত বিক্রি হয়। হাউস ফুল অবশ্য।

একটু পিছন ফিরলে দেখবো গ্রামীণ সংস্কৃতির ও বিনোদনের প্রথম ইটখানি অর্থাৎ ভিত্তিমূলটুকু গড়ে উঠেছিল জমিদার বড়লোকদের মেয়েদের ওপর। তাদের মনোরঞ্জনে তারা আজ অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু একেবারে গ্রামের আয়োজন আছে, আনন্দ উৎসব, পূজা আচার আয়োজন করে তারা গ্রামীণ মানুষকে সহজেই সামিল করেছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজায় অন্নকূটা পাঁঠা বলি হত, কোথাও ছিল মেষ বলির সমারোহ। এতদ ছিল স্থায়ী আইটেম। বা বড় পূজা মণ্ডপ ঘরে প্রতিমা আনত গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে পাওয়া যাবে। গ্রামীণ আমোদ-আহ্লাদের মূল সুরটি ধরা ছিল এইসব মণ্ডপ ঘিরে। সেখানে হোকার উপলক্ষেই গান, বাজনা, কীর্তন, ভজন, যাত্রা, থিয়েটার হত আজ ও চিত্রটার পরিবর্তন ঘটেছে।

সেদিন থিয়েটারের দাওড়া-ছাপনী ও মেদিনীপুর জেলার সীমান্তগ্রামে। সেটি ভক্তপক্ষে একটি ঘটনা। এক কথায় আজ পাড়া যা। সোনা যেন প্রায় আড়াই-শো বছর আগে গ্রামটির পত্তন হয়েছিল। সেদিনের জমিদার চৌধুরীদের আজ আর তেমন জমিজমা নেই যে নিয়ে তেমন ভাবনাও নেই। তাঁদের এখন তাঁরা শিক্ষিত। দাওড়ায় বড় লোহার কারখানা। পরিবারের অধিকাংশই থাকেন সেখানে শহরে সেদিনের তাঁদের পরিবার আজ ইতিহাস হয়েছে। তবু বার্ষিক বৈঠকী অনুষ্ঠানের কালীপূজায় সবাই সমবেত হয়েছেন গ্রামে। বারোয়ারী আইটেমগুলি প্রায় সবাই তাঁদেরও হয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ চৌধুরী মশাই বলছেন—আনন্দ স্ফূর্তির সবরকম আয়োজনই আছে যেমন পূজাতেও মেলা বসেছে, বাড়ি ভরতি আত্মীয়স্বজন, সাইকে ছিপী গান বাজনে পূজার পর ঘুমিয়ে ধরে চলবে যাত্রার পালাগান। সব আসবে কলকাতা থেকে। সবই ঠিক তবুও যেন কোথায় কিসের অভাব। ছিল বছর প্রাগের সেই আয়োজন আহ্লাদ আন্তরিকতায় কোথায় যেন ভাঁটা পড়েছে।

বর্তমান গ্রামে শিল্পী আছেন।

কিন্তু তাঁদের চোখ পদ্মের প্রচার মঞ্চের দিকে মুখ ঘোরানো। মন্তার্ন বাউল কীর্তনীয়া বাউলের মেলায় মাইকে গান গাইতে গাইতে আনমনা হয়ে রেডিওর ট্রেপ রেকর্ডারের বাক্সের দিকে চোখ ঘোরান। যাদব তাঁদের যতটা আছে আন্তরিকতা ততটা নেই।

সেজন্য ভাত বাউলের ভাত নেই। যে চাষ ও মিঠার ওপর বাউলের আদর্শ ও ধর্ম গড়িয়ে তা আজ প্রায় বিরল হতে চলেছে। কেন? অথচ নানা প্রচার মাধ্যম ও মেলা ইত্যাদির সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাউল সংগীতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। তার প্রমাণও অন্তহীন। শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা, মকর সংক্রান্তিতে জয়দেব কেন্দুলীতে বাউলের মেলা ও বৈরাগীতলার মেলায় বাংলার বিশেষ করে গ্রামের মানুষ বাউল সংগীতকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। 'খাউল বাউল করিস তোরা বাংলার বাউল মরেছে' বা 'ঘরের কারবারী,/তার কারবারেতে ভয় কি আছে। সে যে পঞ্চরসের দোকান খুইলা/বদানন্দে বইসা আছে।' বাউল গানের এই তাত্ত্বিক সারবত্তা সুর রস ধারার মধ্য দিয়ে সরনিয়া ভক্ত শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। এখানে বলে রাখি সারা পশ্চিমবাংলায় বাউল সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সংখ্যায় এরা বেশি আছেন নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায়। এসব জেলায় আমোদ গ্রামোদে বিস্তরেও এঁদের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী।

গ্রামে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিতে যেখানে পূর্ববঙ্গের লোকজন বেশী বসবাস করেন সেখানে সারা আষাঢ় মাস ধরে বাড়ির মেয়েরা মনসাদেবীর পূজার সঙ্গে মনসামঙ্গল সুর করে পড়েন। বর্ষা-কালে বাড়ির মেয়ে বউদের বিনোদনের একটা খুব ভাল দিক। আষাঢ় সংক্রান্তিতে আনুষ্ঠানিক পূজা ও গান দিয়ে এর শেষ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, প্রতি-বাড়িতে মনসা ভাসান গান না হলেও সেই গ্রামের প্রতিবেশী মহিলা বন্ধুরা নিমিত্তেই এতে যোগদান করেন। আগে যে রয়ানী গানের দল গ্রামে গ্রামে মনসার গান নেচে অভিনয় করে গাইতেন তা আজ বিলুপ্তির পথে। তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এ সময় গ্রামের মানুষ মেতে ওঠেন বিষহরি পালাগানে।

রামায়ণ গান বা রাম সীতার কাহিনী সুর করে পড়ে শোনানো গ্রামে এখনও চলে। গত বছর শীতকালে নদীয়ার এক পল্লীতে সন্ধ্যাবেলায় হাজির হয়ে দেখলাম দিকি ভীড় জমেছে। সেখানে সেদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা হচ্ছিল। আসরের মাঝখানে রামায়ণ গানের দল খোল, করতাল, হারমোনিয়াম নিয়ে। প্রায় যাত্রার ঢঙে সংলাপ ও সুর করে পালাগান হচ্ছিল। সে গ্রামে হ্যাজাকের আলোকে দেখছিলাম আসপাশের দুচার গ্রামের দু'হাজার পাঁচেক লোক সেখানে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রামায়ণ গান শুনছেন। অবশ্য কথা হল, যাত্রা ও সিনেমার গ্রামে অনুপ্রবেশের ফলে রামায়ণ গানের দলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কৃষ্ণযাত্রারও সেই অবস্থা।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার একাংশে ভাদু গানের প্রচলন খুব বেশি। ওইসব জেলায় বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে সারা ভাদ্র মাস ধরে চলে ভাদুর গান। ভাদু তাঁদের ঘরের লক্ষ্মী। কাজেই মনসাভাসানের মতই মেয়েরা অধিকাংশে ক্ষেত্রে ভাদু গান গায়। ছেলেরা গান বাঁধে। যেমন—'ভাদু আইল রে ধান দাও, পান দাও বইসতে দাও পিঁড়া,' বা 'ঘরের লক্ষ্মী ভাদু তুমি থাকো আমার ঘরে'—এধরণের অসংখ্য গান মেয়েরা সুর করে গায় ভাদ্র মাসে। তারপর একদিন ঘটা করে পূজা হয়। এইভাবে ঝুমুর পুরুলিয়ার এক গ্রামের উৎসব। ভাদু, ঝুমু ছাড়াও এ জেলার আর একটি সংস্কৃতির দিক ছো নাচ। ছো নাচের বৈশিষ্ট্য নানাপ্রকার দেব-দেবী, দৈত্য দানব, পশুর মুখোস পরে শিল্পীরা প্রায় যাত্রার ঢঙে অভিনয় করে।

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই আর আছে নানা ব্রতকথা। লক্ষ্মী ও বিপত্তারিণীর ব্রতকথা, শনির পাঁচালী ও পূজা গ্রামে বিনোদনের আর একটি দিক। কার্তিক পূজা ও চণ্ডীর ব্রত তো আছেই। সন্তোষীমার ব্রত, সাঁই বাবার কীর্তন অতি সাম্প্রতিক সংযোজন। এখনও প্রচুর গ্রামে যেমন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনায় হরির লুঠ, হিনায়-ঠাকুরের পূজা ও কীর্তনের প্রচলন আছে।

গ্রামে বিনোদনের অধিকাংশে স্থান জুড়ে আছে মেলা, প্রদর্শনী, যাত্রা, সিনেমা, সারকাস, পুতুল নাচ, তর্জাগান ইত্যাদি। জলসা বা বিখ্যাত গাইয়েদের দিয়ে গানের আসরও জমায় গ্রামে আজকাল। এবং জোরের ভিড়ও সেখানে উপচে পড়ছে। বাংলা ও হিন্দী দুরকম সিনেমাই গ্রামে সমাদৃত, তবে যাত্রা ইদানীং যেভাবে গ্রামে জয়যাত্রা চালিয়েছে তাতে সিনেমার গ্ল্যামার যে শীঘ্রই ম্লান হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

একটু জলের জন্য

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ে পড়েছিলাম "জলের আর এক নাম জীবন"। সে সময় 'জীবন' শব্দটার শুধুমাত্র একটা শাব্দিক অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। দিন এগোনোর সঙ্গে বুঝেছি জল একটা দেশের অস্তিত্ব ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু দেশ, অর্থনীতি এ সবইতো পরের কথা। তার অনেক আগের আপার আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকা, অর্থাৎ প্রাণধারণ করা। এই প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন পানীয় জল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই গত তিন বছরে জলের ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করার পরেও এখনো প্রতিবছর গরমে অভিশাপ নেমে আসে। এখনও একটু জলের জন্য গ্রামে এমনকি শহরেও হাহাকার ওঠে।

কাজের কাজে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার গ্রামেই ঘুরতে হয়। পানীয় জল এখনও যে কত মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তা নজরে পড়ে প্রায়ই। ১৯৭৭-এ চৈত্রের শেষাশেষি কোন একটা কাজে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে গিয়েছিলাম। দুপুরে একটা বাড়ির লোহার বারান্দায় বসে আছি। সামনেই বি. ডি.ও অফিস। হঠাৎ নজর পড়লো বি. ডি.ও অফিসের প্রাঙ্গণের দিকে। একটা বছর তের বয়সের মেয়ে এক বিরাট জল ভর্তি কলসী কিছুতেই কাঁধে তুলতে পারছেনা। বি. ডি.ও অফিসের প্রাঙ্গণে একটা কুয়ো ছিল। মেয়েটি জল সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওর নাম সাবিত্রী। ও এসেছে প্রায় মাইল দুয়েক দূরের একটা গ্রাম থেকে। বললাম—তোমাদের গ্রামে কল নেই? ও ঘাড় নাড়ল—আছে তবে এক বছরের ওপর খারাপ। বললাম—তুমি স্কুলে পড়না? ও আবার ঘাড় নাড়ল। বলল—সিক্সে পড়ে, কিন্তু জলের জন্য স্কুলে যেতে পারেনা।

গত মে মাসে ঝোদ পুরুলিয়া শহরেই দেখেছি একটা টিউবওয়েলের সামনে কলসীর একদল মহিলা ও কলসীর মেলা। উত্তরবঙ্গের মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং-এর কিছু কিছু গ্রামে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি কোথাও কোথাও পানীয় জলের অভাব এখনও তুঙ্গে। রাজ্য জল দূষিতকরণ নিবারণ পর্ষদ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন, প্রাকৃতজলের উৎসগুলিকে নিয়মিত করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু পানীয় জলের অভাব যেখানে এত প্রকট, সেখানে মানুষকে দৈনন্দিন জলের ব্যবস্থা করার জন্য মাইল মাইল পথ ছুটতে হয়, সেখানে জল নিয়ে বাস্তবিচারের সুযোগ কোথায়? মানুষ বাধ্য হয় এখানে যে কোন রকম জল ব্যবহার করতে। অধিকাংশ গ্রামেই মানুষ স্নান, কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদির জন্য পুকুর, ডোবা বা খাল বিলের জল ব্যবহার করে। স্নান করার সময় এই ময়লা দূষিত জল খুব স্বাভাবিকভাবেই পাকস্থলিতে প্রবেশ করে। তাছাড়া একই পানাধরা পুকুরের জল কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু জল যেখানে মানুষের বাইরে সেখানে পরিস্রুত জল ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতান্তই হাস্যকর। এখনও পর্যন্ত এমন বহু গ্রাম রয়েছে যেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই নেই।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। বিভিন্ন জেলার জেলা পরিষদের কর্মী প্রার্থীদের সঙ্গে গ্রাম্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা যে সব কাজের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে পানীয় জলের কথা। একজন তো বলেছেন, স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরে আজ পানীয় জলের কথা একটু অবাক লাগলেও আমরা করতে পারিনি—এর থেকে লজ্জার আর কি থাকতে পারে। পঞ্চায়েতের কর্মী প্রার্থীরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেছেন, পানীয় জলের অভাব এখনও গ্রাম অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। মিশ্র শহর ছোঁয়া গ্রামগুলোতে এ সমস্যা নিঃসন্দেহে কিছুটা কম। কিন্তু তত প্রান? যেখানে যাতায়াতের পথ এখনও দুর্গম? যেখানে বছরের পর বছর কোনও সরকারী কলীর দেখা পাওয়া যায় না? সেখানকার মানুষের কাছে তাপাই এখনও একমাত্র সান্ত্বনা। দার্জিলিং জেলার এক গ্রামে ঢুকতে হলে ছোট্ট নদী পার হতে হয়। সে সব গ্রামে সরকারী কর্মচারী নেই। এমন হাজারো গ্রামের নাম করা যেতে পারে যে সব গ্রামে একটাও টিউবওয়েল চালু নেই।

এই সব চিত্র দেখে মনে হতে পারে তাহলে কি গত তিন বছরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন কর্মসূচী ছিলনা? পানীয় জলের জন্য গত তিন বছরে সরকার কি কোন কাজই করেন নি? নিঃসন্দেহে তার উত্তর হবে, অবশ্যই ছিল, কাজও হয়েছে। তাহলে

এই ব্যর্থতা কেন? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর—যাত্রায় কলমে কাজ আর বাস্তব রূপায়ণে অনেক তফাৎ। পানীয় জলের জন্য বিস্তর টাকার সংস্থান হয়েছে। কিন্তু সে টাকার যথাযোগ্য সুষ্ঠু ব্যবহার হয়েছে সর্বত্র এমন কথা বলা যাবেনা। যে কোন পরিকল্পনার সার্থকতাই নির্ভর করে সততার ওপর।

পরিকল্পনার ব্যর্থতার আরও একটি কারণ গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাব। গ্রামের টিউবওয়েলটিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রামের মানুষকেই নিতে হবে। এটিকে যাতে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তার প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে গ্রামের মানুষকেই। সম্প্রতি ২৪ পরগণার মালঞ্চ নামে এক গ্রামে দুপুরে এক টিউবওয়েলে জল তুলতে গিয়ে দেখেছি কলের হ্যাণ্ডেল নেই। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলেকে জলের কথা বলায় সে সামনের একটা বাড়ি থেকে একটি হ্যাণ্ডেল ও এক টুকরো লোহা নিয়ে এসেছে। ছেলেটিই এই ব্যবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করেছে। সে বলেছে হ্যাণ্ডেল বার বার চুরি হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের লোকেরা এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। সামনের বাড়িতেই হ্যাণ্ডেলটি রাখা থাকে, যার যখন প্রয়োজন তিনি তখন হ্যাণ্ডেলটি লাগিয়ে জল তোলেন। গ্রামের মানুষের সতর্ক নজর এক্ষেত্রে জলের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছে। গ্রামের যে কোন জিনিসই আমাদের নিজস্ব জিনিস এই চেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। গ্রামের টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেল চুরি করার জন্যে নিশ্চই তিন গাঁ থেকে চোর আসেনা। সরকারী জিনিস, অতএব চুরি হয় হোক এই ধারণা যতদিন না ঘুচবে ততদিন পানীয় জল কেন, কোন পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনা।

প্রতি বছরই ৫ পাঁচটা টিউবওয়েল প্রতি ব্লকেই বসছে। এইভাবে যদি গত তিন বছর ধরে টিউবওয়েল বসে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে জলের সমস্যার গুরুত্ব কমে আসা উচিত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল, সমস্যা বেড়েছে। নিঃসন্দেহে লোকসংখ্যা বেড়েছে এটা একটা অন্যতম কারণ। কিন্তু তাছাড়াও কারণ রয়েছে। যে কারণটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়েছে তা হল রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা। নতুন কল বসানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি অকেজো কল সারাবার ব্যবস্থা না হয় তাহলে পানীয় জলের সমস্যা কোনদিনই মিটতে পারেনা। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। হুগলী জেলার দুটি গ্রাম। একটি সিঙ্গুর, অপরটি ছোট সরষে। সিঙ্গুরে ব্লকের কোন গ্রামে অকেজো কল দেখিনি। পঞ্চায়েতের সদস্যরা নতুন কল বসানোর চেয়ে বেশী নজর দিয়েছিলেন পুরোনো কল সারানোর প্রতি। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখেছি

পাটচাষীদের সেবায় জুট করপোরেশন

দেশের পাটচাষীদের সুবিধার্থে জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন করা হয়েছে।

ন্যায্য দাম ও সঠিক যাচাইয়ের জন্য জুট করপোরেশনের নিকটতম ক্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ করুন।

দি জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা—৭০০০৭১

ছোট সরিষায়। সেখানে কলের অভাব নেই, কিন্তু সে সব কল জল দান করতে অক্ষম।

আরও টিউবওয়েল বসানো হোক, পানীয় জলের জন্যে গ্রামের মানুষের তালিকার দূর হোক এটা সকলেরই কাম্য। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অকেজো কলগুলোকে সারাবার ব্যবস্থা হয় তাহলে কাজ অনেক সহজ হয় না কি? নিশ্চয়ই একটা নতুন কলের পরিবর্তে অনেকগুলো অকেজো কল সারিয়ে তোলা যায়। তার ফলে অর্থনৈতিক চাপও কিছু কমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার বা সরকারী কর্মকর্তারা নতুন কল বসাতে যে পরিমাণ আগ্রহী, অকেজো কল সারাতে ততখানি নন। যদিও রাজ্য সরকার এবার জল সরবরাহের জন্যে দুটি কাজ হাতে নিয়েছেন। এক, নতুন কল বসানো। দুই, পুরোনো কল সারানো। রাজ্য সরকার গত বছরের মত এ বছরও ৩২৭টি ব্লকে ১০টি করে টিউবওয়েল বা কূপ খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চলতি বছরে প্রতি ব্লকে পাঁচটি করে টিউবওয়েল বা কূপ সংস্কার করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদি এই পরিকল্পনা মত কাজ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে গ্রামের মানুষের পানীয় জলের দুর্দশার অনেকটাই নিরসন হবে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর কেন্দ্রে যেদিন প্রথম গিয়েছিলেন, সেদিন এক বৃদ্ধা তাঁর হাত ধরে একটি টিউবওয়েলের অবেদন করেছিলেন। ওই বৃদ্ধাই যেন গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতীক।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ৫৪ হাজার ১২০ টি গ্রামের মাত্র ২০ হাজার ৪৫১-টিতে নিরাপদ জলের ব্যবস্থা রয়েছে। এই চিত্র থেকেই বোঝা যায় পানীয় জলের সমস্যা কত প্রকট। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্পের অধীনে গত বছর ১০০টি স্পট টিউব-ওয়েল ও ৫০টি পাইপের দ্বারা জল সরবরাহের পরিকল্প অনুমোদন করা হয়েছিল। এ বছর এই কর্মসূচী আরও বড় হয়েছে। যে সব জায়গায় টিউবওয়েলের দ্বারা জল সরবরাহ সম্ভব নয় এমন ৫১১টি গ্রামে গত বছর গ্রামীণ জল সরবরাহে প্রকল্প অনুযায়ী পাইপের দ্বারা জলসরবরাহ করার ৫৫ টি পরিকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। দার্জিলিং জেলার আটটি ব্লকে, যেখানে টিউবওয়েল বসান সম্ভব নয়, সেখানে পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে ১২০ টি পাইপের দ্বারা জল সরবরাহ পরিকল্পে কাজ চলছে।

বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে টিউবওয়েল বসানো বা কূপ খোঁড়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলগুলো। এসব জায়গায় নদীর জল অবশ্যই ব্যবহার করা যায়।

দৈনন্দিন জীবনে জল ব্যবহারের ওপর স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভরশীল। গ্রাম অঞ্চলে কৃষিকর্মে ব্যবহৃত সার ও রোগ পোকা মারার জন্যে যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশই পুকুর খাল বিলে গিয়ে মেশে। স্বভাবিক কারণেই এই সব জল ব্যবহার করলে স্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য। জল যে অধিকাংশ অসুখের কারণ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

নোনা জলের এলাকাতেও টিউব-ওয়েল ব্যবস্থা কার্যকরী নয়। সে সব জায়গায় গভীর নলকূপের প্রয়োজন। পাম্পের সাহায্যে গভীর নলকূপ থেকে জল সরবরাহ করা যায় এই জাতীয় অঞ্চলে।

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অন্তত প্রতি ৩০০ জনের জন্য একটা করে টিউবওয়েল বা কূপের ব্যবস্থা করবেন। নিঃসন্দেহে নেই মামার থেকে কানা মামা ভাল। কিন্তু একটি টিউব-ওয়েলের ওপর যদি ৩০০ মানুষ নির্ভর করেন, তাহলে ওই টিউবওয়েলটি ঘন ঘন খারাপ হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ সব ক্ষেত্রে আপাতত গুধুমাত্র

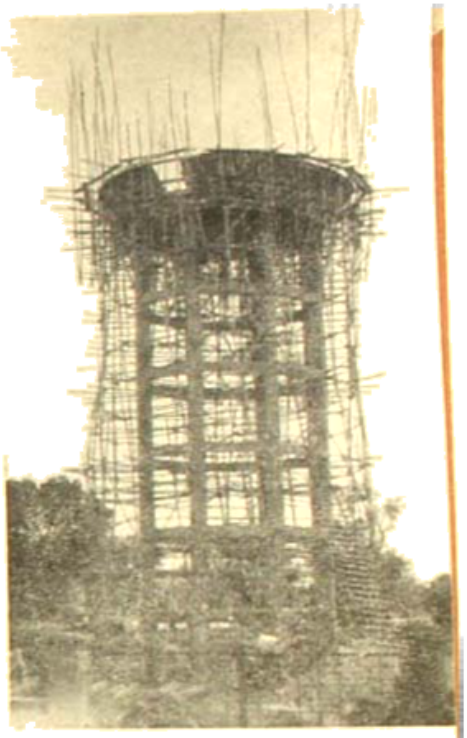

নদীয়া জেলার মেহেরপুরের গ্রামে একটি সিমেন্ট-মন্ডিত পানীয় জলের ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কের সরবরাহ-ক্ষমতা ৮০ হাজার গ্যালন

পানীয় জলটুকু যাতে ওই টিউবওয়েল থেকে সংগ্রহ করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে বলব, গ্রামে গ্রামে কতগুলি বিষয়ে সরকারী প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামের মানুষের কাছে এগুলো বার বার তুলে ধরা দরকার, গ্রামের টিউবওয়েল সেই গ্রামের মানুষের। তাই টিউবওয়েলটিকে রক্ষা করার ও ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব সেই গ্রামের মানুষের। জল পড়ে যাচ্ছে এমন ঘটনা বিরল নয়। অনেক পথচারী অজ্ঞান বদনে এই জল পড়ে যাওয়া দেখে যান। এই অপচয় বন্ধ করার জন্যে যথাযথ প্রচারের প্রয়োজন আছে। গ্রামের মানুষকে যদি তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা না যায় তাহলে প্রতি ব্লকে একাধিক টিউবওয়েল বসিয়েও কিছু হবেনা। পঞ্চায়েতের সদস্যরা যদি গ্রামের মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে গ্রামের মানুষের জন্যে প্রকৃত কাজ করা হবে।

THE SCALE OF YOUR PROFIT AND LOSS IN GENERAL PURPOSE WELDING

The Indarc range comprises [illegible] of general purpose electrodes [illegible] coated, some basic coated, others rutile coated or cellulose coated. Some with iron powder for higher metal recovery. Each of them offers you a specific advantage for a special weld application.

Ferrospeed • Vodex 6013 • Vortec
• Arcraft 6013 • Vardrian
• Pressureweld • Pipecraft 6010
• Pipecraft 7010 • Vortex 1
• Vortex 2 • Ferroweld 1
• Ferroweld 2 • Gravitex

Let IOL help you to select the right electrodes profitably.
Write to the nearest IOL Office

IOL

Indian Oxygen Limited

P-34 Taratala Road, Calcutta-700053

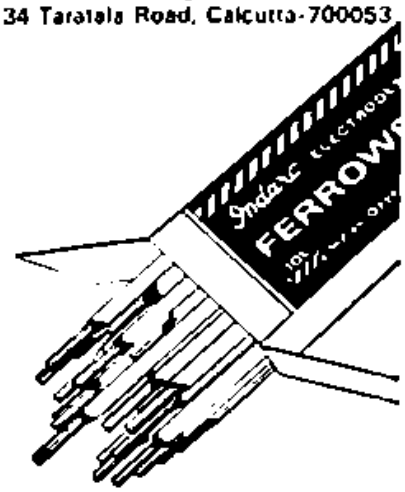

IOX/CAS-6/78

Indarc WELDING ELECTRODES

• Quality that pays you back—profitably

বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ ও মন

মলয় সিংহ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

১৯৭৫ সালে ৬ মার্চ, বুধবার। রাজ্য বিধানসভায় বাজেট বিতর্কের দ্বিতীয় দিন। আলোচনার মূল সুর ছিল গ্রাম বাংলার প্রতি প্রবঞ্চনার কথা।

সেদিন জ্যোতির্ময় মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, অর্থমন্ত্রী গ্রাম বাংলার বৈষ্ণিক ও সামাজিক দিকটি অনুভব করতে পারেননি। অর্থমন্ত্রী তার উত্তরে বলেছিলেন, এই বাজেটে ২৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত, তা ভূমিহীন চাষীদের দেওয়া হবে। কিন্তু তখন প্রশ্ন রেখেছিলেন জ্যোতির্ময়বাবু, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রায় ৬৮ লক্ষ। অর্থাৎ জন প্রতি ৫০ পয়সার নীচেও পাওয়া যাবে না। (অনেশবাজার পত্রিকা)। গ্রাম বাংলার সত্যিকারের চিত্রটি সেদিন ঐ বিতর্কে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল।

আমি ওপরের এই ঘটনাটি সংযোজন করলাম কেন? কারণ আর কিছুই নয় শুধু এইটুকু জানাতে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম জীবনের পরিণতি কোথায়, গ্রামের মানুষের মূল্যবান মুহূর্তগুলি কোন্ খাতে বইছে। কারা গ্রামজীবনের মানুষ? কীভাবে চলবে তাদের নবীনদের জীবনধারা?

পশ্চিমবঙ্গে ৩৮,০০০ মৌজা। ৫৩৫টি ব্লক। আর এই ব্লক অফিস গ্রামের অর্থনীতির চলার পথ ঠিক করে দেবেন। কিন্তু দিচ্ছেন কি? আমার অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন গ্রামের যে চিত্র তার কথা আমি এখানে তুলে ধরছি। বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখেছি অবোধ বালক সকলে দলে দলে পাল নিয়ে মাঠে গিয়েছে। গাছের ডালায় বিশ্রামরত পাখি আগে মনের আনন্দে বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করতো। কিন্তু এখন আর তেমনটি দেখি না। দেখি, একটি ট্রানজিসটর রেডিও ঘুরে সে মেজাজে হিন্দি গান শুনছে। এমন কি কোন চাষীও আর মেঠো সুরে বারোমাসী না গেয়ে আলের মাথায় রেডিওটি রেখে দিবা ধান রোওয়া করে চলেছেন। গানও শুনছেন, আবার সেই সঙ্গে আধুনিক প্রথায় চাষ করতে হলে বৈজ্ঞানিক কি প্রথা অবলম্বন করতে হবে তাও তিনি জেনে নিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধন করার সুযোগ, বিভিন্ন আধুনিক নয়া জাতের অধিক ফলনশীল ধানের খবরও পাচ্ছেন। প্রাদেশী মরশুমে তার নীতিকে পরিবর্তন করছেন।

মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে প্রায় ২০০ ঘর বসতি শুধু বিড়ি বাঁধার কাজই করেন। সেখানেও দেখেছি একই রূপ। রেডিও ঘুরিয়ে হিন্দি গানের চেহর-বহর। কারণ জিজ্ঞাসা করেছি তাঁদের, তাঁরা জানিয়েছেন, এতে বিড়ি বাঁধার উৎসাহ বাড়ে। কারণ? কারণ গানের তালে তালে বিড়ি বাঁধার হাত বেড়ে যায়। আমি বলেছি, আগে তো শুনেছি রাম-রাবণের কাহিনী পাঠ বা রামায়ণ গান করে সব কর্মীরা বিড়ি বাঁধতেন কিন্তু এখন এমন হলো কেন? কথা শেষ না হতে জঙ্গীপুরের হরিধন মণ্ডল বলে উঠলেন, দেখছেন না, এ যে তালের গান, এতে গতি আছে। সেই সঙ্গে আমাদের মনের সরদও সমান তালে নেচে ওঠে। আগে ঘণ্টায় ১,০০০ বিড়ি বাঁধতাম, এখন বাঁধি দেড় হাজার। তাহলেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি। আবার একটু ঘুর তাকালেই দেখা যাবে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় তখন পড়ার ধুম। ঘুম ভাঙতেই বৃদ্ধ দাদু নাতনীর মুখ খোলেন—১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়। বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়াছিল। এখন একটি গণ্ড গ্রামে যান, দেখবেন নিদেন পক্ষে ২টি প্রাথমিক স্কুল এবং তিন চারটি নৈশ বিদ্যালয়। দেখতে পাবেন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে স্কুল করছে। ওইরকম তিন থেকে পাঁচটি গ্রাম মিলে ১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে

গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য ফ্রী, হাফ ফ্রী-র ব্যবস্থা আছে। যেখানে আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগে তপশীলী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিলো। ১০০ জনের মধ্যে হয়তো কোনক্রমে একটি ছেলে বা মেয়ে উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পা রেখেছে। কিন্তু এখন আর ওটা কোন ব্যাপারের মধ্যেই পড়ে না। সকলেই হাত ধরাধরি করে বিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছে। এ দৃশ্য অহরহ। এমন কি আদিবাসী ছেলে-মেয়েরাও এখন আর পিছিয়ে নেই। শিক্ষাব্যবস্থা তাদের ক্রমশ মার্জিত করেছে। আবার অন্য চিত্রও দেখেছি- কোন কোন গ্রামে এখনও এমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন যাঁরা তপশীলি জাতির বা আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখতে চান। বীরভূমের চন্দনপুর, রায়পুর, সুপুর, এই সমস্ত স্থান তার নিদর্শন।

বাংলার গ্রামের মুখ বদলাচ্ছে। সেই সঙ্গে তার মনও। বাংলার দর্পণে এখন প্রতিবছরই নতুন নতুন ছবি। কেন গ্রামের মুখ বদলাচ্ছে? কেন গ্রামের মানুষের মন পালটাচ্ছে? কারণ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে অর্থনীতির অবনতি। আর সেই অবনতি (এখানে আমি বঞ্চনার কথাই বলবো) রোধ করার জন্যে গ্রামের মানুষ সচেতই তৎপর। আজ আর আত্মগোপন নেই। কুসংস্কারের রজ্জু তাদের বেঁধে রাখতে পারছে না। তাই পালটাচ্ছে মুখ ও মন। যে কোন একটি গণ্ডগ্রামে ঢুকুন, দেখবেন তার প্রবেশ পথে নিদেন পক্ষে একটি চায়ের দোকান। সেখানে আড্ডা দিচ্ছেন গ্রামের কিছু যুবা। রাজনীতি, অর্থ নৈতিক পরিবর্তন নিয়ে উদ্যম এই নিয়ে। হয়তো তাঁরা জানেন, তাঁরা সেটা ভাবছেন শহরের মানুষের সঙ্গে তাদের পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবেন না। তবু বলার এই যে উদ্যম, এই যে সচিন্তা, এটা কি প্রণিধানের নয়? ৩০ বছর আগের একটি গ্রামের চালচিত্র রাখুন। তার পাশে আজকের একটি গ্রামের হাল-হাঁড়ি রাখুন। দেখুন পরিবর্তনটা কোথায়।

বর্ধমান জেলার নারী গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখবেন একটি চায়ের দোকান। এমন কি এক বেলার পেট ভরানোর খাবার পাওয়ারও অসুবিধা হবে না। দোকানী সুনীল মুখার্জি। বিস্ময় প্রকাশ করলাম কেন? না, না এটা প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় নয়। বরঞ্চ আনন্দের, যে, একজন বি কম পাশ ব্রাহ্মণের ছেলে চাকরি না পেয়ে চায়ের দোকান করেছে। এটা তো নৈতিক পরিবর্তন বৈকি। তারই লাগোয়া ঢালুয়ার মাছির দোকান। সুনীল আর ঢালুয়ার মধ্যে হাসি ঠাট্টার অন্তরাও চলে। দুজনেই তো সেখানে জাতির কৌপীন পরেন না। বাপদড়ে একটি মিশন ১৯৪০ সালে অনুন্নত উপজাতি আদিবাসীদের শিক্ষা দীক্ষায় মার্জিত হতে শেখায়। ১৯৫৮ সালে ৩ বছর ঘনন-কার্য চলে যাপদড়ে। অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন মৌর্য যুগ থেকে পাল যুগের বিভিন্ন অলঙ্কার, হাতির দাঁতের বিভিন্ন কারুকার্য, মৃৎশিল্প আজ সেখানে সেই গ্রাম বাংলার মানুষের ঘরে রক্ষিত রয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষও আজ বোঝেন এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কত-খানি। প্রায় গ্রামেই আজকাল অভিযোগ আছে, আমাদের একটি লাইব্রেরী দরকার। অমুক বইটা নেই। তার জন্য তাঁরা কেউ কেউ সরাসরি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে চলে আসছেন। কিন্তু এ সুযোগটা তো আর সব গ্রামের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে রেল স্টেশনের কাছে আসতে আধদিনের ব্যাপার তাদের বেলায়? এগুলো তো ভাবতে হবে শহরের লোকদের। সুতরাং গ্রামের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সুনিশ্চিত করতে খানিকটা সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারী মহল তো বলতে পারবেন না যে গ্রামের মানুষের তাগিদ নেই। তাগিদ থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁরা না পান সেটা দুঃখের নয় কি?

ধর্মের বেলাতেও তাঁরা হালফিল। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার মাথাইপুর। সালার স্টেশন থেকে ৫ মাইল পথে ১৬ থেকে ১৭০০ লোকের বাস। তার মধ্যে মাত্র ২০০ জন হিন্দু। আজ পর্যন্ত তো কোন দিন শুনিনি আমাদের মধ্যে বিবাদ আছে। কেউ মামা, কেউ দিদি, কেউ বা দাদা এইরকমই তো দেখে আসছি হিন্দু-মুসলমানে। আমরা হিন্দু ঘরে খাই, তারা, খাই তারাও আসে বসে, সুখ দুঃখের গল্প করে, জিনিসের লেনদেন হলে নিয়ে যায়। ওপরের কথাগুলো বলছিলেন ৮০ বছরের বৃদ্ধ মাথাইপুরের সোমাই মিস্ত্রী। তিনি বলছেন, হিন্দু বাড়ির ছেলেরা আমাদের বড়োদের যথেষ্ট সম্মান দেন। তা আছে আমাদের ছেলে-মেয়েরাও তাদের সমবয়সীদের তারি ছক্কা করে। উটতে বসতে সুখে দুখে একই কলসির জল খাই।

ওই জেলাতেই হিজল-এর মাঠ। প্রান্তর আর প্রান্তর। দুটি নদী বেয়ে আর কুয়েশ বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। সেখানে কেবল চাষযোগ্য জমি। যা একদা কাঁদির রাজা সিংহদের ছিল। এবং এখনও হস্তগত আছে। প্রায় ১৬,০০০ একর জমি। আমি যখন ওখানে গিয়েছি দেখেছি বহরমপুরের তরুণ মহকুমা অফিসার উদয় ভাদুড়ী কিছু ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের নিয়ে ফারমিং কো-অপারেটিভ করতে চান। উৎসাহী মানুষ সাহায্য জুগিয়েছেন তাঁকে। গড়েও তুলেছিলেন ফারমিং কো-অপারেটিভ। প্রায় ১০০

থেকে ২০০ জন লোক চাষবাস করে দিন চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সব গ্রামের মানুষ জায়গাটির নামও দিয়েছেন উদয়-নগর, ওপাশে জয়তপুর থানা। এক বৃদ্ধ সেদিন বলেছিলেন, ভাই হে, শহর আর গ্রাম বলে কিছু নেই। আর নীতিও আলাদা নয়। আপনা নীতি আপনা কাছে। ওখানেই দেখেছি সুন্দরী মুরমুকে এইট ক্লাস পাশ। সে তো তার ধর্ম আর জাতির সোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি। গ্রামের ওকাকে ঘিরে করে সুখেই রয়েছে। ওরা বলে ও গাঁয়ের লক্ষ্মী। হিন্দুর কন্যা। গাঁয়ের লোকও তো এই অসবর্ণ বিবাহকে দেখবার স্থান দিয়েছে। তবে কী করে বলি তাদের সামাজিক পরিবর্তন হয় নি? এই তো সেদিন শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মণ কন্যা মঞ্জুর সঙ্গে সাঁওতাল বর বরকমর বিয়ে হলো। তাঁরা দুজনেই অধ্যাপক অধ্যাপিকা। গ্রামের মানুষ তো মেনে নিয়েছেন। জাঁকজমক করে সামাজিকভাবেই বিয়ে হয়েছে। আবার অন্য চিত্রও চোখে পড়েছে। বর্ধমানের বড় বেলুন গ্রামে তরুণী ব্রাহ্মণ, তরুণ কায়স্থ। দুজনের মনের মিল এত যে তারা বিয়ে করে ঘর করতে চায়। কিন্তু তাদের বাবা মা বাধা দিলে দু'-জনেই মৃত্যুমুখে বেছে নেয়। ওই গ্রামের আশে পাশে খবর নিয়েছি, কেন এমন হবে। থানা থেকে জানিয়েছেন—আশ-পাশের গ্রাম মিলে তা মাসে আট দশটা এই প্রেম কেসে মরে। এরা পরিবর্তনকে মানতে চাননি। অথচ সেই সব গ্রামে মেয়ের পরনে দামী শাড়ি বদলে মাকসি উঠেছে গায়ে, হাতি পা প্যান্ট উঠেছে।

একটি ছোট উদাহরণ টানছি এখানে। বীরভূম জেলায় গোপালপুর গ্রামে গিয়েছি। পটদেখিয়ে এসেছেন ঘরে। মা পট দেখবেন। এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের দেশের গ্রামের মা-মেয়েরা, ছেলে-পিতারা পট দেখানোকে নিজের মধ্যে কেমন না। এটা তাঁরা ভিক্ষা বৃত্তির জন্যে ধরেন। পট দেখানো শুরু হয়েছে অবাক হয়েছি এ আবার কী। এ পট নাকি? জিজ্ঞাসা করেছি, নুর মহম্মদ এতো ভাই পট নয়। ও বলেছে, ব্যাপারটা কী জানেন, এখন আর মা-দিদীরা, বা দিদিমনিরা যমরাজার কাহিনী, রাজাদশরথের কথা, হিরেমন কেন্যার সংসার যাওয়া শুনতে চান না। তাঁরা চান রাজেশ খান্না, হেমা মালিনীর ছবি। হিন্দী বইয়ের বিস্তির পালা। তাই আমরা পেট বাঁচাবার জন্য সমাজ এবং নীতি এ দুটোকেই হারাতে বসেছি। তাননি তাংতে পারেন এমন আর পট আঁকবার কোন লোক পাওয়া যায় না। গ্রামের দু'একজন মুরুব্বি আছেন তাঁরা ছাড়া আমাদের ঘরেসি আর কেউ পট আঁকতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে সিনেমার ছবি কেটে কেটে এই পট বানিয়ে নানান ছড়া কেটে পট দেখাই। বীরভূমের এক বাউল নিমাই দাসের সঙ্গে দেখা। গ্রামজীবনে পরিবর্তন কিন্তু দেখছেন নিমাই বাউল, জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, হাঁ দাদাবাবু পরিবর্তন মানে ন্যাংটো মেয়ে খেজুর গাছে ওঠার মত পরিবর্তন। রসিক বাউল তখন বলেছেন—এখন আর কেউ শোনেন না—জনাধের নাম গোরা রে, তুই আমার পাগল করলি রে...। তার বদলে 'ও ঠাকুরপো। তোমার জন্যে মনটা কেমন করে...এই গানের বেশি কদর। তবে তাঁত বুনে পেট ভরে না, তাই মন ভরাবার জন্যে একতারা নিয়ে বসি।

সমাজের এই দিকগুলোর বর্তমান পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন নিশ্চয়ই।

যাঁরা প্রতিদিন অফিস-কাছারি করতে আসেন কলকাতায় তারা দেখে থাকবেন,

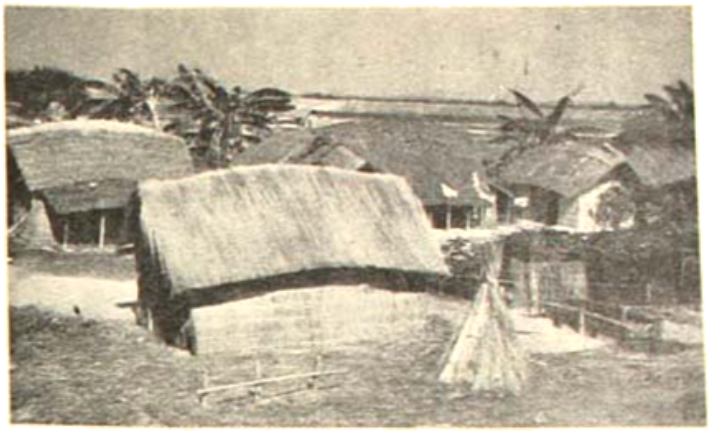

চলের চুল উঠে গেছে। আর কি চাই?

বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েরা চাল পাচারের কাজে মিথিধারা আত্মসমর্পণ করেছেন। একবার একটি মেয়েকে ট্রেনে বর্ধমান থেকে ওই ভাবে চাল নিয়ে ঝুলে আসতে দেখে বলেছিলাম তোর নাম কী? বলেছিলো, মিনতি রায়। এই চালের ব্যবসা করে কত লাভ হয়? হয়, তা ধরি না তবে... একটা গালাগালি দিয়ে বলেছিলো ওই পুলিশগুলোকে কিছু দিতে হয়। তার ওপর রাত বিরেতে ধরে নে যায় যেখানে সেখানে। কেন করিস? এক কথায় উত্তর পেয়েছিলাম, প্যাটের নাড়ভা মোচা। তাই।

ঠিক এইরকম উত্তর পেয়েছিলাম বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার—এক সাঁওতাল রমণী তার বাচ্চাকে বলছে—যাচ্ছা দিয়ে দেখি পেটে। কারণ আমি তোর জমিতে মাল্লার খেটেছি বলে। এখন তোর কাজ শেষ তাই আমার দরকার নাই। তা পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যা। অন্তত নেশা করার জন্যে।

২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং, সোনেখা, রাওাবেলিয়া, পদ্মিরাজার, সন্দেশখালি, আবার অন্য দিকে মুরলপুর দেঁয়োখালি, পাটশাল, কাকদ্বীপ, ফলতাদর, হরিণবাড়ি, সাগর, ছুরের ঘোড়ি এই সমস্ত অঞ্চলে এখনও মেয়ে বন্ধক রাখা হয়। পঞ্চাশ টাকায় যুবতী মেয়েকে বাবার বন্ধুলোকের বাড়িতে বন্ধক রেখে পরের বছর সুদ সমেত মেয়ে ফিরে নিয়ে যেতেও দেখেছি। পাথরপ্রতিমার বান-ভাসি মানুষের দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে

তাদের স্থান দিয়েছে—সোনাগাছি, প্রেম-চাঁদ বড়াল স্ট্রীট, এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথ। আর তার জন্যেই সরলা, আরতি, বাসন্তী ও করিমন বিবি। ছবিটা যদি একটু অন্য দিকে ফেরাই তবে দেখবো পশ্চিম বাংলার মেয়ে মেদিনীপুরের চাঁদড়া গ্রামের দোকানী। দোকান করে ব্যাঙ্কুকেট হয়েছে। তার ব্যবহারে চেহারায় চরিত্রে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই।

কুসংস্কারের জাল ছিঁড়েই এ লেখা শেষ করছি। আমরা ছোটবেলায় শুনেছি মেয়েরা পা ছড়িয়ে বসলে বাড়ির বয়স্কারা বেশ বকতেন। বলতেন—ভাতার-খাকী পা ছড়িয়ে দিলাতে বসেছিস কেন। দেখবি দুরে ফিরে যাবে। আর আমাদের দেখতে পাবি না। কই এখন আর গ্রামে গেলে এ কথা তো শুনিনা। আবার শনি মঙ্গলবার ঝাগলা বা গরুর দড়ি ডেঙানেও একই দশা। মেয়ে নাকি অসৎচরিত্রের হয়। বাড়িময় চিঠি পড়ে যায়—হায় গো এ মেয়ের বিয়ে দেবো কোথা। এখন কী আর এ সব আছে? এসব গ্রামে গিয়ে দেখেন? নেই বললেই চলে।

এই তো সেদিন ২৪ পরগণার সোপাদপুর গ্রামে উমা দাসকে দেখলাম, সুন্দরী, বি. এ. পাস গৃহবধূ। নিজের ইচ্ছায় নিজের হাতে গো-প্রজনন করছেন। আট-দশটা গ্রামের লোকেরা তাঁকে গ্রামের লক্ষ্মী বলেই ডাকে। মা লক্ষ্মী আমার গরুটা গরম হয়েছে একটু বিদেশী সিমেনস ইনজেকশন করে দাও। তিনিও বিনা দ্বিধায় এ কাজ করে দেওয়াচ্ছেন। এটা তো রীতিমত একটা বিপ্লব বলে আমি মনে করি। ভাবুন তো ১০ বছর আগের কথা।

তবে গ্রামের দুঃখটা কোথায়। দুঃখ সেখানেই গ্রাম এখন শহরের আলোয় আর গ্রামের ছায়ায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন নিয়ে। কুসংস্কারের আয়ু আর কত বছর? তা ঠিক হিসাব করে বলতে পারবো না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি দেখলে মনে হয় সবই যেন পরিবর্ধিত শহরতলী। পোশাক পরিচ্ছদ থেকে জীবন যাপনে কি নীতিগতভাবে কি সামাজিকভাবে শহরেরই অনুকরণ এখন গ্রামের মধ্যে। গ্রামের মধ্যে এরকম শহর ঢুকে গেলেও শহর থেকে এখনো গ্রাম কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি। গ্রাম এখন এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে গ্রামের মাঠে ট্রাক্টর দিয়ে চাষও হচ্ছে আবার অন্য দিকে ভূত পেত্নীও রয়েছে বলে কাউকে ওঝা ডেকে ঝাড়া হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে ভূতে পাওয়ার ব্যাপারই নয়। রোগটা মানসিক।

প্রকাশন বিভাগের কয়েকটি বই

১।	শা কমিশন রিপোর্ট (বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া)	প্রকাশন বিভাগ	দুই খণ্ডে ৩.০০ (প্রতি খণ্ড)
২।	মহাকাশে ভারত	ঐ	৯.০০
৩।	ভারতের গৌরব—প্রথম খণ্ড	প্রকাশন বিভাগ,	৩.৫০
৪।	ঐ —দ্বিতীয় খ	ঐ	৭.০০
৫।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ডি লিট	৬.৫০
৬।	দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	পদ্মিনী সেনগুপ্ত	৫.০০
৭।	রাজা রামমোহন রায়	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫.০০
৮।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সুনীল কুমার বসু	৮.৫০
৯।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	শশধর সিংহ	৩.৫০
১০।	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সুনীল কুমার বসু	৫.০০
১১।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বিনয় ঘোষ	৫.০০
১২।	রমেশ চন্দ্র দত্ত	আর. সি. দত্ত	৮.০০
১৩।	সত্যি গোয়েন্দা কাহিনী	প্রকাশন বিভাগ	৫.০০
১৪।	মহাত্মা গান্ধীর কাহিনী	এস. ডি. সামান্ত ও এস. ডি. বাদলকর	২.৫০
১৫	জওহরলাল নেহরুর কাহিনী	ঐ	৩.৫০
১৬।	চিত্রে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ	প্রকাশন বিভাগ	১৫.০০
১৭।	রবি পরিক্রমা	ক্ষিতীশ রায়	৬.৫০

প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত মাসিক/পাক্ষিক, ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা বা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষায় যে কোন পত্রিকার গ্রাহক হলে উপরিলিখিত বা প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত পুস্তকের উপর ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। ক্রয়মূল্য কমপক্ষে পাঁচ টাকা হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত ক্রেতা/পুস্তক বিক্রেতাকে ন্যূনপক্ষে দশ টাকার বই ডি. পি-যোগে বিনা খরচায় পাঠান হবে। পত্রিকার গ্রাহকমূল্য/পুস্তকের দাম মনি অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ক্রশ্‌ড পোস্টাল অর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া নিম্নলিখিত সরকারী/আধাসরকারী সংস্থার প্রকাশিত পুস্তকও পাওয়া যায়:

{১} এন. সি. ই. আর. টি, {২} ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, {৩} সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, {৪} ললিতকলা অ্যাকাডেমি, {৫} আই. সি. সি. আর. {৬} আই. সি. এ. আর, {৭} হিন্দী ডাইরেকটরেট, ৮} সি. এস. আই. আর।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা:—বিজনেস ম্যানেজার, সেলস এম্পোরিয়াম, পাবলিকেশনস ডিভিশন, ভারত সরকার, ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯।

বিনোদন গ্রাম বাংলায়

অধীর বিশ্বাস

বলি ভাইরে ভাই, ব'লে যাই
আজব ঘটনা। সাপ খেলায়
সাপুড়ের কন্যা, নামে তরিনা।

সামনে কুপির আলো। ঘুড়ুর তাপড়ে তলিল ভাই ঠেকা দিচ্ছে। বিনি বিনি বাজে। রসিক ভাইরা খেজুর-মাদুরে আসন নিয়েছে। জাঁকালো আসর। আবগাছা বেশ নিরিবিলি। গ্রামসাহের গোড়ায় বাঁধা গরু। ডিকে জোৎস্নার ঘড় চিবুচ্ছে। অবসর বিনোদনের বোধহয় সেও এক শ্রোতা।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবন সাধারণত চাষবাস-কৃষিকর্ম, মজুর খাটাতেই ব্যস্ত। এর মধ্যে আবার অভাব-অনটন, আছে নানান ক্রান্তি জামেলা। মানুষ তবুও চিরাচরিত প্রথা, একঘেয়েমি থেকে একটু বৈচিত্র্য খুঁজতে চায়। দিন শেষের কিছুটা সময় অন্তত নিজের জগৎ অবসর বিনোদনে তাকে কাছে টানে।

জীবন যাত্রার প্রাথমিক পর্ব ভরণ-পোষণ। তারপরেই আসে আমোদ-প্রমোদ, স্ফূর্তির ব্যাপার। কিন্তু গ্রামীণ বিনোদনে আজ ভাঁকিয়ে বসেছে শহরে কালচার। পল্লী জীবনের যে আসল রূপ তার প্রায় সিংহভাগ আজ অনুপস্থিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গ্রামের মানুষের মনে লেগেছে নয়া জোয়ার। রেডিও, সংবাদপত্র, যাত্রা থিয়েটার, চলচ্চিত্র গাঁয়ের মানুষের [illegible] বিনোদনের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। আধুনিক যাত্রা-থিয়েটার, বিচিত্র অনুষ্ঠানের দল শহর থেকে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। সাজঘরের বদলে জেনারেটরের বিজলী আলোয় বসে তৃপ্তি পেতে তারা আগ্রহী। তবে হ্যাঁ, প্রচলিত গান, কথকতা, ছড়া, গ্রামসংগীত রামযাত্রা এখনও উঠে যায়নি। এখনও নজরে পড়ে গাঁ-গঞ্জে, মেলা বা মোকামের উঠোনে। মোহিত হয়ে শোনে সব গ্রাম্য কবির ছড়ার গান--

তরিনার মা নাই, বাপ নাই
দাদির সঙ্গে ঘোরে।
বেহুলা লখিন্দরের সনে
পরান পাগল করে।

গ্রামের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির প্রতিভূ জোতদার, মহাজন। এতদিন গ্রামবাসী-দের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব তাদের হাতেই ছিল। নিজস্ব উঠোন বা খোলা মাঠেতলায় যাত্রা, নাটক, থিয়েটার বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার অবসর বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছেন। এখন হয়েছে বিভিন্ন সংঘ বা গ্রামীণ নাট্যসংস্থা। বলা বাহুল্য এদের মধ্যে বেশীর ভাগই প্রফেশনাল। কেউ সঙ্গিত বিক্রেতা, কেউ সাঁতের মাঝি, কেউ বা হয়ত হলধর। সন্ধ্যেবেলা নিয়মিত হাজিরা দেন জাতুর চালার ক্লাব ঘরে। রাত দুপুর অব্দি রিহার্সালের গলা যেনো মাঠের মাঝা ছাপিয়ে উঠিয়ে যায়। অভিনেতা ছাড়াও নিয়মিত বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা সময় কাটান সেখানে। এঁরা সাধারণত পুজো-পার্বণ বা বিশেষ কোন জলুষে যাত্রার বই বা নাটক মঞ্চস্থ করেন। এদের অভিনয়ের নিঃসৃত বিশ্লেষণ করতে জেলে দোষগুণ থাকে অবশ্যই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। পিছিয়ে থাকা মানুষদের পক্ষে এভাবে বিনোদনের আনন্দটাই বড়

এসব ছাড়াও গ্রামে গ্রামে পেশাদারী নানান পুতুল নাচের দল। কোথাওবা মাথাই তুলসই এক মাঠে বসিয়ে নেন পালা। দুরে একটানা অনেকক্ষণ। পরপর উঠলে তিন-চার মাসও থাকেন এইসব নাচনীওয়ালী। সব বয়সেরই ভীড় জমে। গ্রাম তখন গমগম। ছেলে-বুড়োর দল কাজ করতে করতে কোনমন হাত দিয়ে রিহার্সালটুকু দিচ্ছে আগে মাইক ছিলটিং। বিহার, উড়িষ্যার পর বলীয়ার সেই বিখ্যাত পুতুল নাচের আসর আপনাদের অভিনাষ উপস্থিত। আসুন। দেখুন। আজকের নাইক রঘু ডাকাত।

আবার দেখা যায় গাঁয়ের মানুষ সন্ধ্যের মুখে জোট বাঁধছেন। সীতা আজ বনে যাবে। বাঁশ পুঁতে চাতাক ফিট করা হয়েছে। মাটির ওপর সাঁড় ঘেরা স্টেজ। চৈ হল্লা, চেঁচামেচি।

গ্রামের মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে, অভাবের তাড়নায় গান-বাজনার সঙ্গে

22 SEP 1978

DHANADHANYE
Price Re 1.00

YOJANA INDEPENDENCE NUMBER
(Bengali)

Regd. No. WB/CC 315
Aug 1 - 31, 1978

পড়ুন। পড়ের কামরায়। বিড়ি পড়াও, খোলা মজুরদের বস্তিতে ঘরে ঘরে গিয়ে। রাজমিস্ত্রির [illegible] মাথার উপর ইট [illegible] সমিতিদের ধারে [illegible] ভর্তি। [illegible] এদের [illegible] ভাগ [illegible] ঘরে [illegible] ভাগ পড়ুন না [illegible] মাসীর পর মাসী কেটে যায়।

শুরু হয় হেরিস কোটি দেবদেবীর চেনা একেবারে 'হাসে হে রাম রাজীব লোচন সঙ্গে লয়ে সে জানকী' পর্যন্ত খুব গভীর। অনেকে গেছি কামিয়ে মেয়ে সাজেন। পরনে জরি ঝলমল কাপড়। বুকে সাবকোল আলা। মুখে খড়ি গলার স্বর মেয়েলী করতে চেষ্টা। যেন মানুষের সত্যার খোরাক পান।

এমন করে বছর ঘুরে গ্রামযাত্রার দল বাংলার পথে-প্রান্তরে, মেলা উৎসবে নিষ্ঠাবান অভিনয় দিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের কোন সরকারী ছাপ নেই। জানাশোনা বেশীর ভাগই মুখে মুখে ফেরে। তাদের ছিল বিনোদনের জন্য যাঁরা প্রয়োজন এমনি অনামী নাট্য সংস্থা। এঁদের বই হেলেন ভ্রম ট্রয়, নটী বিনোদিনী বঙ্গ—রাম যাত্রা। বড় জোর মিনার্ভা সাজাহান কবি, নবরঙ্গী কণ্ঠের সুর—'বিক্রিপ্রিয়ার চোখের জল, কেহ দাই ভালবাসার জন্য।'

এইসব মানুষের জন্যই আজকের পালা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আলো ছিটকে পড়ছে গানাঙ্গনে কয়েকজনের মাথায়। ব্যাজাকের দুই ধারে দুই শাওয়ার ভাল।

থোকার উৎপাত। নিচে তবলাকে আর ইংরেজী বাজনা।

'কত আর। কী দোষে
সীতারে দেবে বিজনে বিরহা,
রাজরাণী হবে কাঙ্গালিনী?'

সীতা বনে যাচ্ছে। কেননা রামের আদেশ শিরোধার্য। অনেক শ্রোতাই কাপড়ের খুঁটি, সবার অলক্ষ্যে অশ্রু গোপন করেন তখন।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় গ্রাম-জীবনের সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের এইসব মাধ্যমগুলি দিনকে দিন হারিয়ে যাবার পথে। তদারকী করার কেউ নেই। সুস্থ জীবনমুখী যাত্রা-সিনেমা অবশ্যই গ্রাম-জীবনের মূঢ়তা থেকে নতুন আলোর সন্ধান দিচ্ছে। আবার কুরুচিপূর্ণ বিকৃত সংস্কৃতিতে গ্রামের সবুজ পরিবেশ যাতে বিষণ্ণ না হয়ে সেদিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন। কেননা কোন ব্যবসায়ী স্বার্থে একদল স্বার্থান্বেষী সস্তা উত্তেজনামূলক নাচগানে দেশিয়ে পয়সা লুটবার লালসায় থাকেন। এদের দ্বারা সাদামাটা জীবন ও পরিবেশ কিভাবে নষ্ট হতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। যেমন যাত্রা-থিয়েটারের কথাই ধরা যাক।

গ্রাম বাংলার যুগ যুগ ধরে অন্ধকার জীবন যাপন করছে। তাদের চিত্ত বিনোদনের সুচিন্তিত ব্যবস্থা নেই। তাই সরকার চেষ্টা করছেন বিলুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতি, পালা-পার্বণ যাতে পুনরুজ্জীবিত হয়। মুক্ত প্রযোজকরাই একমাত্র ভরসা গ্রামের মানুষ অল্প পয়সায় বিনোদনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো সুড়সুড়ি দেয়া পালার নাম। অভিনয়। এবং বিধিনিষেধহীন টিকিটের মূল্য এত চড়া যে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্য মানুষের দৈনিক মজুরীর সমান।

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি ওধুমাত্র তুলে ধরলেই হবে না। তারজন্য চাই সুচিন্তিত সরকারী দৃষ্টি। তাহলে গ্রাম-বাংলার একদিকে যেমন হারু ঐতিহ্য রক্ষা হবে, তেমনি গ্রামের মানুষের একটা সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমও গড়ে তোলা সম্ভব হবে অদূর ভবিষ্যতে। বিগত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনতা রায়ায়িত হবার পর কিভাবে বিনোদনের ব্যবস্থা হবে তাও ভাববার কথা। মোটা পয়সা ছাড়া যেখানে কলকাতায় নাইসংঘ। সেলানো ভার, সেখানে গ্রামের মানুষ নতুন কিছু আশা করেন।

'ধনধান্যে' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে বেরোয়। পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার :

একবছর ১৩ টাকা, দুবছর ২৭ টাকা এবং তিনবছর ৩৯ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৭০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা অর্ডারযোগে গ্রহণ করা হয়। যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

প্রকাশনা বিভাগ, সিনেমা ও প্রচারের গ্রাহকমূল্যের উপর ২০ পয়সায় কমিশন দেওয়া হয়। 'ধনধান্যে'র সমস্ত গ্রাহক তাঁদের সরকারের প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত যে কিসুকে ২০ পয়সায় চাঁদা দেবেন।

প্রচারণী :

'ধনধান্যে'র প্রচারণীর উপরোধে কমিশন দেওয়া হয়। প্রকাশন বিভাগের প্রচারণীর অধারীটি কমিশন পাবেন। প্রচারণীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রকাশনা এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত চিঠিপত্র
সম্পাদক, ধনধান্যে,
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা—৭০০ ০৬৯
ফোন : ২৪-২৫৭১

সম্পাদক
বিশ্বনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
বিপদ ভঞ্জদস্তী

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণান।
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং এস. কে. গোসেন অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ কর্তৃক মুদ্রিত।

কল্পান্ত

পঞ্চাশ পয়সা

হরিজন

আন্তরাজ্য নদী জলচুক্তি

কবে আপন জন হবে

বাংলা মুদ্রণশিল্পের দুশো বছর

সম্প্রতি বাড়তি খোঁচা কাপড়

চিঠি

ধনধান্যের ১৬-২১ জুলাইর সংখ্যাটিতে শ্রদ্ধেয় শ্রী নিরঞ্জন হালদারের "ভারতের শিশু শ্রমিক" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করে মনমানস কতটা প্রভাবিত হবে তা জানি না। ভারতের কলকারখানায় ও নানা এস্টাবলিশমেন্টগুলোয় শিশু শ্রমিকের উপর যে শোষণের স্টীমরোলার আজও অব্যাহত রয়েছে, তা নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের লজ্জা দেয়।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি বাঙালী মালিকেরা স্বল্প বেতনে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করছে। তাদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। যে সমস্ত কুলপেশাদের ভিতরে গিয়ে জেনেছিলাম, তাদের লেখাপড়া করার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের তাড়নায়, আবার কারও ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাবে, তারা শিশুশ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

লেখক তাঁর প্রবন্ধে ফিলিপিনের 'কম্যুনিটি' স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন। আমার মতে, এদেশে সেরকম 'কম্যুনিটি' স্কুল চালু করে (শুধু বিনামূল্যে খাদ্য দিলেই) নিরক্ষর শিশু শ্রমিকের স্রোত রোখা যাবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিবেশ ও বস্তিবাড়ির নিরক্ষর অভিভাবকদের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে 'ভিজিটিং' দলের মাধ্যমে স্বমতে বা লেখাপড়া শেখানোর উপকারিতা বোঝানো যাচ্ছে, ততদিন এ স্রোত রোখা কার সাধ্য।

সুদীপ্ত রায়
৮৭ ১২, ঘোষপুকুর রোড,
কসবা, কলকাতা

'বিশ্বকাপ ফুটবলের রাজাসনে আর্জেন্টিনা'—গত ১৬-২১শে জুলাই-এর ধনধান্যে পত্রিকায় উপরোক্ত বিষয়ে শান্তিবাবুর লেখা পড়লাম। লেখাটি আমার কাছে মনোমত হয়েছিল এবং লেখাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত যদি কিনা একটি সামান্য ভুল না থাকত। বোল কথি ভুলটি হয়েছে সেখানে যেখানে শান্তিবাবু হল্যান্ড ও ওইল্যান্ডের খেলার ফলাফল বর্ণনা করেছেন। উনি বলেছেন যে হল্যান্ড ওইল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। কিন্তু হল্যান্ড বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার আগে লীগ পর্যায়ের খেলায় একবার মাত্র হারে, তাও ওই ওইল্যান্ডের কাছে এবং সেখানে ওইল্যান্ড ২-১ গোলে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। এখন শান্তিবাবুর উপর বিবেচনা করার ভার দিলাম, ওঁর লেখায় ঐখানে ভুল ছিল কিনা।

দীপক মুখা
আমলাসোথী
২৪ পরগণা

আপনার সু-সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক সৃজনধর্মী আলোচনাপূর্ণ পত্রিকা (ধনধান্যে) উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই সু-সম্পাদিত পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ স্থান দিতে অনুরোধ রাখছি। তাছাড়া সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী, ভারতের সমাজের আদর্শ-আধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করে লেখা এবং দু'একটা কবিতাও স্থান দেবার জন্য অনুরোধ রইল।

নিরঞ্জন সেন
গ্রন্থাগারিক,
সরস্বতী মন্দির, তাদুল
বাঁকুড়া

আমি 'ধনধান্যে' একজন গ্রাহক এবং অনুরক্ত পাঠক। 'ধনধান্যে'-এর স্বাধীনতা সংখ্যাটি পড়লাম। অপূর্ব হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যাটি। এত সুন্দর ছাপা এবং উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদ দেখে বিস্মিত হয়েছি। সাগর দ্বীপের নির্জন বুকে বসে নিয়মিতভাবে প্রতি পক্ষের 'ধনধান্যে'র নতুন সংখ্যা পড়ে থাকি। আপনাদের সু-সম্পাদিত এই পত্রিকাটি আমার অত্যন্ত প্রিয়সাথী। এর প্রচারে আমি প্রত্যাশী।

প্রতি সংখ্যার সূচিচিত্রিত রচনারাজি আমার মনে নতুন শিল্পলোকের সন্ধান এনে দেয়। সম্প্রতি 'ধনধান্যে'র স্বাধীনতার বিশেষ সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখকবৃন্দের রচনাবলী বিষয়গৌরবে এবং রচনা-শৈলীতে সার্থক হয়েছে।

আশিস কুমার ভূইয়া (পল্লবকবি)
মুড়িগঙ্গা, ২৪ পরগণা

'ধনধান্যে' বিভিন্ন ভাষায় ১ ও ১৬ তারিখে বেরোয়। পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার

একবছরে ২০ টাকা, দুবছরে ১৭ টাকা এবং তিনবছরে ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে প্রেরণ করা যায়। যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা:
সম্পাদক, ধনধান্যে,
৮, এসপ্লানেডের ইস্ট, কলিকাতা—৭০০ ০৬১
ফোন: ২৩-২৩৭৬

বিজ্ঞাপন

'ধনধান্যে'র প্রচ্ছদের উল্টোদিকে কমিশন দেওয়া হয়। 'ধনধান্যে'র সমস্ত গ্রাহক ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগের প্রকল্পিত যেকোন ১০ পয়সার ছাড় পাবেন।

এজেন্সী

'ধনধান্যে'র এজেন্টদের উপহারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রকাশন বিভাগের এজেন্টরা কমিশন পাবেন।

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
দিলীপ চক্রবর্তী

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

৩০ ভাদ্র-১৩ আশ্বিন, ১৩৮৫
১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
দশম বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

আন্তরাজ্য নদীজলবৃদ্ধি
তোলানাথ আইচ ২

সম্প্রতি বাকুড়ি ঘোড়া কলকব্জ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ৫

নষ্ট সময়
সুশোভন দত্ত ৭

বাঙলা মুদ্রণ শিল্পের দুশো বছর
ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১০

হরিজন কবে আসনাজন হবে
প্রশান্ত বসু ১৩

সফল সমাচার
অতীন সরকার ১৫

ক্ষেত খামার
দীনবন্ধু হাজরা ১৭
মুকুল বাগচী ১৮

জানা অজানা ১৮

আলাপ
উমা দাশগুপ্ত ২১

সংবেদ ২১

চিঠি আলোচনা
অমিতাভ চক্রবর্তী ২৩
অমর দাস

আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী
উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৪

প্রবন্ধ
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬

সম্পাদকীয়

শিশুশ্রমিকদের প্রতি জাতীয় দায়িত্ব

শ্রমিকেরা আজ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ। নায়কসহ দেবী আদালে তাঁরা জন সমর্থনও পেয়ে থাকেন। কিন্তু এরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। জন্মলগ্ন আজও পড়ে ওঠেনি সেই সব শ্রমিকদের অপক্ষ যারা মালিকের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না, জানে না আইনের আশ্রয় নিতে, জানে শুধু নীরবে চোখের জল মুছতে। আমরা সেইসব অসহায় শিশু শ্রমিকদের কথা বলছি যাদের আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পেশায়।

১৯৭১ সালের আদমসুমারীতেই দেশে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ। কিন্তু গণতির বাইরে অনেক শিশু শ্রমিক আছে সন্দেহ নেই। নানা সমাজ বিরোধী দৃষ্টিতে নিয়োজিত আছে বহু শিশু যাদের হদিশ পাওয়া সহজ নয়। চোলাই মদ পাচারে বা চোরা পথে নিষিদ্ধ মাল চালানেও শিশুদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বড় বড় শহরে বা তীর্থস্থানে অনেক শিশু ভিক্ষুককে দেখা যায় যারা দিনান্তে তাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ তুলে দেয় তাদের সর্দারদের হাতে।

হিসাবে যেসব শিশু শ্রমিকদের ধরা হয়েছে তাদের ৮২ শতাংশ কাজ করে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতখামারে, বাগিচায়, মৎস চাষে ও পশু চারণে। ছোট ছোট শিল্পেও অনেক শিশু কর্মীদের কাজ করতে দেখা যায়। তাছাড়া দোকানে, হোটেলে, ছোট ছোট কলকারখানায় ও গৃহস্থের ঘরে ঘরে কাজ করছে বহু শিশু। এদের কাজের ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, সময়সীমা নেই, বিশ্রামেরও কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। অথচ এরা বেতন পায় অতি সামান্য, কোথাও তাও জোটেনা, জোটে শুধু দুবেলা দু'মুঠো ভাত।

শিশুদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্মম বঞ্চনা শুধু সামাজিক মূল্যবোধের দিকেই নিন্দনীয় নয়, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিচারেও সমর্থনের অযোগ্য। যে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেলে একদিন পূর্ণ নাগরিকের অধিকার নিয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারত তারা জীবনের শুরুতেই মালিকের শৃঙ্খল হাতে পরে নিজে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। এদের অনেকেই অনাথ, অনেকে আবার খুব দরিদ্র ঘরের সন্তান যাদের বাড়ীতে তাদের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই। এদের অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেয় সমাজের বিবেকহীন অসাধু মানুষ।

আনন্দের কথা, ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ হিসাবে পালন করা হবে শিশুদের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এই শিশুবর্ষ সার্থকভাবে পালন করবার জন্য আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গেছে। জাতীয় শিশু পর্ষদের সাম্প্রতিক একটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণে একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণের অভিযান তখনই জয়যুক্ত হবে যখন সমাজের প্রতিটি দুঃস্থ শিশু শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে স্বনির্ভর হবার অধিকার অর্জন করবে।

আন্তরাজ্য নদীজলচুক্তি: একটি ঐতিহাসিক দলিল

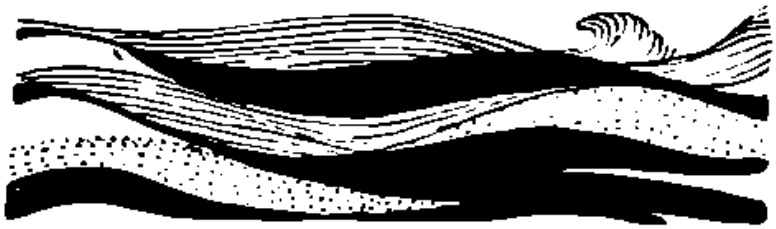

ভোলানাথ আইচ

স্থায়ী সম্পদ হিসেবে "জল" কতটা প্রত্যাধিকার পেতে পারে অথবা অস্থায়ী সম্পদ হিসেবে জলের মূল্যায়ন কি—এটাই বিচার কিন্তু সহজ নয়। চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে, আসুন না আমরা জলকে একটা জাতীয় সম্পদ হিসেবে মেনে নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতি এই জল-সম্পদ সৃষ্টি করার কতটা সহায়ক সেটাই প্রথমে বিবেচ্য। এরাজ্যের উত্তরে হিমালয়, হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত অঞ্চল বর্ষার মরশুমে জলপ্রাচুর্যে ভরপুর। মধ্যাঞ্চলেও জলের প্রাচুর্য, সবটাই বর্ষার জল। কিন্তু এই জল সম্পদের চেয়ে বরং বারেবারেই বিপদ ডেকে আনে। যেমন এবার এই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে মোকাবিলা করার কাজে প্রতি বৎসরই রাজ্য-সরকার হিমসিম খাচ্ছেন। দক্ষিণাঞ্চলেও জলের অভাব নেই। বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল বারে বারেই লবণাক্ততায় বিপন্ন হয়ে থাকে। এর মধ্যে জলকে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করবার সুযোগ রয়েছে। পশ্চিম-পশ্চিম অঞ্চলে, রয়েছে বীরভূম, বর্ধমানের খানিকটা অংশ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর। এই জেলাগুলি নিয়েই কিন্তু আলোচনা করছি। আলোচনা আরও চরম পেয়েছে আমাদের সদ্য সমাপ্ত দ্বিপাক্ষিক আন্তরাজ্য নদীজল চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে।

আন্তরাজ্য নদীজল চুক্তির আওতায় যে নদীগুলিকে আনা হয়েছে সেগুলি হ'ল দামোদর-বরাকর-সিঙ্গেশ্বরী নদী, অজয় নদী, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত নদীগুলি—বিশেষ করে দামোদর ও বরাকর নদী, মহানন্দা নদী এবং সর্বশেষে সুবর্ণরেখা নদী। চুক্তিটি দুটিস্তরে দু পর্যায়ে করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল কংসাবতী নদী, যে নদী কসাই নামে বিশেষ করে পরিচিত। সেই নদী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের নিজের বলতে কোন নদী নেই। সমস্ত নদীরই হয় আন্তর্-জাতিক অথবা আন্তরাজ্য বিস্তৃতি রয়েছে। উপরে উল্লিখিত নদীগুলির ভৌগলিক অবস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এসব নদীর জলসম্পদের ভাগীদার হচ্ছে পশ্চিমবাংলা ও বিহার। কেবল সুবর্ণরেখা নদীর ভাগীদার হিসেবে এই দু রাজ্যের সঙ্গে আছে ওড়িশা। এই নদীজল বণ্টন নিয়ে দীর্ঘ দিনের আলোচনার প্রথম ফলশ্রুতি হচ্ছে বিহার ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে আন্তরাজ্য চুক্তি, সেটা সম্পন্ন হয়েছে গত ১৯শে জুলাই, পাটনায়। চুক্তির স্বাক্ষরকারী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রী এবং বিহারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রী। সুবর্ণরেখা নদী ছাড়া অন্য চারটি নদী নিয়েই এই চুক্তি। এই চুক্তির বিশেষ তাৎপর্য হ'ল জলের এবং জলসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক দাবীর মীমাংসা এ দুটি রাজ্য নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনার মাধ্যমেই করেছে, এর জন্য কোন সময়েই তৃতীয় পক্ষের সালিশী দরকার হয়নি।

চুক্তির শর্তগুলি মোটামুটিভাবে বিচার করে দেখা যাক। দেখা যাক, আমরা কতটা জল পেয়েছি, কতটাই বা বিহারের জন্য আমাদের ছাড়তে হ'ল। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার দিকে প্রথমেই নজর দেওয়া যাক। মাইথন ও পাঞ্চেতের জলাধারের একটা মূল উদ্দেশ্য বন্যার জলকে ধরে রাখা। সে উদ্দেশ্য এতদিন অনেকটা ব্যাহত হচ্ছিল, কেননা জলাধার খালি রাখার জন্য যে জমির দরকার তা বিহারের অন্তর্গত। এই চুক্তি অনুযায়ী বিহারের এই জমি জলাধার খালি রাখার জন্য পাওয়া যাবে। এটা একটা মস্ত বড় লাভ। এই অতিরিক্ত জলাধারের সাহায্যে আমাদের বর্ধমান এবং হুগলী জেলার অনেকটা অংশ ভবিষ্যতে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করা যাবে। আরও একটা বড় লাভ হল এই চুক্তি পশ্চিমবঙ্গকে দামোদরের উপর তেনুঘাট বাঁধের অংশীদার হওয়ার অধিকার প্রদান করবে। এর পূর্বে তেনুঘাট বাঁধের কোন ভাগীদার ছিল না এবং বাঁধটা পুরোপুরি বিহার রাজ্যের আওতায় ছিল। এই অংশীদার হওয়ার ফলে সাঁওতালদি অঞ্চলের জলের একটা সুরাহা হ'ল। ফলে সাঁওতালদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র জলাভাব থেকে মুক্ত হবে এবং এই কেন্দ্রের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তাঁদের জলের অংশ থেকে মেটাতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়া এই অতিরিক্ত জল আমাদের দামোদর উপত্যকার সেচ পরিকল্পনাকে একটা শক্ত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করবে।

দামোদর উপত্যকার এই চুক্তির জলে বিহারইবা কি পেল একবার খতিয়ে দেখা যাক। যে সামান্য বিদ্যুৎ তিলাইয়া বাঁধ উৎপাদন করত, সেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবর্তে জলটা বিহার তার সেচের কাজে ব্যবহার করবে। কেননা বাঁধে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা এই জলটাও বিহার সেচের কাজে ব্যবহার করবে। বিনিময়ে বিহার অবশ্য সমপরিমাণ জল তেনুঘাট বাঁধ থেকে দেবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অনেকদিনের পরিচিতি। ভালমন্দ মিশিয়ে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সার্থক। তবুও জলের অনিশ্চিত অবস্থা মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে এবং সেচের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। উপরন্তু দিকে অর্থাৎ বিহারের সংলগ্ন এলাকাটা সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ময়ূরাক্ষী-সিদ্ধেশ্বরী নদীকে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় আনার ফলে সিদ্ধেশ্বরী নদীর উপর নূতন জলাধার সৃষ্টি করা যাবে যার ফলে নূতন জলসম্পদ সৃষ্টি হবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা শুধু বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যে এলাকা সেচের জল থেকে বঞ্চিত ছিল সে এলাকায় সেচের জল পাওয়া যাবে। বিনিময়ে সিদ্ধেশ্বরী জলাধার থেকে বিহারকে কিছুটা সেচের সুবিধা দিতে হবে এবং ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকেও বিহারকে সেচের কিছুটা বাড়তি সুযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে লাভের শিকটা বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের একটু অনুকূলে।

অজয় নদীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্যেই একটি জলাধার সৃষ্টি করার ক্ষমতা পাওয়া গেছে। বিহারের কিছুটা জমি এই জলাধারে ডুবে যাবে। এই জলাধার থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে—যে বন্যা থেকে প্রতি বৎসরই পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অংশ বিধ্বস্ত হয়। জলাধার থেকে সেচের সুযোগও মিলবে। বিহারও তাদের পরিকল্পিত জলাধার এবং বাঁধের সহায়তা নিয়ে সেচ এলাকা বিস্তৃত করবে। জলের ভাগাভাগি মোটামুটি দুরাজ্যের জলের সম্পদের দিকে নজর রেখেই করা হয়েছে। মহানন্দা নদীর যে বাঁধ তিস্তা পরিকল্পনার একটা অংশ, চুক্তি অনুযায়ী সেই বাঁধ থেকে বিহারকে সেচের কিছুটা সুবিধা দিতে হবে। তিস্তা নদী থেকে এই জল দেওয়া হবে না। জলটা পুরোপুরি মহানন্দার জলসম্পদ থেকেই আসবে। ভবিষ্যতে মালদহ জেলার সীমান্তে বিহারে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হবে। পরিকল্পনার রূপায়ণ করবে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ একযোগে এবং জলের দাবী এবং ভাগাভাগি পরিকল্পনা রচনা করার সময় আলোচনার মাধ্যমে দুই রাজ্য ঠিক করে নেবে।

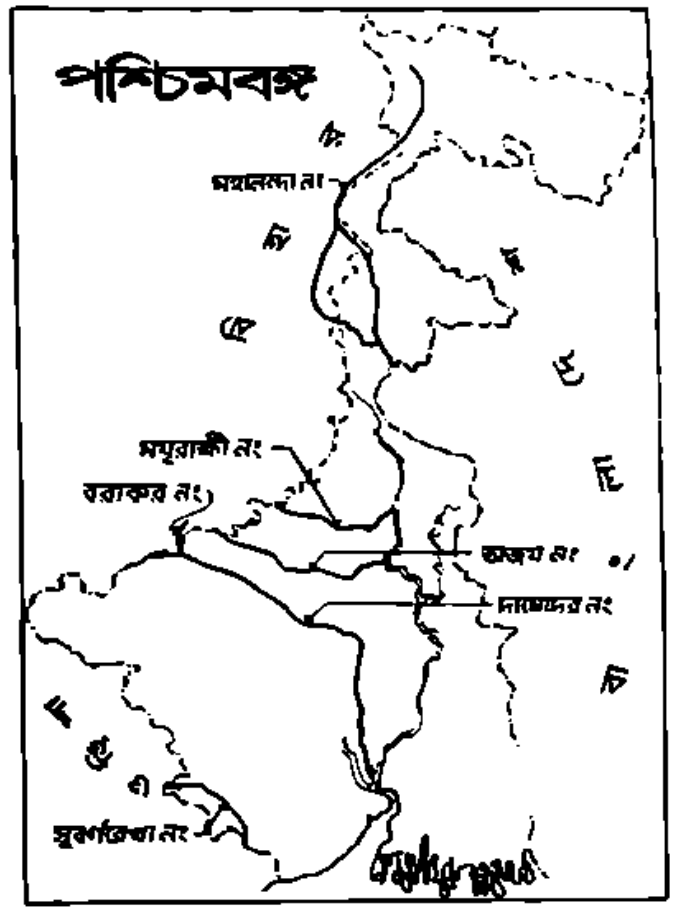

মোটামুটি চারটি নদীর জলের ভাগ-বখরাটারা নিয়ে আলোচনা করা গেল। এখন সুবর্ণরেখা নদী নিয়ে আলোচনা করা যাক। সুবর্ণরেখা নদীর জলের ভাগীদার তিনটি রাজ্য—বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা। জল সীমিত, দাবী সকলেরই মেটাতে হবে। নানারকম সমীক্ষা এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে দাবীর মাত্রাতা অনেক আগে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। বিহার এবং ওড়িশার মধ্যে খানিকটা জল ভাগাভাগি নিয়ে আলাদা একটা চুক্তি আগেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং এই চুক্তিতে যদিও পশ্চিমবঙ্গের দাবী স্বীকৃত হয়েছে, তবুও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা যতদিন না সম্পূর্ণ জলটার একটা ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়, ততদিন কাজটা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুবর্ণরেখা নদী নিয়ে প্রথম পর্যায়ের একটি আন্তরাজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে ২৪শে জুলাই। এ একই দিনে অন্য নদীগুলির সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার কথা আগেই বলেছি। সুবর্ণরেখা নদী নিয়ে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চুক্তিতে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হল যে এই চুক্তির কোন অংশই কার্যকর হবেনা, ততদিন না এই চুক্তির সম্পূর্ণ অংশে একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি দ্বারা স্বীকৃতি পায় এবং এই চুক্তির স্বাক্ষর-

কারী হবে বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা এই স্তরে শুরু হ'ল এবং এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে দুটি আলাদা আলাদা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তার মর্যাদা রক্ষা করে ত্রিপাক্ষিক একটা চুক্তিতে তিনটি রাজ্যের জলের এবং জলসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক দাবী যাতে স্বীকৃতি পায় তারই একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। আলোচনা আগে থেকেই চলছিল, খানিকটা যেন ত্রিমেতালে। আলোচনার গতি দ্রুততর হ'ল বিহার এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে। প্রযুক্তিবিদদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হল যে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে করবেন। কোন তৃতীয় পক্ষের সালিশী এ ব্যাপারে প্রয়োজন হবে না। এ সিদ্ধান্ত তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

স্থির হল পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলার ওড়িশার সেচের জন্যে তিন লক্ষ একরেরও বেশী জমির জন্য সেচের জল পাওয়া যাবে এবং বন্যার প্রকোপ থেকে মেদিনীপুরের বেশ খানিকটা অংশ রক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। চাণ্ডিল বাঁধে জলাধার তৈরী করে বন্যার জল সেখানে কিছুটা ধরে রাখা হবে এবং সেচের জন্য ধরা জলের অংশ খানিকটা বিহার রাজ্য আমাদের পুরুলিয়া জেলায় পৌঁছে দেবে। বাকী ধরে রাখা সেচের জল দিয়ে পুরুলিয়ার আরও খানিকটা জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা যাবে এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামপুরের কাছাকাছি একটি বাঁধ করে চাণ্ডিল বাঁধে ধরে রাখা জলটার অংশবিশেষ এবং সুবর্ণরেখা নদীর আমাদের জলের অংশটা নিয়ে মেদিনীপুরের বিস্তৃত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

সমস্যার যখন সমাধান করা গেল, চুক্তিস্বাক্ষর আর দেরী কেন? চুক্তি স্বাক্ষর করবেন তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক হল, ৭ই আগস্ট দিল্লীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কৃষি ও সেচমন্ত্রী এস. এস. রাণাসাহেবের উপস্থিতিতে এবং সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন খনি ও লৌহ দপ্তরের মন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক। ৭ই আগস্ট, সোমবার, ১৯৭৮, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন, স্মরণীয় দিন বিহার এবং ওড়িশার পক্ষে, তথা সারা ভারতবর্ষের পক্ষেও। স্মরণীয় এইজন্য যে ৭ই আগস্ট সকাল ৯-৩০টায় যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল তা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আন্তরাজ্য নদীর জলবণ্টন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নজীর ইতিহাসে এই প্রথম। এই ত সেদিন নর্মদা নদীর জলবণ্টনের রায় বেরুলো। বিচারপতি তাঁর রায়ে কাকে খুশী কাকে অখুশী করলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল এতদিন আলোচনা সত্ত্বেও নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হ'ল এবং এক তৃতীয় ব্যক্তির রায় মাথা পেতে নিতে হ'ল। গোদাবরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে ত দেখলাম বিভিন্ন রাজ্য আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন। সমস্যার সমাধানত এখনও অনেক দূরে।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বললেন, সুবর্ণরেখা নদীর জল নিয়ে এই চুক্তির বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, এই চুক্তি সারা দেশের পক্ষে একটি আদর্শ স্থাপন করেছে। এর আগে এরূপ কোন 'পথ-নির্দেশক নজীর পাওয়া যায়নি। তিনি তাঁর ভাষণে আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে আমরা যেন এই চুক্তি থেকে এই শিক্ষাই পাই যে আমাদের সব আন্তরাজ্য সমস্যা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিৎ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং খনি ও লৌহমন্ত্রী তাঁদের ভাষণে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাজ্যগুলির মনোভাবের মূল্যবান প্রশংসা করলেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের ভাষণে চুক্তির সারমর্ম ব্যাখ্যা করে এই কথাই জোর-গলায় বললেন যে, এই নদীর জল বণ্টনের সমস্যার মত ভবিষ্যতে যে কোন আন্তরাজ্য সমস্যাই নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে তাঁরা সক্ষম হবেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আরও বললেন যে, বন্যা একটি জাতীয় সমস্যা, এবং বন্যা থেকে জাতীয় সম্পদ বাঁচানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুবর্ণরেখা নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের বহনযোগ্য।

যতটা সহজে সম্ভব এই চুক্তির সারমর্ম পেশ করার চেষ্টা করলাম। কাজটা কিন্তু আসলে অত সহজে হয়নি। দীর্ঘ ৬।৭ বছর যে সমস্ত কর্মী ও কর্মকর্তা এই চুক্তিকে রূপ দেওয়ার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য। এক এক জায়গায় এসে মনে হয়েছে যে আর বুঝি এগোনো যাবেনা। তখনই হয়ত কোন কর্মকর্তা নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে নতুন পথের দিকে আলোচনা চালিয়ে নিয়ে গেছেন। এইভাবে সমস্যা সমাধানের পথ ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাকে। কিন্তু যা এতদিন ছিল আন্তরাজ্য সমস্যা তা এখন তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্যের নিজস্ব সমস্যায় পরিণত হল। এই সমস্যা হল চুক্তি রূপায়ণের সমস্যা। বাস্তবে রূপ না নিলে এই চুক্তির সার্থকতা কোথায়? বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে খুব শীঘ্র যদি রাজ্যসরকারগুলি সচেষ্ট না হন, তাহলে যে চুক্তি আশার প্রতীক হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে সেটা হয়ত ভবিষ্যতে একটা হতাশার মূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে উঠবে।

সস্তায় বাড়তি মোটা কাপড়
বস্ত্রনীতিতে নতুন অধ্যায়

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কাপড়ের কল, তাঁত আর খাদি নিয়ে আমাদের যে বিরাট বস্ত্রশিল্প তার গুরুত্ব কেউই কোনো দিন অস্বীকার করেন নি। কিন্তু প্রাচীনতম আর বিরাট শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এর সমস্যার শেষ নেই। আরো মোটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সুপরিকল্পিত প্রয়াসেরও অভাব। বস্ত্রশিল্পের নানা রোগের সন্ধান করে সেগুলি নিরাময়ের জন্যে কেন্দ্রের জনতা সরকার একটা নীতি ঘোষণা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শিল্প-মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ সেই নীতি ঘোষণা করেছেন সংসদে।

যে-কোনো নীতি তৈরির আগে সমস্যাগুলো সনাক্ত করা দরকার। ফার্নাণ্ডেজও তাই করতে চেয়েছেন। অনেক কাপড়ের কলে যে উৎপাদকতা কমে গেছে, অনেক কল যে পঙ্গু হয়ে পড়ছে, যন্ত্রপাতি যে সেকেলে হয়ে যাচ্ছে, এক দিকে কাপড়ের দর যে বাড়ছে আর অন্য দিকে মাথা পিছু কাপড়ের ব্যবহার কমছে—এই সব সমস্যার কথাই তাঁর বিবৃতির মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। কাপড়ের কলের পাশাপাশি যে হস্তচালিত তাঁত শিল্প, খাদি আর রেশম চাষের আয়োজন রয়েছে সেখানেও সমস্যার অভাব নেই। তাদের একটা বড় বাধনা সুতোর যোগান নিয়ে। তার সঙ্গে আছে বিদ্যুৎচালিত তাঁতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আর তৈরী কাপড় বিক্রির সমস্যা। রেশম চাষে বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এদিকে নজর দেওয়া হয়নি তেমন।

তবে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে নীতি এ পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে এসেছে তার ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে নিম্নমিত দরে গরিব মানুষের জন্যে মোটা কাপড় যোগানের ক্ষেত্রে। একে তো প্রয়োজন অনুযায়ী এই শ্রেণীর কাপড় তৈরি হয় নি, তার ওপর খাতাটুকুও হয়েছে তার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তৈরী কাপড় সব সময় গিয়ে পৌঁছয়নি গরীব মানুষের কাছে। অথচ এই কর্মসূচী রূপায়িত করতে গিয়ে ভরতুকি বাবদ সরকারের খরচ হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা।

নতুন বস্ত্রনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে ফার্নাণ্ডেজ যে সাধারণ মানুষের জন্যে কম দরে উপযুক্ত মানের যথেষ্ট কাপড় তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা খুবই স্বাভাবিক। যে-কোনো বস্ত্রনীতিরই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই। দ্বিতীয় লক্ষ্য, এই কাপড় গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। তৃতীয় যে লক্ষ্যের কথা শিল্পমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তা হলো হস্তচালিত তাঁত, খাদি আর রেশম শুতীর চাষের দ্রুত বিকাশ এবং এই পথে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা। চতুর্থ ও শেষ লক্ষ্য তুলো আর কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এনে তুলোচাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

এত দিন মোটা কাপড় তৈরির প্রধান দায়িত্ব ছিল কাপড়ের কলগুলোর। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মোটা কাপড় তাদের তৈরি করে দিতে হতো। কিন্তু কাপড়ের কলগুলো কখনোই আন্তরিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে নি। মালিকেরা বলেছেন, নিয়ন্ত্রিত দরে মোটা কাপড় বেচে তাঁদের পড়তা খরচ ওঠে না। ফলে সেক্ষেত্রে আগে অবশ্য মোটা কাপড়ের দর টাকায় ৫৩ পয়সা ছাড়ে বাড়ানো হয়। তবে বাড়তি দামটা ক্রেতাদের দিতে হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকি হিসেবে সেটা দিয়ে এসেছেন। মোটা কাপড় তৈরির আংশিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সরকারী কাপড়ের কলের ওপর। তা ছাড়া হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ওপরও এই দায়িত্বের কিছুটা ন্যস্ত করা হয়।

ফার্নাণ্ডেজ যে নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন তার তাৎপর্য হল এই মোটা কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পালাবদল ঘটানো। আগামী অক্টোবর থেকেই বেসরকারী কাপড়ের কলকে মোটা কাপড় তৈরির বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেওয়া হবে। তবে যে-সব বেসরকারী কাপড়ের কল স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবে তারা এই কাপড় তৈরি করতে পারবে। কাপড়ের কলের মধ্যে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন সরকারী কলের ওপরই প্রধান দায়িত্ব পড়বে মোটা কাপড় তৈরির। আর বাকিটা তৈরি হবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে। ক্রমশ অবশ্য মোটা কাপড় তৈরির পুরো দায়িত্বই গিয়ে পড়বে হস্তচালিত তাঁতের ওপর। আর হস্তচালিত তাঁতের তৈরি কাপড় যাতে কম দরে গরীব মানুষ পেতে পারে সেই জন্যে ভরতুকি দেওয়া হবে। তবে সরকারী কোষ থেকে এই ভরতুকি দেওয়া হবে না। মোটা বস্ত্রশিল্পকেই এই ভরতুকি দেওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

জনসাধারণের জন্য কম দামে যথেষ্ট মোটা কাপড় যোগান দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পূর্ণ বিকাশসাধন নতুন বস্ত্রনীতির এই প্রধান দুটো লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মূল শিল্পনীতির সঙ্গে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত যদি ৮০ কোটি বর্গ মিটার কাপড় তৈরির দায়িত্ব হস্তচালিত তাঁতশিল্প পায় এবং সব

কম রাখার জন্যে ভরতুকি দেওয়া হয় তবে বস্ত্রসংযোক তাঁতশিল্পীর সারা বছর কাজের ব্যবস্থা হবে এবং দর কম থাকায় বিক্রির সমস্যাও থাকবে না। হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে জোরদার করার জন্যে আরো কয়েকটি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেকেলে যন্ত্রপাতি বদল করে আধুনিকীকরণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে সংঘবদ্ধ বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে দেওয়া হবে না। বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ক্ষেত্রেও আর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে দেওয়া হবে না। অন্য দিকে হস্তচালিত তাঁতের জন্যে যাতে যথেষ্ট সুতো পাওয়া যায় সেজন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নতুন বস্ত্রনীতিতে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন সরকারী কাপড়ের কলগুলির ওপর বেশ বড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যত দিন পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁতশিল্প মোটা কাপড় তৈরির পূর্ণ দায়িত্ব নিতে না-পারছে ততো দিন প্রায় ৪০ কোটি বর্গমিটার এই শ্রেণীর কাপড় তৈরির দায়িত্ব এই সব কলকেই বহন করতে হবে। বেসরকারী কল যদি প্রয়োজনমতো মোটা কাপড় তৈরি করতে না-পারে তবে সেই অতিরিক্ত পূরিয়ে দিতে হবে এন টি সির কলগুলিকে। মোটা কাপড় ছাড়াও সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কম দরের অন্যান্য কাপড় তৈরির দায়িত্বও থাকবে এই সব কলের। হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে সুতো যোগানের ক্ষেত্রেও এন টি সি'র জন্যে একটি বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে।

সরকারী কল ধনীদের বদলে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করবে, এই নীতি যে সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে, সরকার যেসব কল অধিগ্রহণ করেছেন সেগুলি ছিল লাভ ও মুনাফাজনক। এখন শুধুই কম দামের কাপড় তৈরীতে নিযুক্ত থাকলে এই সব কলের মূলধন যাতে বিলম্বিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

নতুন শিল্পনীতিকে ঠিকমতো রূপায়িত করতে হলে সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। হস্তচালিত তাঁতের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা বিরাট। গরীব মানুষের জন্যে যদি মোটা কাপড় তৈরির পুরো দায়িত্ব ধীরে ধীরে এই শিল্পের ওপর গিয়ে পড়ে তবে তাকে শুধু এই বাবদই বছরে তৈরি করতে হবে ৮০ কোটি বর্গমিটার কাপড়। ক্রমশ এই পরিমাণ বাড়াতেও হবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে। তার ওপর কাপড়ের কল ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা যদি বাঁধ দেওয়া হয় তবে মোটা কাপড়ের বাইরে অন্যান্য কাপড়ের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর দায়িত্বও গিয়ে পড়বে এই হস্তচালিত তাঁতের ওপর।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে আমাদের হস্তচালিত তাঁত এই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্যে তৈরি হতে পারবে কিনা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে প্রয়োজন হবে এই শিল্পে বিরাট লগ্নী এবং সংগঠন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন তাঁতশিল্পীদের সমবায় গঠনে সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

মোটা কাপড়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় দেখা গেছে শুধু এই শ্রেণীর কাপড় তৈরিরই সমস্যা নয়, সেই কাপড় বণ্টনের সমস্যাটাও গুরুতর। নতুন বস্ত্রনীতিতে বলা হয়েছে এই বণ্টন ব্যবস্থার রদবদল করা হবে। তবে ঠিক কীভাবে করা হবে তা এখনও বিশদভাবে বলা হয় নি। এই ব্যাপারে সুচিন্তিত পরিকল্পনা তৈরি খুবই দরকার। গরীব মানুষ যদি হাতের কাছে কাপড় না পান তবে উৎপাদন বৃদ্ধি হলো কি, না-হলো তাতে তাঁদের কিছুই যাবে-আসবে না।

তুলো এবং কলের সুতোর যোগানের অনিশ্চয়তা বস্ত্রশিল্পের একটা বড় সমস্যা। নতুন নীতিতে এই প্রসঙ্গ যে একটা বিশেষ জায়গা জুড়ে থাকবে সেটা স্বাভাবিক নয়। কাপড়ের কল বা হস্তচালিত তাঁতশিল্পীরা যেমন ন্যায্য দরে সুতো চান, তেমনই চাষী চান তুলোর জন্যে ন্যায্য দর। তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা এই দুই চাহিদাই মেটানো যেতে পারে। শিল্পমন্ত্রী এ-বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। তুলোয় মজুত-ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাবও করা হয়েছে। তুলো কিনে বাজার চালা রাখার জন্য কটন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ভূমিকা আরো জোরদার করা হবে। তুলোর দর যাতে নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে না যায় তার জন্যও এই কর্পোরেশন প্রয়োজন বোধে বাজারে তুলো ছাড়বে। তবে তুলোর দর নিয়ে পূর্ব ভারতের যে একটা পুরোনো দাবি আছে সে-বিষয়ে নতুন নীতিতে কোনো উল্লেখ নেই। কমলা ও ইস্পাতের মতো তুলোর দরও সারা ভারতে সমান করে দিলে পূর্ব ভারতের বস্ত্রশিল্পের একটি বহু দিনের ক্ষোভ মিটবে।

শারদীয় সংখ্যা

ধনধান্যে

অভিনব পরিকল্পনায়
নতুন সাজসজ্জা নিয়ে
মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

দাম এক টাকা

অতিরিক্ত কপির জন্য এজেন্টরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

নষ্ট সময়

সুশোভন দত্ত

রাতে কাছে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসটা কেমন ভিজে ভিজে। বিতানের গা শিরশির করে উঠল। আবার জ্বর আসবে নাকি? বিছানা থেকে বেড-কভারটা তুলে বিতান ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

হাওয়ার সাপটে পেরেকে টাঙানো ইকেল ক্যালেন্ডার দুলছে। তারিখের পাতাগুলো খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ফরফর করে ডানা মেলতে চাইছে। একটা তারিখের নিচে লাল স্কটপেনের দাগ। বিতানের বউ নেই। সুতরাং ওটা কোনো মেয়েলী দাগ নয়। কোনো-কিছুকে বিশেষভাবে মনে রাখবার জরুরী তাগিদে ঐ লাল স্কিফিলের দাগটা একদা বিতানই দিয়েছিল। এই মুহূর্তে বিতান সেই জরুরী প্রয়োজনটা মনে করতে চাইল। মনে পড়ল। পলাশের বিয়ে। পলাশ বার বার ওকে যেতে বলেছে।

বিতানকে নিমন্ত্রণ করতে পলাশ ওর অফিসে এসে হাজির হয়েছিল। বিতান তখন আর্টিস্ট মেয়েটাকে কতকগুলো ইলাস্ট্রেশান বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কী যেন নাম মেয়েটার? মনীষা বা মানসী— এইরকম একটা নাম বলেছিল মেয়েটা। সদ্য ষোলস ছাড়া সাপের মতো মসৃণ চেহারা, পান পাতার মতো মুখে তাহিতি মিষ্টতা। বার বার শাড়ির আঁচল ঠোনে-টুনে মেয়েটা যৌবন সামলাচ্ছিল (নাকি ঢালস টুলস শরীর দেখাচ্ছিল!)। আর বেজার মুখে বিতান তাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ছুটির ঠিক দশ মিনিট আগে কেউ কাজ নিয়ে হাজির হলে কার না রাগ হয়? পলাশ রিসেপশনে বসে অপেক্ষা করেছিল। তারপর বিতানের কাজ শেষ হলে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল।

পলাশের স্কুটারের পিছনে বসে বিতানের বেশ ভয় করছিল। সাইকেল চালাতে জানে না বলে বন্ধুদের সাইকেলের কেরিয়ারে চেপে মাঝে মাঝে ও এখানে সেখানে গেছে। কিন্তু সে তো গ্রামের

রাস্তা। এখানে প্রতি মুহূর্তেই ছুটন্ত গাড়িগুলোকে পাশ কাটাতে হচ্ছিল, হেঁটে-চলা মানুষগুলোকে পথ দিতে হচ্ছিল—বিতান ভয় পেয়ে বেরুল ট্রাইং-এর বিজ্ঞাপনের মতো পলাশের কোমর সাপটে ধ'রেছিল।

একটানা খানিকটা ছুটে অরিন্দিয়ার সামনে এসে পলাশ ছুটার থামিয়েছিল। এরকম 'পর্শ' ড্রাইভার বিতান আগে কোনোদিন আসেনি। হাল্কা নীলাভ আলোর জোৎস্নায়, সমবেত পরিচ্ছন্ন নারী-পুরুষের প্রসন্ন কণ্ঠস্বরে, তাদের রঙবাহারী ক্যাসিস পোষাকের মেলায়, আর বিভিন্ন মূল্যবান কসমেটিকসের মিলিত সৌরভে এ যেন কল্পনায় দেখা এক ট্রেজার আইল্যাণ্ড—যেখানকার একটা মানুষকেও বিতান চেনে না। বিতানের কেবলই মনে হচ্ছিল ওর চারপাশের এই মানুষগুলো প্রত্যেকেই না মার্কোপোলোর এক একটা মার্বিকুইন, অথবা অ্যাকোরিয়ামে পোষা সব লাল-নীল-সোনালী মাছ। আর কুইপাথে, বস্তিতে, রেল স্টেশনে কিম্বা গাছ তলায় যুগ যুগ ধ'রে যাদের আশ্রয় তারা সবাই প্রাগৈতিহাসিক কসিল। সুখী রাজপুত্রের নয়ন-জলের ধারায় ওদের কি কোনদিন নবজন্ম হবে?

পলাশ মেনু কার্ড থেকে বেছে বেছে মার্কিনি অ্যাকসেন্ট খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। তারপর চোখ নাচিয়ে বিতানকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল,

—এনি হার্ড ড্রিঙ্ক?

বিতান মাথা ঝাঁকিয়ে মানা ক'রেছিল।

পলাশ জোর ক'রেছিল,

—আজকের মতো একটু হুইস্কি খা না।

—না।

—তাহ'লে একটু লাইমজিন উইথ টনিক দিতে বলি।

—দূর, আমার ওসব ভাল লাগে না।

—তুই একদম বোকা। মার্কেলীন বেরীর রিসার্চ অফিসার পলাশ সোম ঠোঁটের কোণায় হেসে ব'লেছিল, দেখ না মেয়েরাও আজকাল কেমন ক্যাজুয়ালি ড্রিঙ্ক ক'রছে।

নিজের জন্যে একটা লার্জ পেগের অর্ডার দিয়েছিল পলাশ। ওদের টেবিল থেকে একটু দূরে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি যুবতীর সঙ্গে গা ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে ব'সেছিল। লোকটির শরীরে অপর্যাপ্ত আরকোহলিক ফ্যাট। মেয়েটি হিসাবী ছিল। ও কি রোজ ফিসারেটে যায়? বাইশ থেকে বত্রিশের মধ্যে মেয়েটির বয়স। ওর পরনে স্কেলার দেওয়া সিল্কিয়া রঙের বেল-বটম্, ওপরে অফ্-হোয়াইট পলিয়েস্টারের ছোট টপ। সিভাকটিভ চোখের চারদিকে ভোনাকি রঙের আইশ্যাডো, পল্লবে গভীর কাজলে মাস কল্লা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা শাম্পু করা বাদামী চুল। ম্যানিকিওর করা নখ। খুব নেশা হ'য়েছিল মেয়েটার। তাই মাঝে মাঝেই টিপসি মেয়েটা প্রৌঢ় লোকটির গায়ে ঢুলে পড়ছিল। ঘুরে ফিরে বার বার মেয়েটার ওপর বিতানের নজর পড়ছিল। বিতান মনে মনে ভাবছিল, বসন্তসেনারা দিন দিন জীবাশ্মের মতো সংখ্যা বর্ধিষ্ণু হচ্ছে। আজকাল মেয়েরাও মাল খায়। খাবেই তো, খাবেই তো। এখন যে প্রগতি-কাল। থ্রি চিয়ার্স ফর উইমেন লিব্—হিপ্ হিপ্ হুররে।

জাপানী সিগারেটের কেস খুলে পলাশ বিতানের সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ইমপোর্টেড লাস লাইটার জ্বালিয়েছিল। ফুলের পাপড়ির মতো পাতলা নীল আগুন। বিতান সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল। সরল রেখার মতো ধোঁয়া ছেড়ে পলাশ ব'লেছিল,

—বিতান, আমি বিয়ে ক'রছি।

—কংগ্রাচুলেশনস্। বিতান খুশিতে পলাশের কাঁধে ছোট্ট ক'রে একটা চাপড় মেরেছিল। তারপর একটু অবাক হ'য়েই ব'লেছিল, পরশু দোলার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। ও তো আমায় কিছু ব'লল না।

—দোলা নয়, আমি পীপালিকে বিয়ে ক'রছি।

—পীপালি!

—আ নাইস্ টিঙ্। পীপালির বাবা মার্কেলীন বেরীর এক নম্বর ডিরেক্টার। রিয়ালি আ বিগ্ গাই।

পিকাসোর আঁকা ছবির মতো দোলার মায়ক মুখটা সাঁতরে সাঁতরে বিতানের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে এসেছিল। খেলা, পলাশ তাহ'লে দোলার সঙ্গে শুধু খেলাই ক'রেছে? কবি হাউসের কোণার ওদের দুজনের নিরিবিলি র‍্যাদেভূ। ইডেন, ভিক্টোরিয়া আর আউট্রাম ঘাটের স্পন্দিত নিবিড় মুহূর্তগুলো কী সবই শূন্যগর্ভ ছিল? বিতান পলাশকে বলেছিল,

—এটা তোর ভীষণ অন্যায় পলাশ। এটা পাপ।

—পাপ! পলাশ শব্দ ক'রে হেসে উঠেছিল। দুনিয়ার পাপ-পুণ্য ব'লে কিছু নেই বিতান, মিনিংলেস ওই শব্দ দুটো অক্ষমের আত্মসান্ত্বনা।

বিতান টের পেয়েছিল শুধু ওভারসিয়র জেনের পলাশ, যার বাবা চাইকেমটের কেরানী ছিল, সেদু খানা ঝুপসি ঘরে যার জীবনের অনেকগুলো বছর সঙ্কোচে কেটেছে। আলটপকা একটা ট্রাইট ওপিনিং পেয়ে সে নিজের কালিঝুলি মাখা অতীতটাকে রাতারাতি মুছে ফেলতে চাইছে। এটাও তো একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। ঘুঙ্গোকা ওর হৃদয়ের শিরা কেটে কেটে দ্রুত লয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পলাশ ত্রাস ক'রেছিল। জেদী ঘোড়ার মতো ছুতোর টো ঝুঁকে ব'লেছিল,

—আই লাইক ইট কিস্ দা আই অ্যাণ্ড লাইক হেয় আই'জ টু দাট।

বলো হরি... হরিবোল... বলো হরি... হরিবোল। পলাশ স্বর শুনে বিতান বুঝতে পারল যারা হরিধ্বনি দিচ্ছে তারা সবাই ওর বিষয় চেনা। তাহ'লে কি ইলিশ আই সন্তকে নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা বেরিয়ে পড়েছে? কাল সন্ধ্যেবেলার সন্ত ট্রেনে কাটা পড়েছিল। সবাই ব'লছে সন্ত সুইসাইড ক'রেছে। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে উদাসীন

দূরমনস্কভাবে ও রেললাইন পার হচ্ছিল। সেই সময়... বিতান আর ভাবতে পারে না। প্রবল রক্তচাপে ওর মস্তিষ্কের নার্ভগুলো বুঝি ফেটে পড়বে।

টুকিদের সংসারটা বড়। টুকির অনেকগুলো অল্পাস্তবয়স্ক ভাইবোন। মা নেই। বাবা ইনভ্যালিড, ভাই-বোনদের মধ্যে টুকি সবার বড়। ওর পরই সন্তু, ওর চেয়ে চার বছরের ছোট। বছর তিনেক আগে ইতিহাসে অনার্স পেয়ে সন্তু বি.এ. পাস ক'রেছিল। পাস করার পর যে কোনো একটা চাকরির জন্যে ও অনেক দিন সিরিয়াসলি চেষ্টা চালিয়েছিল। অতুল নিষ্ঠা আর উন্মুখ প্রতীক্ষায় একটার পর একটা চাকরির পরীক্ষায় পাঠিয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে ওর দর্শিত মুখে অন্তস্থ আত্ম-বিশ্বাসের বিষণ্ণ ছায়া নামল। খোলা মনের হাসিখুশি ছেলেটা কেমন যেন পাগল পাগল হ'য়ে গেল। ছন্নছাড়া, জীবনের প্রতি বীতরাগ, নিস্পৃহ বীতশ্রদ্ধ মতো সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। এই তো সেদিন ওর সঙ্গে বিতানের কথা হ'য়েছিল,

—তুই এমন অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছিস কেন রে সন্তু?

—তোমাদের স্বাভাবিক জগতটা আমার কাছে একেবারে অচেনা হ'য়ে গেছে জানদা। ওখানে আমি আর ফিরব না।

—পাগলামি ছাড় তো। বিতান ধমক দিয়েছিল। তারপর ওর পিঠে হাত রেখে ব'লেছিল, তোর ওপর অনেক দায়িত্ব রে সন্তু।

—আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। বড় বিষণ্ণ হাসি হেসে সন্তু স্বগতোক্তি-ভাবে ব'লেছিল, ওয়াটার লু'র যুদ্ধে নেপলিয়ানের হার হ'য়েছে জানদা।

হরিধ্বনি দিতে দিতে ওরা চ'লে গেল। বিতান দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আঙিনের বিকেল পালাই-পালাই করছে। নারিকেল গাছের মাথার বাসী হলুদের মতো রোদ্দুর। দোলন-চাঁপার ঝোপে ঝোকা ঝোকা সাদা ফুল। তাদের চারপাশে আধকোটা ফিঙে ফুলের মতো অনেকগুলো হলুদ প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের কোনো দুঃখ নেই। মানুষের শুধু দুঃখ—শুধুই দুঃখ।

কামাক স্ট্রীটের কোনো এক সওদা-গরী অফিসে টুকি রিসেপসনিস্টের কাজ করে। সবাই বলে ওসব কাজটাজের কথা মিথ্যে। আসলে টুকি নাকি ইয়াঙ্কি হ'য়ে গেছে। হোকগে। টুকির তো কোন দোষ নেই। জাইস্ক্যাপার সত্যটাইড়ো থেকে রিভ কলটিনেন্টালের নীচে নাঙ্গর করিয়েছে। দোষীতো আমরাই। আমরাতো ওর অন্ন সংস্থান ক'রে দিতে পারিনি। পারিনি ওর সামনের অন্ধকার পর্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে ওর জীবনে একমুঠো আলো এনে দিতে। তাহ'লে?

রোজ সন্ধ্যের পর ও নাকি রিজের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। থাকুকগে। নেহাৎ বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে যে কোনো কাজই মানুষ ক'রতে পারে। তার জন্যে তাকে ঘৃণা করা মস্ত অপরাধ।

ইলানীং বিতানের সামনা-সামনি প'ড়লেই টুকি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিতান দেখেছে, তখন ওর গভীর চোখ দুটো ছলছল করে। চোখের কোলে জল এসে যায়। টুকি তো জানে না বিতান আজও ওকে ভালবাসে, শুধু ওকেই ভালবাসে।

সময়ের জিপসী বুড়োটা আজকাল মাঝে মাঝেই বিতানের বুকের ভিতরে আজব বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে বলে, সময় ফিরিয়ে নিবি? ওরে নিবি নাকি? বিতান ভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মের দলের মতো কৈশোর আর সদ্য যৌবনের সেই সুবাসিত ভালমন্দহারা দিনগুলো সত্যি যদি আর একবার ফিরে পাওয়া যেত। যেখানে একটা নিশ্চারী নৌকার পালের মতো তার হলুদ শাড়ির আঁচল উড়িয়ে কাঠবিড়ালীর পিছনে ছুটছে, আর দোলাপজাম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটা অল্প বয়সের ছেলে হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে, 'টুকি!!!টুকি...ই ... ই।'

শারদীয় ধনধান্যে

কয়েকটি বিশেষ রচনা

ছেলেবেলার
অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবীচিন্তা
অমিতাভ চৌধুরী

পরে কলকাতার পুজা-নামতা
সুভাষ সমাজদার

পূজার অর্থনীতির রূপান্তর
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

বিজয়ন্তী
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মাটী টাকা, মাটী থেকে টাকা
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁরা দেবতার ফুল তোলেন
কিন্নর রায়

পুরোহিতরা কেমন আছেন
সুধীর বিশ্বাস

গ্রাম বাংলার দুর্গোৎসব
অমিতাভ চক্রবর্তী

গল্প লিখেছেন

দেবব্রতী
নিরীহকুমার মুখোপাধ্যায়
রূপজিৎ ভট্টাচার্য
সুমঙ্গলা ঘোষ

কবিতা লিখেছেন

হরপ্রসাদ মিত্র
কৃষ্ণ ধর
নচিকেতা ভরদ্বাজ
মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত
বীরেন সাহা

বিশেষ রচনা

নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রের শেষ দিনগুলি
মকবুল চন্দ্র পতি

এ ছাড়া আরো অনেক আকর্ষণীয় রচনা, ছবি ও স্কেচ

দাম এক টাকা

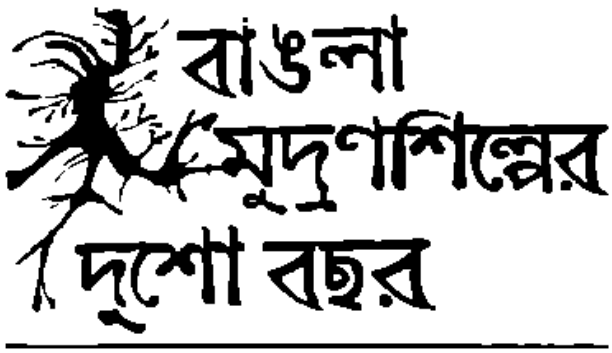

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ভারতবর্ষে প্রথম ছাপাখানায় প্রবর্তন করেন পোর্তুগীজরা। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ ভারতের গোয়া অঞ্চলে বসতি করেন। এর কিছুকাল পরে তাঁরা ইউরোপ থেকে দুটি মুদ্রাযন্ত্র আনিয়ে নেন এবং একটি যন্ত্রে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মবিষয়ক একটি বই পোর্তুগীজ ভাষায় রোমান হরফে ছাপা হয়। ভারতবর্ষে ছাপানো এই বইটির হদিস গবেষকরা আজও করে উঠতে পারেননি। এর আগের বছরও একখানি নাকি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তারও কোনো হদিস মেলেনি। ১৫৬১ পর্যন্ত গোয়াতে ছাপা এইরকম পাঁচখানি বই বেরিয়েছে যা এখনও কারুর হাতে পড়েনি। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ছাপা একটি বই—Comperdio Spiritual Da Vida Christa পরের বছর লণ্ডনে নীলামে বিক্রি হয়েছে। এটি এদেশে প্রথম ছাপা বই, কিন্তু আছে মিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে। এরপর কুইলন (এখন কেরালা রাজ্যে) থেকে বেরোয় ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে—প্রথম ভারতীয় ভাষার ছাপা বই Doutrina Christa। মালাবারালাম-তামিল হরফে এটি ছাপা। এর পর বই ছাপা কেন্দ্র আবার উত্তরে এগিয়ে যায় কোচিনে। তারপর দক্ষিণে নেমে পুডি-কাইল ভিপিকোট্টা, আম্বলাকাড, ট্রাংকুইবার এবং মাদ্রাজ হয়ে শেষে বাঙলা দেশে হুগলী। এর মাঝে মাঝে আরও দুচারটি কেন্দ্র খুব সম্ভব তথ্যসন্ধানীদের অপেক্ষায় আছে।

তাহলে ভারতের দক্ষিণে মালাবারালাম-তামিল হরফেই প্রথম এ দেশী বই বেরোলো ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে। এক স্পানীশ পাদ্রী অক্ষর তৈরি করে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের Doutrina Christa বই-এর অনুবাদ 'ক্রীস্তী বন্দনম' ছাপালেন। সেই সময় থেকে ঠিক পুরো বছর বাদে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হলো হ্যালহেডের ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengali Language

১৭৭৮ সালটি স্মরণীয় বছর। এই সালেই বাঙলা দেশের হুগলীতে ছেনি-কাটা বাঙলা হরফে ছাপা আরম্ভ হয়। কাজেই আপাততঃ যা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই বছর থেকেই এদেশে বাঙলা অক্ষরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ রয়েছে। তবে মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাঙলা ভাষার পরিচয় হুগলীতে নয়—লিসবনে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দেই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ', 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' আর একটি বাঙলা ব্যাকরণ ও পোর্তুগীজ-বাঙলা শব্দকোষ—তিনটিই ছাপা হয় লিসবনে। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে'র লেখক আসলে বাঙালী। যদিও তাঁর নাম দোম আন্তনিয় দা রোজারিও—তিনি আসলে ভূষণার রাজপুত্র, মগের হাতে পড়ে দেশান্তরিত ও ধর্মান্তরিত হয়ে রোমান ক্যাথলিক। অন্য বই দুটির লেখক পাদ্রী মনোএল দা আসুম্পসাম্। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' যদিও ছাপা লিসবনে কিন্তু বইটির ভূমিকা থেকে দেখা যায়, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তাওয়ানে পরদেশার নামরীতে লেখা। মূল পোর্তুগীজ অংশ মনোএলের লেখা। সত্যজীবন লাসের মতে তিনি সম্ভবতঃ দেশীয় কোনো খৃষ্টানকে দিয়ে বাঙলা অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন।

এছাড়াও লণ্ডনে খুব সম্ভবতঃ ১৭৬৫ (সুশীলকুমার দে আরও কয়েকবছর পরে বলে মনে করেন।) খৃষ্টাব্দে বেপ্টো দি সেলভেস্ত্র বা তিসুভার লেখা দুখানি বই-এর উল্লেখ পাওয়া যায়—'বুক অব কমন প্রেয়ার' এবং 'ক্যাটেকিজম্'। এই দুটি বই যথাক্রমে 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নোত্তরমালা' নামে রোমান অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় বলে শোনা যায়। কিন্তু বই দুটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় কারুর হয়নি। যাই হোক ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বইগুলি এবং পরেকার দুখানি বই সবই রোমান হরফে ছাপা। সেদিক থেকে হুগলীতে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপানো নিশ্চয় মুদ্রাযন্ত্রের সূচনা করেছে।

অবশ্য হুগলীতে ছাপাখানা হওয়ার আগে কোনো কোনো বইতে বাঙলা হরফ ছাপা হয়েছে কিছু কিছু। কাঠের ফ্লাকে ছাপা, চলমান মেটাল টাইপে নয়। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে আমস্টার-ডাম থেকে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খর (Athanasius Kir-cher)-এর লেখা China Illustrate বইতে বাঙলা লিপির নমুনা পাওয়া যায়। প্রীতিভাজন বন্দ্যোপাধ্যায় শারদীয় মুদ্রাযন্ত্রের ১৩৭৭ -এর সংখ্যায় এই বইটির প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে শুধু সংবনামধন্য বর্ণমালার প্রথম প্রতিলিপি নয়, বাঙলা লিপির নমুনাও পাওয়া যায়। স্টীলহফের লেখা 'যখন ছাপাখানা এলো' (১৯৭৭) বইতে এই বাঙলা লিপির একটি সুন্দর ফটোকপি দেওয়া হয়েছে। এর পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ছাপা একটি বইতে বাঙলা অক্ষরের প্রতিলিপি আছে। বাঙালি অক্ষরের প্রতিলিপির সঙ্গে সেগুলি দেওয়া হয়েছে। বইটি এদেশীয় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যার পর্যালোচনা। লেখকেরা হলেন জেসুইট যাজক। বাঙলা অক্ষর প্রতিলিপির তৃতীয় নমুনা পাই জার্মানীর লাইপৎসিগ শহরে ছাপা (১৭২৫) জেওর্গ জাকোব কের (Georg Jacob Kehr)-এর ল্যাটিন ভাষায় লেখা 'Aurenk Seb' বইতে। এই বইতে ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাঙলা সংখ্যা, বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বাঙলা অক্ষরে ছাপা একটি জার্মান নাম 'শ্রী সরজন্ত বল্‌ফ্‌গাং মায়ের' (Sergeant wallfgang meyer) পাওয়া যায়। এর পরেই ১৭৪৮ সালে লাইপৎসিগ্ থেকেই ছাপা যোহান ফ্রীড্‌রিস ফ্রিৎস (Fritz)-এর লেখা 'Orientalisher and Occidentalischer

Sprachmeister' বইটিতে কের-এর বইতে দেওয়া বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণের চিত্রলিপিটিই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ১৭২৫ খৃস্টাব্দের পরেই ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে হলহেডের লাইডেন শহর থেকে তেন্তিত মিল ল্যাটিন ভাষায় Dissertationes Selectae নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Jonas Ketelaer -এর লেখা miscellanea Orientalia নামে হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ অংশে বাঙলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুটি আলাদা শ্লেটে ছাপা আছে। জোনাস কেটেলের নিজে ডাচ ছিলেন এবং ডাচ ভাষাতেই তাঁর ব্যাকরণ লেখেন। তেন্তিত মিল ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। কেটেলের লিখিত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয়নি।

বাঙলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্পর্কে তেন্তিত মিল তাঁর ল্যাটিন ভূমিকায় লিখেছিলেন:

> আমি আরও দুটি বর্ণমালা হাস্তুক্তকে যোগাই করেছি—ব্রাহ্মণদের বর্ণমালার পরিচয় হিসেবে সেটি মুদ্রাঙ্কন করে বিবেচিত হবে।... টেবল III B তে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা (অর্থাৎ বাঙলা) দেখানো হলো তা সমস্ত ভারতবর্ষে—বিশেষ করে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে রাখা এই বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতিত অংশটি সজনীকান্ত দাস উদ্ধৃত করে প্রশ্ন রেখেছেন, ব্রাহ্মণ বর্ণমালা বা বাঙলা অক্ষর কী সমস্ত ভারতবর্ষে কখনো ব্যবহৃত হতো? খুব সম্ভবতঃ পূর্বভারত অর্থাৎ ভারতের অনেকখানি জুড়ে এই অর্থেই এখানে নিতে হবে। এর পরে ইংরেজি টাইপ নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনের কথা বলতে হয়। ১৭৭৩ সালে তাঁর অন্যান্বেষী উইলিয়াম বোল্টস্ জ্যাকসনকে দিয়ে লণ্ডনে ছাপিয়েছিলেন 'মডার্ণ স্যাংস্কৃট' বা বাঙলা হরফের নমুনা। কিন্তু বর্ণমালার চেয়ে বেশি দূর এগোতে তিনি পারেন নি।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের। ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁর অনূদিত A Code of Gentoo Laws বইটিতে দুটি আলাদা শ্লেটে বাঙলা ও হিন্দী বর্ণমালা ছাপা হয়েছে। এই ছাপাও লণ্ডনে। তখনকার হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ছাপার ঠিক দুবছর আগে। এর পরেও ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত আর একটি বই-এর সন্ধান দিয়েছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বইটি ফ্রান্সিস ল্যাডউইনের 'আইন-ই-আকবরী'র একখণ্ড অনুবাদ। এই অনুবাদের শেষে 'অ্যান এশিয়াটিক ভোকাবুলারি' নামে ল্যাডউইনের প্রস্তাবিত আরও একটি বই-এর বিস্তারিত বিজ্ঞাপন আছে। গ্রাহকদের দেখাবার জন্যে নমুনা হিসেবে ইংরেজী, সংস্কৃত এবং দেবনাগরী লিপির সঙ্গে তিনি বাঙলা লিপির নমুনাও ছাপিয়ে দিয়েছেন। চার পাতা জুড়ে রয়েছে এই বাঙলা লিপি। সবই শ্লেটে। হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ ছাপার আগে এই বাঙলা ছাপা অক্ষরগুলি এক একজনের হাতের লেখার নকলে কাটা বলে সবই একরকম নয়।

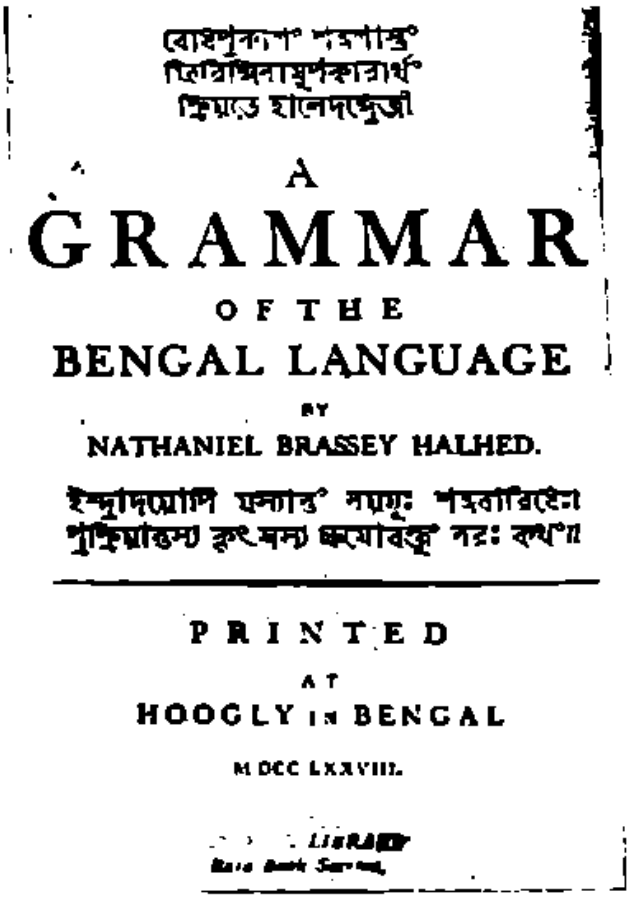

কৈতিহ্যপূর্ণা পরম্পরাং
ছিন্দিত্বিনামুপকারার্থং
ক্ষিপ্যতে হালেদক্রুতা

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ
কৃৎস্নমাত্মস্য কৃৎস্নস্য ক্রমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY in BENGAL
M DCC LXXVIII.

Library
West Bengal Secretariat

কিন্তু হ্যালহেডের ব্যাকরণেই (১৭৭৮) প্রথম ব্যক্তিগত কৌশলে সুসম্পন্নভাবে এক ছাঁচে ঢালা হরফের দেখা পাওয়া গেল। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ করে তুলবার জন্যে হ্যালহেড 'এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' লিখেছেন। বইটি লিখে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে তিনি তার ছাপার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। বাঙলা ব্যাকরণ ছাপার কাজে তখন বাঙলা হরফ অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্সকে বইটি ছাপার কাজে ডাকেন। হেস্টিংস জানতেন উইলকিন্স্ নেহাতেই অবসর বিনোদনের জন্যে ছেনি কেটে দু-একটি বাঙলা হরফ তৈরি করেছিলেন। বন্ধু হ্যালহেডের বই ছাপবার জন্যে উইলকিন্স্ খুব উৎসাহিত হলেন। হ্যালহেড ও উইলকিন্স্ দুজনেই হুগলীর ইংরেজ কুঠিতে কর্মচারী। উইলকিন্স্ হরফ প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্মকার নামে স্থানীয় এক কর্মকারের সাহায্য নিলেন। পরবর্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষতা অর্জন করেন এবং তাঁর জামাতা মনোহর টাঁকশালপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর তৈরি করেছিলেন। এখন পর্যন্ত বাঙলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত তা পঞ্চানন ও মনোহর নির্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। কাজেই প্রথম বাঙলা বই ছাপার কাজে এমন কি এই পূর্বাঞ্চলে প্রথম বই ছাপার কাজে আধা-সোতা পঞ্চাননই ছিলেন উইলকিন্সের সহকারীর ভূমিকায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা ভালো। সজনীকান্ত দাস বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেকের যে ধারণা

গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হতো তা কিন্তু ঠিক নয়। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের বাঙলা মুদ্রিত বই এবং সে সম্পর্কে ইতিহাস যেটে মোটামুটি নিঃসংশয় হওয়া গেছে যে সেকালে বাঙলা ভাষার একটি বইও কাঠের হরফে ছাপা নয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণ থেকে সুরু করে সব বাঙলা বই-ই ছেনিকাটা ছাঁচে ঢালাই করা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। অনেকে কাঠি হরফগুলি সমান ও সুপুষ্ট নয় বলেই এমন ভুল ধারণা প্রচলিত হয়ে গেছে।

যাই হোক, হ্যালহেডের ব্যাকরণ 'হুগলীর যে ছাপাখানায় ছাপা হয়েছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। সম্প্রতীকার হজসন সাহেবের (কোর্ট উইলিয়ামের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি) একটি দরখাস্তের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স্-এর পরিচালনায় কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা কাজে লাগানো হয়নি। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেম্স্ অগাস্টাস হিকী তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' ছাপার জন্যে কলকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গল গেজেট' বেরোবার কিন্তু আগেই ছাপাখানাটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কাজেই ধরা যেতে পারে হ্যালহেডের ব্যাকরণ হুগলীতে যখন ছাপা হচ্ছে তখনই কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও গেজেট প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। যাই হোক হিকির গেজেটের প্রকাশ শুরু হতেই কয়েকমাসের মধ্যে হিমেসিপ্লক ও দিতীয় রীতে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' বার করলেন। আর এর বছর তারেক বাদে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ল্যাডউইন 'দি কলকাতা গেজেট প্রেস' স্থাপন করলেন। সরকারের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানাতেই হতো। তাই বলে এইটাই সরকারী ছাপাখানা নয়। নানা প্রেসে ছাপা হতো। ৩৭নং ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে শুরু করে ৩৮নং পোলোংগমবর স্ট্রীট পর্যন্ত তা এসে পৌঁছেছে। ল্যাডউইনের ছাপাখানারও ঠিকানা বদলের খবর আছে সীটন-কার সম্পাদিত কলকাতা গেজেটের নির্বাচিত সংকলনের প্রথম খণ্ডে।

১৭৭৮ থেকে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকটি বই ছাপা হলো। প্রথম হলো কলকাতার দি অনারেবল কোম্পানির প্রেস থেকে প্রকাশিত জোনাথন ডানকানের Regulation for Administration of Justice, in the Courts of Dewanee Adaulut-এর অনুবাদ। এই আইনের বইটির অনুবাদ বাঙলা ভাষার ইতিহাসে খুবই মূল্যবান বই। বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত এইটিই প্রথম সম্পূর্ণ সাদার বই। এই বইটিই 'ইন্দো কোড' নামে প্রসিদ্ধ। দিতীয়টি হলো ওই একই প্রেস থেকে ১৭৯১ সালে ছাপা এন.বি. এডমনস্টোনের ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আইনের বাঙলা অনুবাদ। ১৭৯২ সালে ওই প্রেসেই ম্যাজিস্ট্রেটের গাইড বুক হিসেবে আর একটি আইনের বই-এর অনুবাদ হয়। ১৭৯২-তেই ঔইলিয়াম জোন্সের সম্পাদিত কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—'দি শীজুন্স্' নামে বাঙলা হরফে ছাপা সংস্কৃত বই ছাপা হচ্ছে। ১৭৯৩ সালে হেনরি পিট্স্ জন্সটারের 'শ্রীযুক্ত নবাব গভর্নর বাহাদুরের আজ্ঞা মোতাবেক সৈনিক-সেনের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন' অনুবাদ প্রকাশিত হলো সরকারী প্রেসে। ছবছর বাদে এই জন্সটার-ই ইংরেজী ও বাঙলা ভোকাবুলারির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। কোরিস এণ্ড কোম্পানির প্রেসে ছাপা হলো। এর আগে ১৭৯৩ সালেই এ. আপজন প্রকাশ করেছিলেন দি ক্রনিকল্ প্রেস থেকে 'ইংরেজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি।' ১৭৯৭ সালে জন মিলার প্রকাশ করলেন দি ইউটর বা 'শিক্ষাগুরু'। এইভাবে দেখা যায়, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ছাপাখানা বসাবার আগেই কলকাতার বেশ কয়েকটি ছাপাখানা বাঙলা টাইপে মূল্যবান বই প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্যে ছাপাখানা ব্যবহার করার আগেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্যে ছাপাখানার বাঙলা-ইংরেজি অক্ষরমালা ছাপিয়ে শাসক ইংরেজদের দেশীয় জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

এরপরেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮০০ সালে। ওই বছরেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন হয়েছে। এর পর ছাপাখানা কী কাণ্ড করেছে তার ইতিহাস বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই জানা। উইলি নামে এক নীলকর সাহেবের কাছ থেকে মিদিরপুরে নীলগঞ্জে ছেলেবেলা পাওয়া একটি কাঠের ছাপাখানা কিনে নেন উইলিয়াম কেরী। ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ প্রথম পুরুষ ওঠে, আদমেট ছাপা শেষ হয় রামরাম বসু ও টমাস অনূদিত মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত। ছাপাখানার পরিচালক ওয়ার্ড নিজেই কম্পোজিটরের কাজ করেন। সাহায্য করেন কেরীর চোদ্দ বছরের ছেলে এবং ব্রানসুজন নামে এক ইংরেজ। তারপর থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চল্লিশটি ভাষায় দুলক্ষ বারো হাজার বই ছেপে বেরিয়েছে। একের মানসিক সম্পদ হাজার-লক্ষ মানুষের মনে ছড়াতে শুরু করেছে এইভাবে। এবং শ্রীরামপুরের এই অপূর্ব বঙ্গ-কৌশলের প্রবর্তনায় যে বাঙালী পরিবার বিশেষভাবে ভূমিকা নিয়েছিল সে পরিবারের আদিপুরুষ পঞ্চানন কর্মকার। তারপর মনোহর। তারপর কৃষ্ণচন্দ্র। কেরী যখন বিলেতে বাঙলা বই ছাপাতে দিয়ে দেখলেন অনেক খরচ তখন পঞ্চানন সস্তায় হরফ তৈরি করে দেবেন বলে এগিয়ে আসেন। পঞ্চাননের এই আত্মবিশ্বাসেই ছাপাখানার শুভযাত্রা শুরু।

ছাপার মতো ছবির ব্লক তৈরিতেও ধীরে ধীরে উন্নতি দেখা দিয়েছে খুব সম্ভব উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। পরে বিলেত থেকে ব্লক আনিয়ে সচিত্র পত্রিকা বেরিয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'। ধীরে ধীরে কাঠ-খোদাই, ধাতু খোদাই, শিখো হাফটোন ব্লক। এই হাফটোন ব্লকের সঙ্গে আর একজন বাঙালীর নাম জড়িয়ে আছে। তিনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গত কয়েকমাসে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশনগুলি প্রায়ই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোচনা ছাড়াও হরিজনদের ওপর অত্যাচারের বিষয়কে নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার বাদানুবাদ হয়েছে। এই উভয়ের প্রতিফলন সংবাদপত্রের পাতায়ও ঘটেছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও হরিজন নিগ্রহ কমেছে বলার জন্য জবাবদিহি করা হবে। কিছুদিন আগের আচার ঘটনা দিকেই শুরু করা যাক। কয়েকদিনের তাণ্ডবলীলায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। হরিজনদের অনেক বাসস্থান ধূলিসাৎ হয়েছে। এসত্ত্বেরের প্রথমদিকে বিহারের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর রাজ্য বিধানসভায় হরিজনদের জন্য শতকরা ২৬ ভাগ চাকুরী সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করলে সারা রাজ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতি—হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, গুলি ও কাঁদানে গ্যাস। সদ্য সদ্য ঘটেছে তামিলনাড়ুর ভিলুপুরাম। এখানকার পোলসোপ ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই হিংসোত্মক ঘটনায় বলি হয়েছে বেশ কয়েকজন। আর মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গ-

বাদে যে ঘটনার শুরু, তার আগুনও জ্বলেছিল বেশ কয়েকদিন। এ ঘটনার পেছনেও ছিল একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত—ডারাতে হরিজন সমাজের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁর কণ্ঠস্বর সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল সেই ডাঃ বি. আর. আম্বেদকরের নামে মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঝড় উঠেছিল। দেখা দিয়েছিল তীব্র ছাত্র অসন্তোষ। এখানেও ঘটনাবলী সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। প্রাণহানি এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেও ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন: হরিজনদের ওপর এই অত্যাচার কবে বন্ধ হবে? কবে হরিজন আপনজন হবে আমাদের? স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরেও এই অত্যাচার হাজার প্রতিকারের আশ্বাস সত্ত্বেও বন্ধ করা যায়নি। বিশাল ভারতবর্ষের ছয় লক্ষ গ্রামের ৫১ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ২০জনই তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারী, বেসরকারী এবং অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ হয়েছে, কিন্তু এই নিগ্রহ রোধ করা যায়নি।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের বিশেষ কয়েকটি রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সুখের কথা, তিনটি রাজ্য—কেরালা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু এদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলো—তামিলনাড়ু, হরিয়ানা এবং বিহারে এই পরিস্থিতির কোনো প্রতিফলনই ঘটেনি। এই তিনটি রাজ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং অন্যান্য জায়গায় রাজনীতি তপশীলিজাতিভুক্ত মানুষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই হরিজন নিগ্রহরোধের সরকারী ব্যবস্থায় বিরোধীপক্ষ খুশী হবেন এটা আশা করা যায় না। বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের(ই) সহ-সভাপতি যজ্ঞেশ্বর রায় তো খোলাখুলিই জানিয়েছেন যে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর হরিজনদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। তাঁর দাবি হরিজনদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে যে দাবি ডাঃ আম্বেদকর অনেক আগেই জানিয়েছিলেন। তিনি এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে সরকার এই অত্যাচার প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবেন। অবশ্য এতকথার পরও শ্রীরাম কিন্তু বলেননি তাঁর দল ক্ষমতাশীন থাকায় সময় হরিজনদের রক্ষাকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা কতদূর সফল হয়েছিল। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এবং এই সমাজের প্রতিনিধিদের জন্য অনেক সুবিধাদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি।

অবশ্য হরিজনদের স্বার্থ রক্ষায় জনতা সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন বললে ভুল বলা হবে। ক্ষমতায় আসীন হয়েই তাঁরা সঙ্কল্প নিলেন যে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা হবে। এই সিদ্ধান্ত এই সময় সীমার মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার একটি সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই মুখ্য-মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রথম সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, সরকারের প্রথম কর্তব্য তপশীলি সম্প্রদায়ের অবহেলিত মানুষদের উন্নতি-বিধান। এ সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বনে দ্বিধা করলে তিনি যে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবেন না সে হুশিয়ারি ও তিনি দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে এই উদাও আহ্বান জানিয়েছিলেন—আপনারা সমাজের এই দুষ্ট-ক্ষত ও পুরোনো ব্যাধি—অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূরীকরণ সচেষ্ট হোন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই আগাছা নির্মূল করতে উদ্যোগী হোন।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গতবছরের জুলাই মাসে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চরণ সিং এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বর্তমান রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ধনিক লাল মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে বার বার লিখে জানালেন সরকারী উদ্যোগের কথা। মোটামুটিভাবে এই চিঠিগুলোর মধ্যেই সরকারী কর্মসূচী, যা ছটি পন্থায় বিস্তৃত, তা ঘোষণা করা হলো। মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী বললেন, কোন জেলায় হরিজন নিগ্রহের ঘটনা রোধের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে সেখানকার জেলা সমাহর্তা ও পুলিশ অধিকর্তাদের। দ্বিতীয়ত হরিজনদের জমি দখল একটি আইনানুগ অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে যাতে প্রয়োজনবোধে পুলিশ এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে পারে। এ হল ছয় দফা কর্মসূচীর প্রথম দুটি দফা। তৃতীয় দফা হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সপক্ষে রাজ্যে রাজ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন যা শ্রী চরণ সিং করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে গত বছরের অক্টোবর মাসে। এর অব্যবহিত পরেই শ্রী ধনিক লাল মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে রয়েছে আরো তিনটি দফার বয়ান। যেখানে তপশীলি জনগণের উপর নিগ্রহ হইবে সেখানে বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করবার অনুরোধ জানান হল। এই বাহিনী উপদ্রুত অঞ্চলে ছুটে গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনবে এবং এই ঘটনাবলীর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার দিকেও লক্ষ্য রাখবে। মুখ্যমন্ত্রীদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রাজ্য পর্যায়ে বিশেষ সেল গঠন করবারও প্রস্তাব রাখা হল। তপশীলিভুক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব থাকবে এই সেলের। এ ছাড়া জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও পাঠান হল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী হরিজনদের উপর সমস্ত অত্যাচারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং প্রতিরোধের কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।

এখন বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ কি-রকম হয়েছে তার একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। ১৯৫৫ সালে সমাজের অবহেলিত মানুষদের, বিশেষ করে হরিজনদের রক্ষাকল্পে প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটস এ্যাক্ট পাশ হয়েছিলো। সিভিল রাইটস আইন আরো সক্রিয় করার জন্য ১৯৭৬ সালে কতগুলো সংশোধনী ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এই আইনের ধারাগুলো বলবৎ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ সরকার এই আইন প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ সেল গঠন করেছেন। এ ছাড়া অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই কতগুলো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় হরিজনদের আইনগত সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে। গুজরাট সরকার বিশেষ বিশেষ স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করেছেন যাতে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত মামলাগুলোর তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করা যায়।

সরকারের ধারণা হল, হরিজন সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা নিলেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এ কথা মনে রেখেই নতুন প্রচেষ্টায় এই সমাজের মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় কতগুলি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে এদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়েই হরিজন-কল্যাণ কর্মসূচীর জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালে বরাদ্দ ১৩.৪৩ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে ১৮.৭৯ কোটি টাকা স্থির হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ঋণের এক তৃতীয়াংশ তপশীলভুক্ত লোকেদের দিতে। এই ঋণ সহজ সর্তে দেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থার সুফল যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো শ্রী ধনিক লাল মণ্ডলের নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন। বিভিন্ন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে এই গ্রুপ সুপারিশ করেছেন, যেসব রাজ্যে হরিজনের সংখ্যা বেশী, সেখানে একটি হরিজন উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন করতে হবে। অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে এই ধরনের কর্পোরেশন আগেই গঠন করা হয়েছিলো। এগুলোর কাজকর্ম পর্যালোচনা করে ওয়ার্কিং গ্রুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই সমস্ত সংস্থা নিজেদের কাজকর্মেই ঠিকভাবে এগুতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গেও তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাসের নেতৃত্বে এরকম একটি কর্পোরেশন গঠিত হয়েছিলো। অনেক প্রচার ও গালভরা আয়াস সত্ত্বেও কাজকর্ম যে আশানুরূপ হয়নি তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যাপারটা চলতে দিয়েছেন। অবশ্য অন্ধ্র রাজ্যের কর্পোরেশনটি এর ব্যতিক্রম। সেখানে সত্যিই উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে।

দারিদ্র্য অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী, এই সব কর্পোরেশন নিজেরা প্রত্যক্ষ-ভাবে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ না নিয়ে অন্যান্য সংস্থাকে সাহায্য করবে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যে সমস্ত ব্যক্তি বা সংস্থা জড়িত আছেন তাঁদের মধ্যে সংযোগ রাখার চেষ্টাও করবে। প্রারম্ভিকভাবে রাজ্যে কর্পোরেশনের একটি মূল শাখাই কাজকর্ম করবে। প্রয়োজনবোধে জেলাস্তর এবং ব্লকস্তর পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটানো যেতে পারে।

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সড়ক সমাচার

অতীন সরকার

কয়েক বছর আগে নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত "কৃষ্ণনগর" পীঠস্থানের অদূরে বঙ্কিমধাম হিজলডাঙ্গায় গিয়েছিলাম। সময়টা শরৎকাল। কিন্তু তখনো জল-কাদায় বেশ চাঁড়াচাঁড়া অবস্থা। ঐ গ্রাম থেকে তারাপুর ফিরবার সময় খাদ্য বাস রাস্তার প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ৫০ মিটার রাস্তা খারাপ দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যপথ না থাকায় ঐ কাদার মধ্যে নেমে কয়েক মিটার গিয়ে দেখলাম কাদাই চাঁইর ওপরে। তার ওপর জল আরও এক ফুট। এভাবে ঐ কয়েক মিটার রাস্তা এসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তবে বাকি পথ হাঁটতে হয়েছিল। গ্রামবাসীদের কাছে শুনেছিলাম ঐ সব গ্রামের মানুষ, যাঁরা শহরে, এমন কি কুলিয়া স্টেশন হয়ে কলকাতায় যান, তাঁরা বাড়ী থেকে বের হবার সময় গামছা আর লোকসমাজে পরার মত কাপড়চোপড় হাতে নিয়ে চলেন। কাদার রাস্তা পার হয়ে পুকুর থেকে পরিষ্কার হয়ে সাজে চড়েন।

এমনি আর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণার হাকিমপুরে। পীচের বিকেলে মাঠ আর রাস্তা সাদা ধুলোর মেঘে ঢাকা। দুহাত দূরের কিছু আগে পরুর গাড়িও চোখে দেখা যায় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। পাশে সরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। পরুর গাড়িও সরতে পারে না। গাড়ির চালক চোখে রাস্তার দুপাশে একফুট চওড়া একফুট গভীর খাত। এই ঘটনা কয়েকবছর আগেকার হলেও রাস্তার অবস্থার এর থেকে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রধানত দুটি প্রয়োজনে রাস্তা সরকার। প্রথমত, পরিবহন ও যোগাযোগ। দ্বিতীয়ত, রাস্তা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান। পরিবহন ও যোগাযোগের উপযোগিতার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আর কর্মসংস্থানের দিক থেকে বলা যায় ২২০০ "মানুষ বর্ষ" লাভ করেন ভারতের এই-পাকা রাস্তায়। স্বাধীনতা-উত্তর ৩০ বছরে গ্রামে রাস্তার উন্নয়ন একাজে কৃষিনির্ভর না হলে রাস্তার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের যে আরও উন্নতি হত তা বলাই বাহুল্য। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক থেকে রাজস্ব আদায় বিপুলভাবে বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে সড়ক জলপথ থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২২০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪১৭২ কোটি টাকা।

বন্যাত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য এক আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন: পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা বন্যাবিধ্বস্ত—লক্ষ লক্ষ মানুষ এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদের সুযোগসুবিধা অবশ্যই দেখতে হবে। ঘর-বাড়ী জমা সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বিপুল, এবার এই বিপর্যয় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। রাজ্য সরকার তার সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে এই দুরবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য যা কিছু সম্ভব তা করেছেন এবং করছেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও সাহায্যের জন্য আবেদন করেছি। তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ, খাদ্যশস্য ও ওষুধপত্র, জিপ, ট্রাক্টর প্রভৃতি যানবাহনের প্রয়োজন। এছাড়া সরকারী কাজে —হেলিকপ্টার, মিডিয়াম সাইজ ক্যারিয়ার ও প্রতিষ্ঠান, ওষুধ প্রস্তুতকারক, শিল্পক্ষেত্র ছাড় ও মুকুব, শিফট, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের—সবকিছুর ব্যাপারেও কাছে মুখ্য হয়ে সাহায্য ও জন্য আবেদন জানিয়ে

পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৯৭৯ সালে রাজ্যের সড়কের ৯৫৮ জন্য নয় হাজার কিলো ইঞ্চি তৈরীতে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫ হাজার কোটি টাকা পরিবহন সড়কের ১৬ জন্য রাস্তার জন্য বরাদ্দ করেছে উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজেও সেই চিত্র নিম্নরূপ

সরকারী হিসেবে টাকার অঙ্কে পরিমাণ বেশী হলেও মুদ্রাস্ফীতির ও সড়কের ক্ষেত্রে এ বরাদ্দকৃত টাকায় প্রকল্পগুলি রূপায়ণে হয়ে দেখা যাচ্ছে অবশ্য

রাস্তার জন্য বরাদ্দ

প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	২৪২ কোটি টাকা
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	২৪২
তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	৪৪০
বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)	৩০২
চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)	৮৬৯
পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)	১৫৪৮ ,,

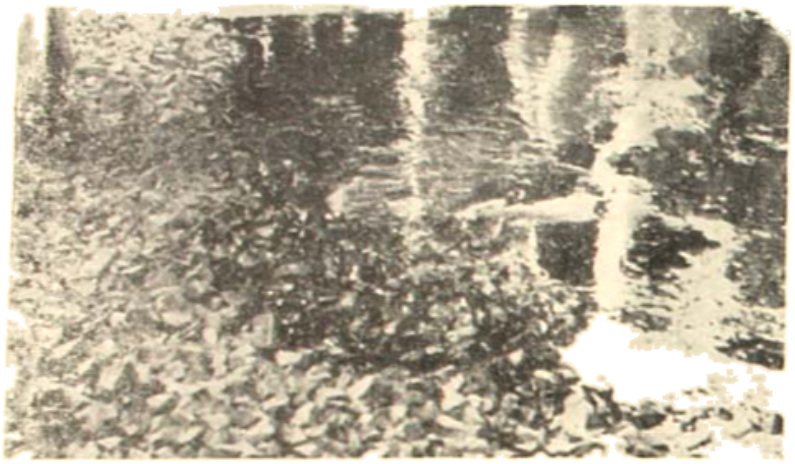

কলকাতার একটি ব্যস্ততম রাস্তা

১৯৩১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে রাস্তার দৈর্ঘ্যও ৪ লক্ষ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সওয়া ১২ লক্ষ কিলোমিটার হয়েছে।

অথচ সরকারী হিসাবেই প্রকাশ—দ্রুত পরিবহন, দূরতম প্রান্তে পৌঁছানো এবং যোগাযোগের জন্য রাস্তার ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ১১.৭ ভাগ পণ্য ও শতকরা ২৫.৮ ভাগ যাত্রীর জন্য রাস্তা ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৪-৭৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ৬৭ ভাগ।

সমাজতান্ত্রিক দেশ তো বটেই এমন কি বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় ভারতে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। অথচ শিল্পোৎপাদনে ভারত এখন শুধু এশিয়াতেই প্রথম সারিতে নয়—বিশ্বেও প্রথম কয়েকটি দেশের অন্যতম। ভারতে প্রতি এক লক্ষ মানুষ পিছু রাস্তার দৈর্ঘ্য ২০ কি.মি. এবং প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পিছু ৩২ কি.মি.। সেখানে পশ্চিম-বঙ্গে প্রতি ১০০ বর্গ কিলো মিটার এলাকার রাস্তা আছে মাত্র ১৫ কিলো-মিটার। আর এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য ৩৩ কিলোমিটার।

এবার দেখা যাক উন্নত দেশগুলির রাস্তার অবস্থা। প্রতি ১০০ বর্গ কিলো মিটার অঞ্চলে রাস্তা আছে ইউরোপে—১৬০ কি.মি., ইংল্যান্ডে—১৫০ কি.মি. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ কি.মি. ও জাপানে ২৮০ কি.মি.। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যা অনুপাতে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ১৫০০ কি.মি., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—২৫০০ কি.মি.।

সহরে, গুদামঘরে ও স্থাপিতের জন্য রাস্তা তৈরীর প্রধান উপকরণ পীচ (অ্যাসফল্ট) ও পাথরকুচি। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের মতো বেশী বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঐ রাস্তা এক বিশেষ অসুবিধারও সৃষ্টি করে থাকে। পীচ থেকে জলের প্রতি পাথরকুচির আকর্ষণ বেশী। ফলে বৃষ্টির জল জমে থাকা বা রাস্তার কয়েক ফুট নীচেই জলের স্তর থাকায় পাথরকুচি পীচ থেকে আলগা হয়ে যায়। তার ওপর ভারী গাড়ির চাকার চাপে তা' সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে সৃষ্টি হয় গর্ত। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে পাকা রাস্তা কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়। ঠিক এই অবস্থাই ঘটে কলকাতার রাস্তায়।

কলকাতা সহরে কাঁচা-পাকা মিলিয়ে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। সংখ্যার দিক থেকে তা চওড়া ও সরু-গলি মিলিয়ে উনিশশ'-এর সামান্য কিছু বেশী। সি. এম. ডি. এ পূর্ব পরিকল্পনা মতো সম্প্রতি জরুরীভাবে রাস্তা মেরামত করেছে। গত জুন মাস পর্যন্ত মেরামত হয়েছে ১০০ মাইল। তবে গলি ও ব রাস্তা এখনও খানাখন্দে ভরা রয়েছে। এতদিন ধরে আইন হিসাবে—ট্রাম লাইন মধ্যবর্তী রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ট্রাম কোম্পানীর। কিন্তু ট্রাম কর্তৃপক্ষ কতটা করতেন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এছাড়া, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, জল ও গ্যাসের জন্য যেমনাই রাস্তা খোঁড়া হয়। কিন্তু মরম বা সাধারণ মাটি চাপা দিয়েই সংশ্লিষ্টগণ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এখন পৌর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে মাটি খুঁড়বে তাকেই সেই অংশ মেরামত করে দিতে হবে। এটা হলে কলকাতা পৌরসভার অর্থ সাশ্রয় হবে। রাস্তাও দ্রুত ভাল হবে। রাস্তা খারাপ থাকা বা রাস্তার নীচু মানের জন্য যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও জ্বালানীর অপচয়ও একটি সামগ্রিক জাতীয় অপচয়।

১৯৬৭ সালে কেলকার কমিটি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, রাস্তার নীচু মানের জন্য বছরে যান-বাহনের জ্বালানী বাবদ অপচয়ের পরিমাণ দেড়শ কোটি টাকার বেশী। গত দশ বছরে রাস্তার জন্য বরাদ্দ কমে যাওয়া, এবং মূল্য সূচক, বিশেষভাবে জ্বালানীর দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার পরি-প্রেক্ষিতে ঐ অপচয় যে দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে তা হিসাব না করেও বলা যায়।

কাজেই জাতীয় স্বার্থেই রাস্তার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার তো বটেই, দরকার আইন-কানুনেরও সংশোধন। যেমন জাতীয় সড়কগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু কোন পৌরসভার এলাকাধীন সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়কের অংশবিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঐ পৌরসভার। কে না জানে দেশের পৌরসভাগুলি অর্থাভাবে পুর-বাসীদের ন্যূনতম প্রয়োজন ও মেটাতে পারে না। এই অবস্থায় জাতীয় সড়কের দায়িত্ব তো কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে।

খেত খামার

পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেলের সমস্যা দীর্ঘ দিনের। এখনো সে সমস্যার বিশেষ কোনো সমাধান হয়নি। রেপসীড তেল আমদানি ক'রে সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ-ছাড়া উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সরষে বা সরষের তেল আনতে হয়। কেননা পশ্চিমবঙ্গে সরষের চাষ আশানুরূপ বাড়ছে না। সরষে চাষের জন্যে চাই দোআঁশ বা পলি বেলেআঁশ মাটি, শীতের আবহাওয়া, নদী খাল বিল পুকুর থেকে, শ্যালো, বা ডিপ টিউবওয়েল বা রিভার পাম্প থেকে জমিতে মাত্র ২।৩ টি সেচের ব্যবস্থা। এগুলি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সবই পাওয়া যায়। অথচ এখানে এই চাষ নিতান্তই প্রাথমিক। এটিও যে একটি অর্থকরী ফসল তা এখানকার কৃষকরা অনেকে মানতে চান না। অনেকের মতে এখানে আলুর চাষ আরো বেশী লাভজনক হওয়ায় কৃষকরা সরষে চাষ করতে চাননা। সুখের কথা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তিল চাষ কিছুটা প্রসার লাভ করছে। কিন্তু শুধু তিল তেল খাওয়া যায় না। ২০-২৫ % সরষে মিশ্রিত ক'রে তিল ভাঙিয়ে তেল করলে তা ভালই খাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সামান্য পরিমাণ সরষেই বা আসবে কোথা থেকে? আগে দেখেছি, আলু জমির ধারে ধারে প্রচুর সরষে বোনা হতো—উপজাত ফসল হিসেবে। এখন সেটা কমে গেছে, আলুর কিছু ক্ষতি হয় তবে। তবে ধনেখালি, তারকেশ্বর, হরিপাল, জাঙ্গীপাড়া প্রভৃতি থানায় এখনো এই ধরণের চাষ যথেষ্টই দেখা যায়।

অনেক উঁচু জমি আছে যেখানে পর্যাপ্ত জলের অভাবে আলুর মত অর্থকরী ফসলের চাষ করা সম্ভব হয় না। এ-ছাড়া অনেক আগাঠা ধানকাটা জমিতে আলু হয় না। সে-সব জায়গায় সরষে চাষ হবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব কটি জেলার মাটিই সরষে চাষের অনুকূল। এ-ছাড়া সারা রাজ্যেই বিভিন্ন-ভাবে ছড়িয়ে আছে গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং রিভার পাম্প। সে-সব জায়গায় কৃষকরা (অন্তত নিজের প্রয়োজন মত) সরষে চাষ করতে পারেন। তাতে রাজ্যের অনেকখানি কল্যাণ। ঐ মিশ্রিত না খাঁটি সরষের তেল

সরষে চাষ বাড়ান

শরীরের পক্ষেও সবচেয়ে ভাল। অনেক সময় দেখা যায় সরষে চাষ সম্বন্ধে বহু চাষী ওয়াকিবহাল নন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির খোঁজ রাখেন না।

আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকেই সরষে চাষ সুরু করা যায়। টোরি বি-৭৪ জাতের সরষে সবার আগে চাষ করা যায়। এজাতের সরষে ৭০-৭৫ দিনেই কাটবার উপযোগী হয়ে ওঠে। রাই বি-৮৩ কার্তিকের মধ্যে চাষ করা যায়। ৯৫-১০০ দিনে ফসল কাটার উপযোগী হয়। টি-৫৯-এর সময় লাগে ১১৫-১২০ দিন। আগ্রেলট মিউটান ১০০-১০৫ দিনে পরিপক্কতা লাভ করে। এছাড়া আছে খেত-সরষেবিন জাতের সরষে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত টোরি বি-৭৪ এবং আগ্রেলট মিউটান জাতের সরষেই চাষের অনুকূল। প্রথমটি আর্লি ভ্যারাইটি বা জাঠো এবং শেষেরটি লেট ভ্যারাইটি বা নাবি। এ দুটিই উচ্চ ফলনশীল জাতের হলেও আগ্রেলট মিউটান অধিকতর উচ্চফলনশীল জাতের।

আলু ক্ষেতের ধারে ধারে সরষে দিলে বাড়তি চাষের ঝামেলা নেই। কিন্তু আগে যে উঁচু জমি বা জাঠো ধান ক্ষেতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে-সব জমিতে সরষে চাষ করতে হলে জমিতে ৩।৪ টি চাষ দিতে হয়। প্রথমে একরে ৮।১০ গাড়ী গোবর সার দিতে পারলে খুবই ভাল হয়। প্রয়োজনে মাটি পরীক্ষা করিয়ে আধুনিক সার প্রয়োগ করতে হবে। মোটামুটি যে হিসেব পাওয়া গেছে তা হলো একরে ১২ কিলো নাইট্রোজেন, ৮ কিলো ফসফেট, এবং ৮ কিলো পটাশ। অবশ্যই জমি অনুসারে এর হেরফের হতে পারে। এবং এমনসালফেট জাতীয় সারেরও প্রয়োজন হয়।

প্রতি একরে ৩-৪ কিলো বীজ (লেনা ছোট বড় হিসেবে) বুনে দেওয়া যায়। অথবা সীডড্রিল দিয়েও বোনা যায়। বোনার আগে প্রতি কিলো বীজে ৩ গ্রাম আগ্রোসেন জি. এম. বা ৪ গ্রাম এপ্রোন ৩৫% গুঁড়ো ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন ক'রে নেয়া দরকার। যে জমিতে উপযুক্ত রস থাকেনা, বোনার সময় তাতে একবার সেচ দেয়া দরকার। এরপর গাছে ফুল আসার সময় একবার জল সেচ করতে হবে। লেনা পুষ্ট হবার মুখে আর একবার। এরপর সরষে চাষে সাধারণত; এর বেশি সেচ লাগে না। টি-৫৯-এ চতুর্থ সেচ লাগে।

সরষে গাছে পোকার উৎপাত খুব বেশি হয় না, তবে হতে পারে। পাতা খাওয়া পোকা, জাব পোকা ও ধসা রোগ সময়ে সময়ে আক্রমণ করে। বোনার ১০।১৫ দিনের মধ্যে পাতা খাওয়া পোকার আক্রমণ হলে বি-এইচ-সি ৫ %. ছড়াতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ১। মি.লি. ডিমেক্রণ বা ১ মি.লি. রোগর বা ১ মি.লি. মালাথিয়ন ৫০° ই.সি. বা ১ মি.লি. মেটাসিসটক্স ২৫° বা ১ মি.লি. মেটাসিড ৫০°. ই.সি.—এই হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। দরকার হলে ১৫ দিন পরে আবার স্প্রে করতে হবে।

সরষে খুব পাকার আগেই তুলে ফেলতে হবে। সপ্তাহকাল প্রায় আঁক দিয়ে রেখে শুকিয়ে ঝাড়াঝাড়ি করতে হয়।

সরষেকে কি আমরা অধিকারী ফসল বলতে পারি? আলুর সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু আলুর মত না হলেও এটিকে একটি অধিকারী ফসল হিসেবে নিশ্চয়ই ধরা যায়। লাঙল, বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ এবং মজুরি সব হিসেব করলে একরে ৬০০-৭০০ টাকার বেশি খরচ হতে পারে না। একরে ৫-৬ কুইন্টাল সরষের ফলন হয়। তাতে ১২০০-১৩০০ টাকার (বাজারের চাহিদা হতে পারে) ফসল পাওয়া সম্ভব। কাজেই টাকায় টাকা আনে এই সরষে চাষে। এতে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি কম। জলের সমস্যা কম। আলু ক্ষেতের পাশে ধারে লাগালে বিনা ঝামেলায় বেশ কিছু ফসল পাওয়া যায়।

বীরেন্দ্র হাজরা

আখের চাষ প্রসঙ্গে

সর্বভারতীয় ইক্ষু প্রতিযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আখের গড় ফলনের জন্য রূপোর শীল্ড পাওয়ার পর থেকেই, এ রাজ্যে আখচাষে একটা উৎসাহ এসেছে। আখের এলাকাও বেড়েছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবে আখচাষের চেষ্টা চলছে।

এ রাজ্যে সাধারণতঃ বছরে দুবার আখ বসান হয়। কার্তিক-অঘ্রাণ-এ একবার, আর একবার ফাল্গুন-চৈত্রে। ফাল্গুনে যাঁরা আখ বুনেছেন, তাঁরা অবশ্য ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় চাপান সার দিয়ে মাটি পোড়ার ফুলে নিকানী নালাও তৈরী ক'রে দিয়েছেন। আশে আশে মাজরা পোকা না লাগে অথবা যদি তার সম্ভাবনা থাকে তবে, একর প্রতি এক কেজি হারে ফিউরাডান দানা ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে হেলি বেঁধে দিলে পোকার আক্রমণ অনেক কম হবে। এছাড়াও এ সময় উঁই, তোরাধসা, তলা ও শেকড় ছিদ্রকারী পোকা, পোকর পোকা, মাকড়, পাইরিলা ইত্যাদি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ হলো :—

(১) পাইরিলার ডিম নষ্ট করার জন্য ১০ শতাংশ বি. এইচ. সি গুড়ো একর প্রতি ২০ কেজি ছেটাতে হবে।

(২) মাকড়ের জন্য এক একরে এক লিটার টাইথিয়ন বা ৮০০ সি. এনড্রিন ৪০০ লিটার জলে গুলে ছড়াতে হবে।

(৩) মাজরা পোকার জন্য একরে ৪০০ মিলিলিটারে একালাক্স ৩০০ লিটার জলে গুলে ছড়ানো ভাল হয়।

(৪) আখের কাণ্ডে গর্ত করে দিলে টাকাডিন ৫০০ মিলিলিটার ১০০ লিটার জলে গুলে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) আই স্পট জাতীয় রোগের জন্য একরে এক কেজি হারে ৮০ শতাংশ ক্যাপ্টান ও ডায়াথেন জেড্-৭৮, ৩০০ লিটার জলে গুলে সপ্তাহে দুবার স্প্রে করতে হবে।

এ সময় উপযুক্ত পরিচর্যা করতে না পারলে আখের ফলন ভাল হবে না। রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণেও আখক্ষেত নষ্ট হতে পারে। তাই মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও নদীয়া জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকগণ চাষীভাইদের এসময় আখের পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে পরামর্শ দিয়েছেন।

জানা গেছে, ১৯৭৮-৭৯ সালে সর্বভারতীয় ইক্ষু প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৫ জন আখচাষী অংশ গ্রহণ করবেন—বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ থেকে।

মুকুল বাগচী

জানা অজানা

১। বম্বে হাই থেকে মূল ভূখণ্ডে যেখানে পাইপ লাইনে তেল আসে সেই টার্মিনাসের নাম কি? দূরত্বই বা কত?

২। আমেরিকায় কটি রাজ্য আছে?

৩। কোন্ স্থপতি নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের নক্সা তৈরী করেছিলেন এবং ঐ ভবন-সংলগ্ন বাকী অংশের নক্সা করেছিলেন কে?

৪। ১৯২৯ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতা সফরে এসেছিলেন, সেসময় তাঁর বিরুদ্ধে কালো পতাকা আন্দোলন পরিচালনার জন্য একজন ভারতীয় নেতাকে অল্প সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যাদেশ শুনে সেই নেতা বলেছিলেন, "মাত্র ছ'মাস! আমি কি তবে মুরলী চুরি করেছি?" সেই ভারতীয় নেতার নাম কি?

৫। পোলোকোণ্ডা দুর্গ কোথায় অবস্থিত?

৬। কোন্ ভারতীয় মহিলা প্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেন?

৭। গ্র্যাহামস্ প্রথম টেস্ট কবে কোথায় খেলেন?

৮। ১৯৭৮ সালের 'বিশ্বসুন্দরী' খেতাব কে পেলেন? তিনি কোন্ দেশের নাগরিক?

উত্তর

১। [illegible] ১৮
(৩ ও ৪৫ মাইল) [illegible]
[illegible] ২৫৫৫ ।৬
[illegible] ।৭
[illegible] ।৮
[illegible] ।৯
[illegible] ।১০
[illegible] ।১১
[illegible] ।১২
[illegible] ৩০৫ ।১৩
[illegible] ।১৪

আলাপ

শিশু-সাহিত্যের আঙিনায় যাঁদের যাতায়াত তাঁরা প্রায় সিনিকে চেনেন না এমন লোক সংখ্যায় একেবারে নেই বললেই চলে। এই সিনির খবর নেবার জন্য সেদিন গিয়েছিলাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্ট্রীটে আনন্দ মোহন সাহার সেই বিখ্যাত মেস বাড়ীতে, যেখানে আছেন সিনির মামা শিবরাম চক্রবর্তী।

মেস বাড়ীর দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ল বাঁদিকের একটা ছোট ঘরের সামনের খুল বারান্দায় বসে আছেন এক ধ্যানমগ্ন তপস্বী। বিকেলের পড়ন্ত রোদের আলো এসে যেন ম্লান করিয়ে দিচ্ছিল এই বৃদ্ধ শিশুটিকে।

সামনে গিয়ে প্রণাম করে উঠে পরিচয় আর আসবার কারণ জানাতেই এক গাল সরল হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে তিনি বললেন, আরে বোস, বোস, সামনের এই তিন পাল্লা চেয়ারখানাকে একটু কায়দা করে বসে পড় দেখিন্।

হেসে বললাম,—কায়দাতো সারা জীবন-যুদ্ধে সর্বদাই করতে হচ্ছে আমাদের। যেখানে পারছিনা সেখানেই হারছি।

কথাটা বোধ হয় বেশ মনমত হল ওঁর, তাই খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন,—এবার বল কী জানতে চাইছ তুমি।

বললাম—যা বলবেন তাই-ই জানব, তবে আগে বলুন আপনার দেশ কোথায়?

দুষ্টু ছেলের মতন মুচকি হেসে বললেন, নিরুদ্দেশের যাত্রী আমি—আমার কি কোন দেশ আছে নাকি?

তবু একটা জায়গায় তো জন্মেছেন, সেই জায়গার নামটাই বলুন—আমি নাছোড়বান্দার মতন আবার জিজ্ঞেস করি।

উনি বললেন,—হ্যাঁ, তা একটা আছে বটে। আর সেই সেই জায়গার নাম চলন রামচন্দ্র বোস লেন, আমার মামী বাড়ী। সেখান থেকে পাঁচ কি ছ'মাস পরে মা আমাকে নিয়ে চাঁচোলে চলে এলেন। কারণ চাঁচোলেই থাকতেন আমার বাবা শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী মশাই। তাহলে মালদহ জেলার চাঁচোলই আপনার দেশ বলে আমরা ধরে নিতে পারি, কেমন। —আমি ওঁর কথা শেষ না হতেই আবার পাল্টা প্রশ্ন করি।

ধরে যখন ফেলেইছ তখন আর অস্বীকার করি কি করে।—বেচারা বেচারা মুখ করে উনি বলেন।

—আচ্ছা, বাবার নামের সঙ্গে আপনার নামের দারুণ মিল দেখছি, নামটা নিশ্চই তাঁরই দেওয়া?

—হ্যাঁ, আমার বাবা ছিলেন অনেকটা শিব ঠাকুরের মতন নিরাসক্ত। তাই 'শিব' নামটির ওপর তাঁর কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল। এই দেখনা, আমার নাম শিবরাম, আমার ছোট ভাইয়ের নাম শিবসতা আর আমার মায়ের অন্নপ্রাশনে পাওয়া নামটি পালটে ফেলে বাবা তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন শিবরাণী।

আর তাই বুঝি আপনিও শিবের মতন ঝোলা কাঁধে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছোট বেলাতেই?—আমি বললাম।

উনি আমার দিকে একটুক্ষণ তাকালেন। তারপর বলেন, সব খবরই একটু একটু রাখ দেখছি।

—ঠিক বলেছেন। এখন বেশী করে জানব বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। বলুনতো, কবে প্রথম বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছেন আপনি?

শিবরামের মুখে তখন কথার খৈ এসে গেছে। তাই আমার প্রশ্ন যেন অনেকটা নিজের মনেই যেন স্মৃতির পাতা উল্টে পড়ে যেতে লাগলেন বিড় বিড় করে।

ভাবলাম উনি বলছেন, তখন যদি ১৯০৬ সালে হয় তবে তখন আমার বয়স ছিল সাতের কি আটের। সি, আর, দাশ মশাই গেলেন চাঁচোলে বক্তৃতা দিতে। ওঁর কথা এত ভাল লেগেছিল যে দেশের কাজ করব বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম।

আর তখনি ঠিক করে বসলাম যে ওঁরই সঙ্গে কলকাতা চলে যাব। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কাউকে না বলে সেই যে পালিয়ে এলাম কলকাতায় সেই থেকেই ঘর ছাড়া। মাঝে মধ্যে অবশ্য ঘরে ফিরে গেছি আর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগও রেখেছি, তবু পুরী থাকে বলে তা আর কোন দিনই হলাম না।

কলকাতা এসে কোথায় উঠলেন?—উনি থামতেই আমি প্রশ্ন করি।

—ওয়েলিংটেন স্কোয়ারের কাছে ফর্মস অ্যানসন ছিল, সি, আর, দাশ মশাইয়ের

অধ্যাপক সেখানেই উঠলাম। কারণ ও বাড়ীটা ছিল তখন অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবীদের এক ডেরা।

—আপনিও তাহলে একজন ভলান্টিয়ারের মতন নিয়মকানুন মেনে চলেছেন, বলুন!

—হ্যাঁ বল, নিয়ম আমার কোনদিনই সহ্য হয়না। তাইতো মাত্র একদিন খেয়েই আবার পালালাম ওখান থেকে। উপন্যাসটী মশাইয়ের 'প্রাণশক্তি' কাগজটার তখন খুব নাম। সেই কাগজ বিক্রি করতাম। আর তার কমিশন হিসেবে যে পয়সা পেতাম তাই দিয়েই হোটেল ভাতা আর মুড়ি কিনে মনের আনন্দে খেতাম।

—আর শুতেন কোথায়?

—কেন, এর ওর বাড়ীর বারান্দায়। তখনকার সেই মুক্তজীবনের আনন্দের রেশ যেন আবার ফুটে উঠল এই পঁচাত্তর বছরের শিশুটির মুখে।

বললাম—দেশের কাজ তাহলে আপনার করা হয়ে গেল?

লাজুক হাসি হেসে বললেন, তা, একেবারে ছেড়ে দিইনি। আর ছাড়িনি বলেই তো একবার প্রজানন্দ পার্ক থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল আমাকে। সেকি! কেন? কী করেছিলেন আপনি?—বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই আমি জিজ্ঞেস করি।

নির্বিকার ভাবে উনি বললেন, কিছুই না—শুধু বক্তৃতা শুনছিলাম দাঁড়িয়ে।

—তারপর?

—তারপর আর কী! একমাস জেলে পুরে রাখল ওরা। আর সেখান থেকে বেরিয়েই আমি সটান্ চলে এলাম উত্তর কলকাতার কালীতলায়। মন্দিরের বারান্দায় রাত্রে শুতাম, আর সারাদিন কাগজ ফেরি করে সময় কাটাতাম, সেই সঙ্গে কিছু রোজগারও হত আমার।

—কাগজ ফেরি তো করতেন, কিন্তু কাগজে লেখা শুরু করলেন কবে সেকথা বলুন।—আমি আবার নতুন তত্ত্ব করলাম।

উত্তরাম, অসহযোগ কাগজেই ওঁর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রথমে বের হয়। এর পর থেকেই মাঝে মাঝে লেখা বের হতে থাকে। তারপর একদিন কালীতলা থেকে আনন্দ মোহনের এই মেস বাড়ীতে চলে এলে আনন্দবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। লেখার জগৎটাও বড় হয়ে যায় সেই সঙ্গে।

—আপনার প্রথম জীবনে লেখা এসব প্রবন্ধ নিয়ে কোন সংকলন বেরিয়েছে কি?

—হ্যাঁ, তবে তার কোন কপি এখন খুঁজে পাবেনা তোমরা, সংকলনটির নাম দিয়েছিলাম "ধেড়ো বনাম পঙ্গপাল"।

উনি আরও জানালেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি অবশ্য কয়েকদিন আগে আগ্রহ দেখিয়েছে ওঁর সমস্ত লেখা কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করবার জন্য, তবে কথাবার্তা এখনও চূড়ান্ত রূপ নেয়নি।

আচ্ছা, শিবরাম না লিখে শিরাম লেখেন কেন আপনি?—প্রশ্নের ধরনটা পালটে দিলাম। উত্তরে হেসে বললেন, শিবরাম নামটা যেন কেমন নরম আর মেয়েলী মনে হত। তাই বন্ধুরা বলতো 'শিরাম', যাতে তাদের ভেতরে একটা জোর প্রকাশ পায়। মেনে নিলাম ওদের দেওয়া নামের নতুন বানান আর তারপর থেকেই শিবরাম থেকে হয়ে গেলাম শিরাম।

নাম রূপান্তরের ইতিহাস শুনে আমিও হেসে নিলাম। তারপর বললাম, লিখছেন তো এখনও?

—হ্যাঁ, চেষ্টা করছি। দেশ পত্রিকা থেকে 'নিজের পৃথিবী ভালবাসা' গল্পটির শেষ পর্ব্ব ছাপাতে চাইছে। কাজেই এই লেখাটা নিয়ে মনে মনে একটু ব্যস্ত আছি।

—আর বিনি? তাকি বিনিকে নিয়ে লিখবেন না আর কিছু?—আমি আসল প্রশ্নে চলে এলাম।

—বিনিতো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। বর আর ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় থাকে। দেখাতেই পাইনি ওকে কত দিন। —একটু আক্ষেপের সুর স্নেহশীল মামার মুখে শোনা যায়।

সেই সুর চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললাম—আপনি নিজে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই মেস বাড়ীতে আছেন বলে আর কেউ কি কোথাও যাবেনা নাকি? উনি বললেন, তা যাক্, তবে আমি যেন এইখানেই থাকি। মাঝে মাঝে অবশ্য ছোট ভাই শিবসত্তার বাড়ী ঘাটশিলায় যাই। কিন্তু থাকতে আমার এখানেই ভাল লাগে বেশী।

কারণ, আনন্দ মোহন সাহার মেস বাড়ীতে এসে আমি আনন্দবাজার পেয়েছি, সঙ্গে পেয়েছি প্রচুর আনন্দ। কাজেই জীবনের শেষ দিনটিতেও যেন এখানেই থাকতে পারি।

আমি ভাবি, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি যেন ওঁর জীবনে অনেকদিন পরে এসে উপস্থিত হয়। কেন না, শিশু-জগতে সাহিত্যের প্রাসাদ গড়তে শিরামের দাদুর এক একখানা ঘন ইটের প্রয়োজন আছে এখনও অনেকখানি।

উমা দাশগুপ্ত

সম্প্রতিদেশের ১১টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর সহ পাঁচটি জেলার অনুন্নত সাক্ষরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এদের জন্য ত্রাণ-তহবিলে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণের ৯১ কোটি টাকা। সম্প্রতি কাঁথি মেদিনীপুর থেকে উত্তর-প্রদেশের জন্যান্যিকার এলাকা পরিদর্শন করেন।

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ কর্মযজ্ঞ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচী প্রকল্পে চলতি আর্থিক বছরে ৯ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি জেলাকে ৫৪ টি প্রকল্প রূপায়ণে ৬০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছেন।

৯০ হাজার পল্লী-স্বাস্থ্যকর্মী

আগামী বছর মার্চ মাসের শেষসপ্তাহ নাগাদ পর্যন্ত ৯০ হাজার জনস্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রায় ৮০ হাজার গ্রামের ৮-৯ কোটি গ্রামবাসীর সেবায় তাঁরা নিয়োজিত হবেন।

এবছরের ১০ জুন পর্যন্ত তিনটি দলে ৪২ হাজার জনস্বাস্থ্য কর্মী তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। পরবর্তী ১৮ হাজার জনস্বাস্থ্য কর্মীর চতুর্থ দলটিকে এবছরের ১ জুলাই থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল

গ্রামীণ-পানীয় জল সরবরাহ কর্মসূচী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি আর্থিক বছরে ৫২৭ টি উন্নয়ন ব্লকে ১৬৫৫টি টিউবওয়েল বা কূপ বসানো বা খনন এবং সংস্কার সাধনের জন্য অনুমোদন করেছেন। এর জন্য মঞ্জুরী বায় ধরা হয়েছে ৪১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬২ টাকা। সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসার এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন প্রতিনিধিদের যৌথ-ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী

সারা দেশে আগামী ২রা অক্টোবর থেকে বিপুল আকারে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হবে। সম্প্রতি নয়া-দিল্লীতে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সমাজ-কল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের মন্ত্রী ডঃ ভক্তচরণ চরণ এই কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, পরিকল্পনা কমিশন অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার, উন্নয়ন সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতা পাওয়ার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচীর জন্য বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু পরিকল্পনায় এই খাতে মাত্র ১৮ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল। তাছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এই কর্মসূচী রূপায়ণে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। এই কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে টাকার অপব্যবহারের এবং অসদুপায়ের অভাব যাতে না দেখা দেয় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। ইতিমধ্যে ২০টি রাজ্য সরকার বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করেছেন।

বানভাসি মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগরের একটি হেলিকপ্টার করে সেন্টার মাইলের মধ্যবর্তী মন্দিরের একটি ঘর থেকে একদঙ্গল নারী-পুরুষ-শিশুকে উদ্ধার করে। হেলিকপ্টারটি আবার দেখার দিকে ফিরে যায়। হেলিকপ্টার থেকে কেউ একের উদ্ধার করেন এবং তাকে ত্রিপলে করে নিয়ে যান। এভাবেই একজনকে সাহায্য করেছেন বীর পাইলটরা।

ফোর্ট উইলিয়ামে মিলন কেন্দ্র

জওয়ান-পরিবারদের জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি 'পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র' খোলা হয়েছে। এই ওরকমই সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্রই নয়। এখানে একই সঙ্গে একটি মেডিক্যাল ক্লিনিক, চিকিৎসা-ঘর, সেলাই ও বোনা শেখার ঘর, বিনোদন কক্ষ, লাইব্রেরীসহ পড়ার ঘর, এবং একটি ক্রেশ রয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ামের একেবারে কেন্দ্র-বিন্দুতে ছায়াঘেরা শান্ত মনোরম পরিবেশে এই কল্যাণ কেন্দ্রে এখন নিত্যই শোনা যায় জওয়ান বধূদের গুঞ্জন। কেন্দ্রের একদিকে রয়েছে ক্লিনিক। প্রতিদিন একজন মহিলা ডাক্তার সেখানে রোগী দেখছেন। সেলাই শিক্ষার ঘরে জওয়ানদের স্ত্রী ও কন্যাদের মেসিনের সামনে বসিয়ে একজন শিক্ষিকা শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্য একটি ঘরে একজন আধুনিক এমব্রয়ডারি ও বোনার কাজ শেখাচ্ছেন। বিনোদন কক্ষে ছেলেমেয়েরা ভাইনিক চেকার, ক্যারাম, দাবা, তাস প্রভৃতি খেলে। জওয়ানদের স্ত্রীরা যখন সেলাই, বোনা শিখতে কেন্দ্রে আসেন বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন সেসময় তাঁদের শিশুদের একজন আয়ার তত্ত্বাবধানে ঐ কেন্দ্রের 'ক্রেশে'তে রাখা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ামের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে একজন জওয়ানের স্ত্রীকে সেলাই শিক্ষার কাজ থেকে মেশিনে সেলাইয়ের কাজ শিখছেন।

কৃষি পণ্ডিত

অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুল জেলার সাধানপুর গ্রামের শ্রী জি. জি. শিবরাজ ১৯৭৭-৭৮ সালের খারিফ মরশুমে সারা ভারতের মধ্যে ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। প্রতি হেকটারে তিনি ধান ফলিয়েছেন ১৭.৫৪ টন। জওয়ার উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মহারাষ্ট্রের শ্রী মোহন লাল ওঙ্কার লাল লোধা। হেকটার পিছু তাঁর উৎপাদন ১২.৮২ টন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত ধান ও জওয়ার উৎপাদন প্রতিযোগিতার ফলাফল ও ঘোষণা করা হলো। প্রথম স্থান অধিকারী নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ছাড়াও "কৃষি পণ্ডিত" উপাধি পাবেন।

হরিজন কবে স্বাপনজন হবে (১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সরকারের আশা, ১৯৮৩ সালের মার্চমাসের মধ্যে এই কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে দেশের সমস্ত হরিজন পরিবারগুলোর অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগের উন্নতিবিধান করা যাবে। এ ব্যাপারে মূল সাহায্য আসবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ঐ ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ মেনে নেন তাহলে রাজ্যে রাজ্যে এই কর্পোরেশনগুলো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহায্য কেন্দ্রের কাছ থেকেই আসবে।

আমরা আশা করব এই প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্পোরেশনগুলো হরিজনদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়াতে যথাযথ সাহায্য করতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে সরকার প্রবীণ লোকসভা সদস্য শ্রী থোলা পাপোরাও শাস্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশন সংবিধানে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য যে সমস্ত রক্ষাকবচ রয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখবেন, প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটস্ এ্যাক্টই কোথায় কতটুকু প্রয়োগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সমীক্ষা চালাবেন এবং এই শ্রেণীর লোকেদের নিগ্রহের মূলে সামাজিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কি কি কারণ রয়েছে তাও পর্যালোচনা করে দেখবেন। সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সংসদের বিরোধী পক্ষের নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তিন দফা আলোচনা করেছিলেন। সংসদের একটি সর্বদলীয় স্থায়ী কমিটিও গঠন করা হচ্ছে হরিজনদের ওপর যে কোন হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে।

একথা আর সবাই অনুধাবন করেছেন যে জাতিভেদ প্রথার বিভিন্ন কারণ থাকলেও অশিক্ষা ও কুসংস্কারই এজন্য মূলত দায়ী। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে না দিতে পারলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। এটা দেখা গেছে, যে রাজ্যগুলিতে শিক্ষার মান উচ্চ সেখানে অস্পৃশ্যতার সমস্যা আনুপাতিকভাবে কম। কোন কোন রাজ্যে অবশ্য জাতিভেদের প্রশ্ন শুধু মাত্র অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তথাকথিত চিন্তাশীল ব্যক্তি, ধনী সমাজের সেরা অংশের মধ্যেও এই ব্যাধি ছড়িয়ে গেছে। অথচ আঘাত গিয়ে লেগেছে হরিজনদের গায়ে। প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলেছেন: হরিজন সম্প্রদায় যতদিন বর্ণহিন্দুদের সহানুভূতি কামনা করে থাকবেন, তাদের ওপর কোন অত্যাচার হবে না। কিন্তু যখনই এই সমস্ত মানুষেরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার দাবী করবেন, তখনই তাঁরা বিরাট বাধার সম্মুখীন হবেন।

একথা অনস্বীকার্য্য ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন এই সামাজিক সমস্যার সমাধানে সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান, লোকসভা ও বিধানসভায় হরিজন সমাজের আরো বেশী প্রতিনিধি গ্রহণ, হরিজন উন্নয়নমূলক কর্পোরেশন গঠন, সমস্যাবলী খুঁটিয়ে দেখার জন্য কমিশন গঠন এসব ব্যবস্থা সেই লক্ষ্যের প্রতি বিভিন্ন পদক্ষেপ মাত্র। তবে হরিজন বিদ্বেষের দুষ্ট ক্ষতকে সমাজদেহ থেকে নির্মূল করবার এই সরকারী প্রয়াস ও আয়াস কাজে পরিণত করা দুরূহ হবে যদি সমস্ত রাজনৈতিক দল এই সমস্যাকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে একটি জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে না দেখেন।

গ্রন্থ আলোচনা

এখন কবিতা পড়ছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত। কণ্ঠস্বর প্রকাশনী, ১৯৮২, টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম: চার টাকা।

একালের প্রতিটি সংগ্রামী তরুণ কবির হাতে নিবেদিত "এখন কবিতা পড়ছেন" মোট ১১ জন কবির রচনা। কেবল বয়সেই এই কবিরা পরস্পরের নিকটে নেই, লেখা চেতনায় ও আন্দোলনেও এঁরা বড় কাছাকাছি। সেইজন্যই মেলা গেছে, এঁদের বক্তব্যে ও প্রকরণরীতিতেও আছে পারস্পরিক সান্নিধ্যের উষ্ণতা।

পরিপার্শ্ব সচেতন এই একাদশ যুবক নানা দুর্ঘটনায় স্পন্দিতই মোহগ্রস্ত। যেমন, মৃদুল নিয়োগী: গোলাপের ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ রক্ত ফুটে আছে। অমরেন্দ্র সান্যাল: আমার জন্য মাটিতেই একটা কবর খুঁড়ে রেখো। প্রতীচী বিশ্বাস: ভালবাসা উদাসীন গান্ধ। প্রণব বসু রায়: তীব্র রৌদ্রের সহ তীক্ষ্ণ যুবক। সমর বন্দ্যোপাধ্যায়: জানালায় ধীরে ধীরে নিভে আসে জোৎস্নার আঁচ। ভট্টাচার্য চন্দন: উদাত্ত ভালবাসা এবং ছড়াক মনের কাছে / কিছুই বিশ্বাস নেই। অম্বুজেন্দ্র ঘোষ: নীল মৃত্যু চুমু দেয় অতর্কিতে বিপুল বিশ্বাসে। তপোন ঘোষ: অবিশ্রাম প্রতীক্ষার ধাক্কি হে দেবদূত। সুরেশ দাস: ভালবাসার ডাক হবে শেয়ার মার্কেটে। গণেশ সেন: গোলাপ কাঠের বাক্সে মৃত চিঠির পরীর। সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস: এখন আমি রোজ সকালে আর্তনাদের ভাষা খুঁজি।

এও সত্য নয়। এখনও যাঁরা কবিতা পড়েই চলেছেন, তাঁদের ভাগশক্তি দুর্বার। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতিশ্রুতিও রেখেছেন এই একাদশ অগ্রারোহী। এও সত্য। এবং এইখানেই এই কবিদের যথার্থ পরিচয়। যেমন, মৃদুল নিয়োগী: এখন আমার কাছ থেকে তোমার জন্য শরীর নিশান। অমরেন্দ্র সান্যাল: মৃত্যু আমার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীচী বিশ্বাস: জীবনের ভাষা খুঁজে, সব মৃত্যু ফিরে যায় অবলম্বনে। প্রণব বসুরায়: বড়ো প্রকাশ থেকে শুরুত জীবনের দূর কাছে। সমর বন্দ্যোপাধ্যায়: মৃত্যু বনের কোলে রাত এসে ভাঙা হয়ে চারিদিক থেকে। ভট্টাচার্য চন্দন: চলে যেতে হবে তাহলে আমার পালাবে ভিড়িয়ে। অম্বুজেন্দ্র ঘোষ: আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকব। তপোন ঘোষ: ঝাঁঝালো নষ্ট রক্তমাংসের পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ধনঞ্জয় মাড়ীর চেতনায়। সুরেশ দাস: জেগেছে আমার মনে সেই বনস্পতির বাসনা। গণেশ সেন: দিন এবং রাত্রিকে ডিঙিয়ে বারোটি বিপন্ন ঘোড়া ছুটে গেল অগ্নি-নৈঋতে। সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস: এখন আসুন ছাই মর্মে মর্মে। প্রস্তর প্রতিমা এঁকা ছাই স্বপ্নে স্বপ্নে।

অমিতাভ চক্রবর্তী

পত্র পত্রিকা

পরিবার কল্যাণ—শম্ভু মুখোপাধ্যায় প্রকাশক—বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগ ১৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য একটাকা পঁচিশ পয়সা।

প্রথমেই বলতে হয় এই বই প্রকাশ বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগের একটি সাধু প্রচেষ্টা। বাজারে পরিবার পরিকল্পনার ওপর অনেক বই আছে। কিন্তু সব বই সমাজের সাধারণ গ্রামের মানুষের পঠন উপযোগী নয়। অথচ এইসব লোকের সংখ্যাই আমাদের দেশে সর্বাধিক এবং পরিবার কল্যাণ সম্বন্ধে। এদের ধারণা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হওয়া একান্ত দরকার। সেদিক থেকে 'পরিবার কল্যাণ' এই বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবারকে কেন্দ্র করে তার কল্যাণের জন্য যা জানা দরকার তা একত্রিতভাবে সহজভাবে সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। গ্রাম সাক্ষরেরা এ বই পড়ে খুবই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা স্তরের অধ্যয়নক্রমে প্রবর্তিত হওয়ায় সাধারণ বেশী দামে বইটি যাতে ছাত্রদের পাঠাগারেও বইটির স্থান হওয়া একান্ত দরকার। পরিবার কল্যাণ কি, কেন করা দরকার, কিভাবে করা উচিৎ সব বিষয়টি সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া, ছাই পঁসর, সংক্রামক রোগ আমাদের করণীয়, প্রতিষেধক, শিশু-পালন প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দরভাবে অনেক তথ্য জানানো হয়েছে। প্রাথমিক পরিসেবা সম্বন্ধে আলোচনাও উপকৃত হওয়ার মতো।

মেয়ালী—ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, নব পর্যায়, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৩। সম্পাদিকা মীরা দেবী। ঘরোয়া বৈঠক সাহিত্য সংস্থা ১৪১।১৯ বিধান সরণি, কলকাতা-৪। দাম এক টাকা।

'মেয়ালী' ঘরোয়া বৈঠক সাহিত্য সংস্থার মুখপত্র। মেলা নির্মাণে সম্পাদিকা সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

আত্তা—সম্পাদিকা রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৮বক্স নং। স্মরণ সংখ্যা। 'আত্তা' কার্যালয় ২৫সি শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য দুই টাকা।

ছোট পত্রিকার অকালমৃত্যু মুক্ত কাটিয়ে 'আত্তা' সম্প্রতিকালে পদার্পণ করেছে এটা খুবই সুখের খবর। ইদানীং 'আত্তা' পত্রিকা বিশিষ্ট মনীষীদের স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করছেন। যেমন—আচার্য সুনীতি-কুমার সংখ্যা, মনীষী চরিনাথ দে সংখ্যা। সম্প্রতি তাঁরা তরু দত্ত স্মরণ সংখ্যা বের করেছেন। এই স্মরণ সংখ্যাগুলি ঘরে সংগ্রহ করে রাখার মতো।

অমর দাশ

শিল্প সংস্কৃতি

অস্কারের সুবর্ণ জয়ন্তী

ঐ দুটো ব্যাপারেই আলাপ-আলোচনা, তোড়জোড় চলছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকে, তবে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘটলো ১৯২৭ সালে।

প্রথম ঘটনার তারিখ ১৯শে জানুয়ারী। নিউ ইয়র্কের সান হ্যারিস থিয়েটারে সেদিন মুক্তি পাচ্ছে জন বারীমুর অভিনীত নির্বাক ছায়াছবি 'ডন জুয়ান'। প্রথম শো-তেই হাউস ফুল। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবে আসতেই থেমে গেল দর্শকদের গুঞ্জন। রজতপটে হঠাৎ ভেসে উঠলো সঙ্গীত-শিল্পী ব্লাকবার্নের মেলোডের হাসি-খুশি মুখখানা। তিনি দর্শকদের অভিবাদন করে শুরু করলেন গান। না, পর্দার পেছনে বাজানো কোন গ্রামোফোন ডিস্‌ক নয়। ঠোঁটের নড়াচড়ার সঙ্গে যে ঐ গান চমৎকার মিলে যাচ্ছে। চমকে উঠলেন নির্বাক ছবি দেখতে অভ্যস্ত দর্শকেরা। ঐ অভূতপূর্ব চিত্রের প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই প্রথম কথা বলে উঠলো রজত-পটের নায়ক নায়িকারা। শুরু হল সবাক ছবির জয়যাত্রা।

ঐ বছরের মে মাসে পরপর আবার ঘটলো চমকপ্রদ দ্বিতীয় ঘটনা। প্রথমে 'মৃত্তিষ্টোন নিউজে' কথা বলা ছায়াছবির পক্ষে বক্তৃতা দিতে দেখা গেল তাক সাইটে নাট্যকার বার্নার্ড শ'-কে। বুদ্ধি-জীবীরা তখনো নবজাত সবাক ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত। এমন কি চার্লি চ্যাপলিন, সেসিল বি. ডেমিলের মত পরিচালকও ভাবছেন—সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন। শ' সেই দ্বিধার অবসান ঘটাতে চাইলেন।

অবশ্য ঐ সময় হলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পে চলছিল মন্দাভাব। ঘুরোপেও উঠছিল ভালো ভালো ছবি। এছাড়া চলছিল নানা রকম দলাদলি। সেই সব কথা ভেবে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের প্রাণপুরুষ দুই মেয়ার বছরের গোড়ায় নিজের বাড়িতে ডাকলেন চলচ্চিত্র কুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটি-পার্টি', ঐ পার্টিতে চললো নানারকম জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলো না। তারপর মে মাসের গোড়ার দিকে আবার তাঁর বাগান বাড়িতে ৩৬ জন কলাকুশলী মিলিত হলেন। ঠিক হলো নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কাহিনী ও চিত্র-নাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, পরিচ্ছদ-পরিকল্পনাকারী, বিশেষ ভাবহ-সৃষ্টিকারী, সঙ্গীত পরিচালক, সম্পাদক, শব্দানুগ্রাহক, আলোক-চিত্রকর প্রভৃতি নির্বাচন করবেন গোপন ভোটের মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রাথমিক মনোনয়ন, তারপর চূড়ান্ত নির্বাচন। নির্বাচিত কুশলীরা এক বিশেষ অনুষ্ঠানে লাভ করবেন অস্কার পুরস্কার। সোনার মোড়া সুঠাম এক তরুণের অনবদ্য মূর্তি এবং সম্মান-পত্র। ১৯৩৬ সাল থেকে সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে পুরস্কার দেওয়ার প্রথাও চালু হলো। ১৯৪৯ সালে প্রথম একটি বিদেশী ছবি (ডি সিকার 'দি বাইসিকল থিফ') বিশেষ অস্কার (শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি) লাভ করল।

১৯২৭-২৮ সালে একযোগে দুটি নির্বাক ছায়াছবি সেরা চলচ্চিত্রের মনোনয়ন পায়। দু শো একত্রিশ জন কলাকুশলীর দেওয়া চাঁদার (২৩,১০০ ডলার), টেক্সাসের ব্যবসায়ী অস্কার পিয়ার্সনের নামে গড়া হল প্রথম পুরস্কারের স্মারক।

প্রথম বছরে মুখ্য-ভাবে অস্কার স্মারকে সম্মানিত হলেন দুজন অভিনেতা-অভিনেত্রী এমিল জানিংস (ওয়ে অব অল ফ্লেস) ও জানেট গ্যানোর (সেভেন্থ

এক্সট্রা অস্কার বিজয়ী সমর 'সেভেন্থ' ছবিতে জেনেট গেনর

অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত ১৯৭৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রিচার্ড ড্রেফাস এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ডায়ান কিটনের গ্রুপ আনন্দ মুহূর্ত। পেছনে বিরাট অস্কার দণ্ডায়মান।

যোজনা), পরিচালনার জন্যেও পুরস্কার পেলেন দুজন—ফ্রাঙ্ক বোরজাগে (সেভেন্থ হেভেন) ও লুই মাইল স্টোন (টু অ্যারাবিয়ান্ নাইটস্)। সেরা ছায়াছবির পুরস্কারটিও যুগ্মভাবে দেওয়া হল নির্বাক ছবি প্যারামাউন্টের 'উইংস' ও 'সান রাইজ'কে।

১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল আরও কতকগুলি স্মরণীয় ছবি, যেমন গ্রেটা গার্বোর 'উওম্যান অফ দি ডেভিল', ঘারলস্ লাফটনের 'দি কিস্ ব্রাদার্স' বা প্যাথে কোম্পানীর ব্যানারে তোলা সিসিল বি, ডেমিলের 'দি কিং অব কিংস', ঐ বছরেই প্রথম মুক্তি পেলো ওয়ার্নার ব্রাদার্সের 'অল টকিং অল সিঙিং' ছবি 'দি লাইটস্ অব নিউ ইয়র্ক', ঐ বছরেই প্রথম দেখানো হল কাহিনী-চিত্রের (ওয়ার্নিং আপ) ট্রেলার। ছবি সেন্সর করার ব্যাপারে প্রথম হাল্স পরিচালিত সমস্ত সংবাদপত্রে শুরু হয়ে গেল লেখালিখি।

তবে তখনও সবাক বা নির্বাক কোন ধরণের ছায়াছবি পৃথিবীর বাজারে বেশি চলবে সে বিষয়ে হলিউডের একচেটিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না।

তারপর এলো ১৯২৯ সাল। নির্বাক যুগের ছয় (১৯২৬)-এর সদ্য রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার জনপ্রিয়তাকে ধীরে ধীরে ছাপিয়ে মুক্তি পেল সেরা কয়েকটি সবাক ছবি। যেমন, প্রথম আউট-ডোরে স্যুটিং করা ওয়েস্টার্ন ছবি 'ইন্ ওল্ড অ্যারিজোনা', অস্কার পুরস্কারে ধন্য বছরের সেরা সঙ্গীতবহুল ছবি 'দি ব্রডওয়ে মেলোডি' (পরিচালক হেনরী কিঙ্গমণ্ট, প্রযোজনায় মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার), ১০২ মিনিটের ঐ ছবিটি মন কেড়ে নিল একেডেমীর বিচারক ও দর্শকদের। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার অবশ্য 'কমেডি' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে লাভ করলেন জাস্যমরী, 'সারা দুনিয়ার প্রেমসী' মেরী পিকফোর্ড। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পেলেন 'ইন ওল্ড এ্যারিজোনা'র ওয়ার্নার ব্যাক্সটার। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পেলেন ফ্রাঙ্ক বরেজ ('দি ডিস্যাইন লেডী' ছবিটির জন্যে), শ্রেষ্ঠ কাহিনীর পুরস্কার পেলেন হাল্স ক্রেবে ('দি গ্ল্যাড়িয়েটর' ছবির জন্যে)।

তারপর থেকে সেই অস্কার পুরস্কারকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্র-রসিক সমাজে কত বিতর্ক, কত আগ্রহ, কত উৎকণ্ঠা। কেউ কেউ পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন। যেমন, জর্জ সি স্কট 'প্যাটন' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে সেরা অভিনেতার (১৯৭০ সালে) ট্রফিটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মজার কথা, নর্মা শেয়ারার, জেসেফ কোলমার্ট প্রমুখেরা অস্কার পেলেও শ্রেষ্ঠা গার্বো, গ্লোরিয়া স্যাসোন্, জন ব্যানীর কপালে তা জোটেনি। এ যাবৎ সবচেয়ে বেশিবার অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন ওয়াল্টার ইলিয়াস্ ডিজনী (১৯০১-৬৬ খ্রী:)। ১৯২৯ সালের ১৬ই মে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সূচনা তাতে ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে তিনি সর্বমোট ৩৩ বার ট্রফি পেয়েছেন। যে ছবিটি এযাবৎ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরস্কার পেয়ে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিবেচিত হয়েছে তার নাম 'বেনহর' (১৯৫৯ সাল)। উইলিয়াম ওয়াইলারের ঐ ছবিটি পেয়েছিল ১১টি ট্রফি। এরপরেই 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' ছবিটির (১৯৬১) স্থান। সেটি পায় ১০টি পুরস্কার। এ পর্যন্ত একজন মাত্র অভিনেত্রী তিন বার অস্কার পেয়েছেন। তাঁর নাম ক্যাথারীন হেপবার্ণ (১৯০৯ সালে জন্ম), 'মর্নিং গ্লোরি' (১৯৩৩), 'দেস্ ব্রু ইজ কামিং টু ডিনার' (১৯৬৭) ও 'দি লায়ন ইন্ উইন্টার' (১৯৬৮)—এই তিনটি ছবিতে অভিনয়ের জন্যে। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে এ যাবৎ চার বার সোনার মোড়া অস্কার মূর্তি পেয়ে সর্বাধিক রায়-বঞ্চিত জন ফোর্ড যে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন সেটিও এখনও কেউ ভাঙতে পারেননি (দি ইনফরমার, ১৯৩৫। দি গ্রেপ্স অব রাথ, ১৯৪০। হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি, ১৯৪১। দি কোয়ারেট ম্যান, ১৯৫১)। তাঁর কাছাকাছি আছেন ফ্রাঙ্ক কাপ্রা। তিনি পেয়েছেন তিনটি অস্কার। অভিনেতাদের মধ্যে দু'বার অস্কার পেয়েছেন ফ্রেডরিক মার্চ (১৯৩২ ও ১৯৪৬), স্পারী কুপার (১৯৪১ ও ১৯৫২), মার্লন ব্রাণ্ডো প্রমুখেরা। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-রূপে দুবার নির্বাচিতা হয়েছেন বেটি ডেভিস, লুই রেনার, ভিভিয়ান লে, ইনগ্রিড বার্গম্যান, ওলিভিয়া ডি হ্যাভিলাণ্ড প্রমুখেরা। প্রথম বিদেশী অভিনেতা যিনি অস্কার পেয়েছেন তাঁর নাম এমিল জ্যানিংস (জার্মান, ১৯২৭)। উইলিয়াম ওয়াইলার (১৯৪২, ১৯৪৬, ১৯৫৯) ও ফ্রাঙ্ক বরেজ, যিনি ওয়াইল্ডার, ফ্রাঙ্ক বোরজাগে, ভেভিড লীন প্রমুখ পরিচালকও একাধিক বার শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছেন। ভেনিস (শুরু ১৯৩২ সাল) ও ক্যানেস (১৯৪৫) চলচ্চিত্র পুরস্কারের থেকেও এই অস্কার অনেক বনেদী আর পুরানো। তাই পঞ্চাশ বছরে পা দেওয়ার পর তাকে অভিবাদন জানাতে হবে বৈকি।

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE
Price 50 Paise
2 - SEP 378
YOJANA
(Bengali)
REGD. NO. WB RC 315
Sept. 16 30, 1978

প্রাঙ্গণ

দীর্ঘ আঠারো বছর পরে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের আবার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসতে চলেছে। দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে খেলাধুলো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। খেলাধুলোর মাধ্যমেই দুটি দেশ ইতিমধ্যেই অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে। ক্রিকেটের আগে দু দেশের মধ্যে হকির আসর। ধ্যানচাঁদ-রূপসিংয়ের বিজয়ী হকি ভারতীয়দের আগে প্রথমে পাকিস্তানে হকি দল এসেছিল ভারত সফরে, তারপর ভারতীয় দল গিয়েছিল পাকিস্তানে খেলতে। তারপর এবার দুদেশের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে ক্রিকেট সম্পর্ক।

সেই ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট দল এসেছিল ভারত সফরে। দিল্লির টেস্ট ম্যাচটি ছিল দু দেশের মধ্যে শেষ খেলা। তারপর এতকাল পাশাপাশি দুটি দেশের মধ্যে আর খেলা হয়নি। ইতিমধ্যে বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে পাকিস্তান রীতিমত শক্তিশালী দল হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।

কিন্তু কেরি প্যাকারের দলে পাকিস্তান দলের সাতজন সারির কয়েকজন খেলোয়াড় যোগ দেওয়ায় পাক দল তাদের শক্তির অনেকটাই হারিয়ে বসেছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তারা কিছুদিন আগে ইংলণ্ড সফরে গিয়ে হারিয়ে এসেছে রাবার। শুধু তাই নয়, তিনটি টেস্টের সব ক'টিতেই হেরেছে।

সেই ব্যর্থতার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাক সরকার ভেঙ্গে দিয়েন ক্রিকেট বোর্ড। এখন একটি অ্যাড-হক কমিটি পাকিস্তান ক্রিকেট সংস্থার কাজ চালাচ্ছে। সেই সংস্থার প্রধান লেঃ জেনারেল আজাহির সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন দু দেশের মধ্যে ক্রিকেট সম্পর্ক পাকা করার ও ভবিষ্যৎ ক্রীড়াসূচী চূড়ান্ত করার জন্যে। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ ভারতের সফরের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাঁরা গাভাসকার, বিশ্বনাথের ব্যাটিং, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, বেদীর বোলিং দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

আঠার বছর পরে আবার টেস্টলড়াই

ওদিকে ভারতের সঙ্গে খেলার ব্যাপারে পাকিস্তানে সাজসাজরব পড়ে গেছে। পাকিস্তান চাইছে, কেরি প্যাকারের দলে যে সব পাক খেলোয়াড়রা চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছেন তাঁদের খেলাতে। অর্থাৎ এ কথা পাক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন মুস্তাক মহম্মদ, জাহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল কিম্বা ইমরান খাঁ ছাড়া পাক দল কানা। বিশ্বের কোন দেশই এখন কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে খেলাচ্ছেন না। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—কেউই নয়। এইবার ইংলণ্ড সফরে গিয়ে পর পর দুটি টেস্ট হেরে যাবার পর পাকিস্তান হেরেছিল তৃতীয় ও শেষ টেস্টে প্যাকারের দলের খেলোয়াড়দের খেলাতে। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে প্যাকারের দলের খেলোয়াড়রা যদি পাক দলে খেলেন তাহ'লে তাঁরা খেলবেন না। তৃতীয় টেস্ট বয়কট করবেন। ফলে বাধ্য হয়েই পাক কর্তৃপক্ষকে প্যাকারের খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে দল গড়তে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—গত বছর স্বদেশে প্যাকারের দলের খেলোয়াড়দের খেলাবার কথা উঠেছিল। তখন বেঁকে বসেছিলেন পাকিস্তানের অন্য খেলোয়াড়রা। ফলে দেশে ওসেও খেলার সুযোগ পান নি প্যাকারের দলের পাক খেলোয়াড়রা।

কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আলাদা। ভারত মানে পাকিস্তান সফরে। তিনটি টেস্ট খেলা হবে দু দেশের মধ্যে। প্যাকারের দলের খেলোয়াড়রাও খেলতে আসছেন। এবার আর অন্য খেলোয়াড়রা দু'দল করছেন না। কারণ ভারতের সঙ্গে খেলা মানেই মর্যাদার লড়াই। সে লড়াইয়ে জেতার জন্যে সব কিছু করতে তাঁরা প্রস্তুত। আঠারো বছর পরে দু দেশের মধ্যে আবার টেস্ট লড়াই শুরু হচ্ছে। ভারতের কাছ থেকে রাবার ছিনিয়ে নেবার জন্যে পাকিস্তান এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই সমস্ত পাকিস্তান জুড়ে পড়ে গেছে সাজ সাজ রব।

ভারতীয় দল পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে ২৩শে সেপ্টেম্বর। তিনটি টেস্ট, তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক খেলা ও ছ'সাতটি তিনদিনের খেলায় অংশ নিয়ে ভারতীয় দল নভেম্বরের শেষে দেশে ফিরে আসবে। আর ততোদিনে ভারত সফরে এসে যাবে কালীচরণের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫টি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে দুটিতে, হেরেছে একটিতে। বাকী বারোটি খেলা শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। ১৯৫২ সালে দু দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা হয়। সেবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন লালা অমরনাথ আর পাকিস্তানের আব্দুল হাফিজ কারদার, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের নেতৃত্ব করেছিলেন কারদার আর ভারতের সদ্য প্রয়াত অলরাউণ্ডার ভিনু মানকাদ। এর পর ১৯৬০ সালে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন এন. জে. কনট্রাক্টর আর পাকিস্তানের ফজল মামুদ। আর এবার ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে যাচ্ছে বিষেন সিং বেদীর নেতৃত্বে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং এন. কে. সেনের অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ কর্তৃক মুদ্রিত।

জনপদ

১-১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮
পঞ্চাশ পয়সা

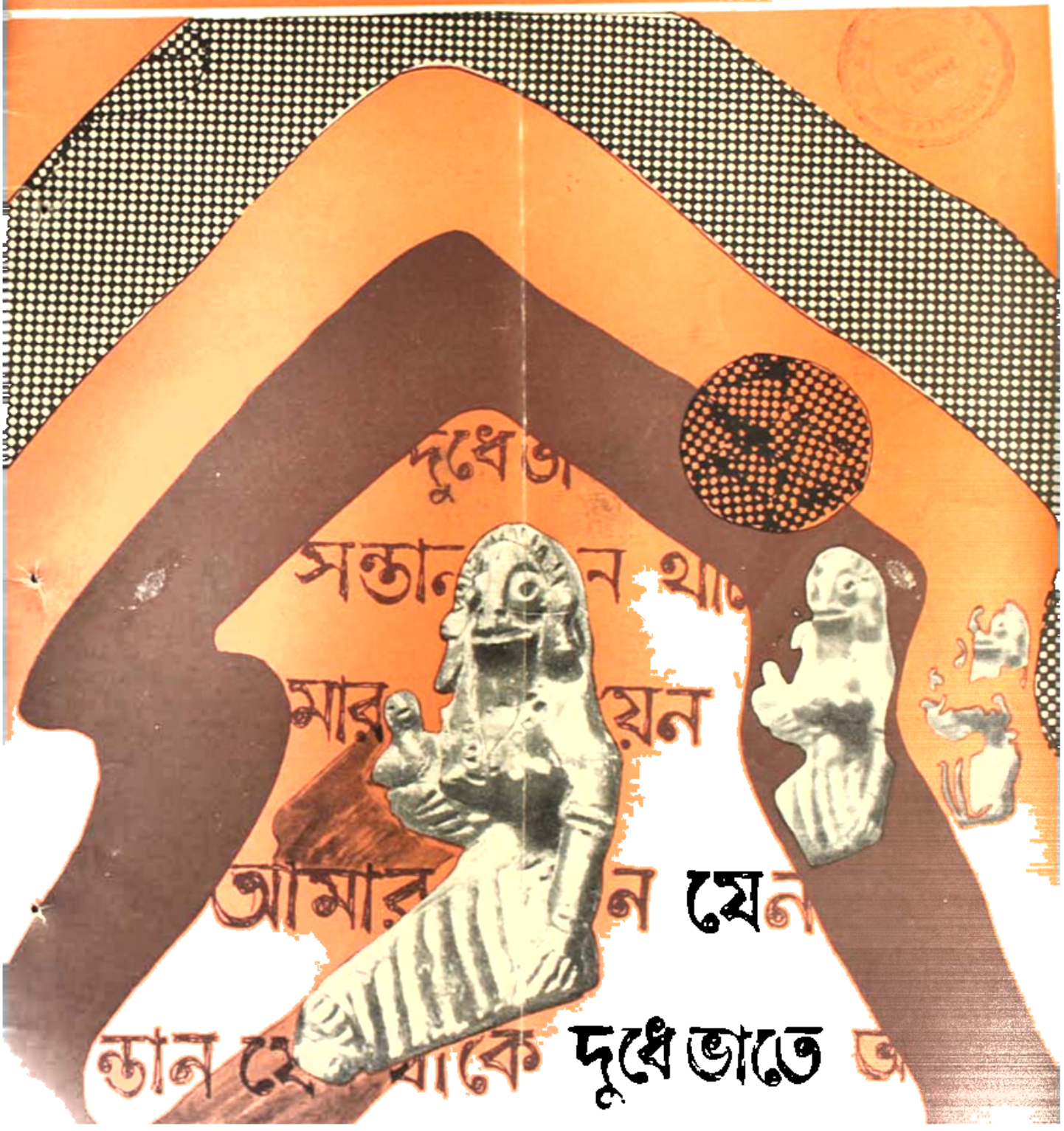

চিঠি

বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ

আপনার প্রকাশিত স্বাধীনতা সংখ্যা ১৯৭৮-র একটি লেখার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ প্রতিবাদ জানাবার জন্য আমার এই লেখা নিশ্চয়ই আপনার পত্রিকায় স্থান পাবে এই বিশ্বাসও রাখি।

লেখক মনোজ সিংহের বিষয়বস্তু 'বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ ও মন'। গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবন ও মানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক কয়েকটি অসত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত ও হীন মিথ্যা প্রচার করেছেন। যুবতী মেয়েকে রক্ষক রাখার বিষয়ে লেখক সমাজের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন তা সত্য হলে একথা—কিন্তু যা সত্য নয় তা নিয়ে সরকারী কাগজে এইরূপ সংবাদ পরিবেশন নিতান্ত নিন্দার্হ। লেখক নিশ্চয়ই জানেন এই বন্ধকী ব্যবস্থা বহুদিন অপসৃত হয়েছে। জীবনের মূল্যবোধে মহিলারা এবং তাদের অভিভাবকরা নূতন করে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত। যেখানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—সেখানে সমাজ বিশ্লেষণে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাদের সংগ্রামী ভূমিকাকে অনুসরণ করছে সেখানে নেতাজীর সঠিক খবর নিয়ে এইরূপ কটাক্ষ করা উচিত ছিল।

কাকদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হরিনবাড়ী প্রভৃতি জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে নৈতিক মূল্যবোধকে কিস্তিরে আনবার জন্য এইরূপ একটি মিথ্যা, হীন ও অযথা তথ্য পরিবেশন করলেন—সেই নৈতিক দাবী নিয়ে আমি বা আমাদের এলাকার মানুষ জানতে চায়—আপনার ঐ তথাকথিত সংবাদের source কে বা কারা। নাহলে বুঝব আপনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন কলকাতার কোন শীততাপনিয়ন্ত্রিত হোটেল বা রেস্তোরাঁর বসে—কিন্তু কলুষকলিত বিকৃত মানসিকতাকে জোর করে নিরপরাধ মহিলা ও তাদের অভিভাবকদের উপর চাপিয়ে দিতে। এইরূপ আজগুবি ও কল্পনা-প্রসূত যৌন-বিকৃতি থেকে মনগড়া মুক্ত হয়ে যা সত্য তাই লিখবেন —এই আশা করি।

প্রভঞ্জন মণ্ডল, এম.এল.এ, সাগর
২৪-পরগণা

১৬-৩১ জুলাই সংখ্যা

ধনধান্যে পত্রিকার আকর্ষণ দিন দিনই বাড়ছে। আমি ওপার বাংলার ছেলে। এপার বাংলার দু'একখানা কাগজ মাঝেমধ্যে বন্ধুদের মোসসাজসে পড়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ধনধান্যের ১৬-৩১ জুলাই সংখ্যা পড়ে খুবই ভালো লাগল। সম্পাদক মহাই মাননীয় শিশিরবাবু গ্রামীন অর্থনীতির ওপর ইদানীং যেসব ধরণী লেখা লিখছেন তিনি সেজন্য সব পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদার্হ। 'নিরক্ষরতা দূরীকরণে পণ্ডিতমহলের প্রয়াস' এমন একটি পরমতত্ত্বা লেখা। গ্রামবাংলার সাক্ষরতার যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন সেটি এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। এ চিত্র আমাদের বাংলায় আরো ভয়াবহ। 'গ্রামবাংলার কড়চা'র রসুলনিক্কার লেখাও ভালো লাগল। বেহারা তাহলে এখনো আছে? গ্রামীণ অর্থনীতির পটভূমিকায় এদের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ধনধান্যে প্রায়ো সমৃদ্ধ হোক—গ্রামবাংলা ধনধান্যে আবার ভরে উঠুক, এই কামনা করি।

অরুণশংকর দাস
জগন্নাথ হল, ঢাকা

ধনধান্যে

আমি 'ধনধান্যে' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। 'ধনধান্যে' শুধু অর্থনীতিরই পত্রিকা নয়, এ যেন সমস্ত পদদলিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের জীবন-বেদ। এই পত্রিকায় চারুকলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের স্পর্শ তো প্রতিটি মুহূর্তেই দেখতে পাই। তাছাড়া সাহিত্যের ও ভাষার দিক থেকে এ পত্রিকা সেক্কালিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে স্থান পাবে। এ পত্রিকা দর্শনের সংযোগ সেতু ও ভাবের ত্রিবেণী তীর্থ। এই পত্রিকায় যেমন বিজ্ঞানের আলোচনার স্থান পায়, সেইরূপ স্থান পায় অর্থনীতির বিষয়। তাই বলা যেতে পারে, 'ধনধান্যে' পত্রিকাটি গঙ্গা-যমুনার নৈতিক নীলিম সঙ্গম।

শ্রীকান্ত ঘোষ
আলিপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি।

'ধনধান্যে' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার:

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়

বিদেশের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

এজেন্সির হার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পত্রপত্রিকাসমূহ বিক্রয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উদ্বৃত্তের কমিশন দেওয়া হয়। পত্রপত্রিকাসমূহ বিক্রয়কেন্দ্রের এজেন্টরাও মধ্যবর্তীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সম্পাদকীয় অফিসের ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা।

ম্যানেজার, পাবলিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯.
ফোন: ২৩-২৩৭১

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপ-সম্পাদক
প্রিয়দ চক্রবর্তী

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৪-২৮ কার্তিক, ১৪৮৫
১-১৫ নভেম্বর, ১৯৭৮
দশম বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সংখ্যার ইন্দ্রজাল ও পশ্চিমবঙ্গ
নারায়ণ চৌধুরী ৩

এই মহাশ্মশানে
শিশিরকুমার রায় ৬

আমপাড়
অশোককুমার সেনগুপ্ত ৯

জানা অজানা ১১

গ্রাম বাঙলার কথকতা
রসুল মিঞা ১২

রেকর্ড খাদ্যোৎপাদনের নেপথ্যে
রাখাল দত্ত ১৫

খেতখামার
মুকুল বাগচী ১৭

সংবাদ ১৯

মহিলামহল
মীনাক্ষী ঘোষ ২৭

গ্রন্থ আলোচনা
সুশোভন দত্ত ২৮

শিল্প সংস্কৃতি
বিভাবসু দত্ত ২৯
ঐ
কাজী নুরবিদুল আরেফিন ৩০

প্রাঙ্গণ
পাক্ষিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১

প্রচ্ছদশিল্পী—রমেন মণ্ডল

সম্পাদকীয়

বন্যারোধে সামগ্রিক প্রয়াস চাই

বার বার প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনকে যেভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাতে শুধু এ কথাই মনে হয়, প্রকৃতির নিজস্বতা শক্তির কাছে আমরা কত অসহায়, আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি কত সীমিত। যে নিম্ন-চাপ সবশেষে সর্বনাশা তাণ্ডব খেলে গেল তার গতিবিধির আবহাওয়া বিজ্ঞানের সাধারণ ছকে বাঁধা ছিল না।

এই বিংশশতাব্দীর মহাপ্রলয় ধনে প্রাণে এ রাজ্যের মানুষের কতটা ক্ষতি করে দেল তা শুধু পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হতে পারে না। অভূতপূর্ব দুর্বিপাকে অগণিত মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে অকল্পনীয় দুঃখ। বিপন্ন হয়েছে বারোটি জেলার দেড় কোটি মানুষ। নিষ্ক্রিয়বিহীন বর্ষণ ও বর্ষাস্ফীত নদীগুলির উত্তাল জলরাশি যখন সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর মূর্তি নিয়ে আসিয়ে দিয়েছিল জনপদের পর জনপদ তখন লক্ষ লক্ষ সর্বহারা নিরাশ্রয় নরনারীর বুকফাটা কান্নায় ভরে উঠেছিল বাংলার আকাশ বাতাস। ধ্বংসের লীলা এখন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কৃষি ও শিল্পের যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল তা অপূরণীয়। রাজ্যের অর্থনীতি আজ পঙ্গু—নিঃস্ব।

এই বন্যা থেকে আমরা যদি কোন শিক্ষা লাভ করে থাকি তাহলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এই কাজে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাধিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। বন্যারোধের জন্য এযাবত আমরা যা কিছু করেছি তা যে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপর্যাপ্ত সেকথা বলা বাহুল্য। প্রমাণিত হল যে বর্ষার জল ধারণের জন্য যেসব জলাধার ও বাঁধ তৈরী হয়েছে সেগুলির ধারণ ক্ষমতা অপরিমিত বর্ষার ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রতুল।

অসাধারণ বর্ষণের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যেসব জলাধার রয়েছে প্রয়োজনবোধে তাদের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন নতুন জলাধার তৈরী করতে হবে। সম্প্রতি সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-ওড়িশা আন্তরাজ্য নদীচুক্তি বন্যারোধে কিছুটা সাহায্য করবে। এ চুক্তিতে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের জলাধার বাড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। সিঙ্গেশ্বরী নদী ও অজয় নদীর জন্যও নতুন জলাধার সৃষ্টি করা যাবে। সুবর্ণরেখা নদীর ক্ষেত্রে চাঁদিল বাঁধে জলাধার তৈরী করে সেখানে বন্যার জল কিছুটা ধরে রাখা হবে। তাছাড়া কংসাবতী নদীতে আর একটি জলাধার সৃষ্টি করার কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে।

বন্যা রোধের জন্য যেমন আরো জলাধার ও বাঁধের প্রয়োজন তেমনি ব্যাপক-ভিত্তিতে বনানীকরণ ও ভূমি সংরক্ষণের কাজও ত্বরান্বিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জলনিকাশী ব্যবস্থা উন্নততর করা দরকার। বন্যা প্রতিরোধের জন্য চাই সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং উত্তর ভারতের চৌদ্দটি বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য তিন মাসের মধ্যে একটি সুসংহত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের রূপরেখা তৈরী করার দায়িত্ব দিয়ে ভারত সরকার যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিযুক্ত করেছেন তা এই সামগ্রিক প্রচেষ্টারই একটি দৃষ্টান্ত। দেশসংগঠনের পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে সর্বাগ্রে দেশকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচাতে হবে।

বাধ্যতামূলক জমার টাকা পরিশোধ

আয়করদাতাগণ !

১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬এর আর্থিক বছরে চুয়াত্তর সালের বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প অনুযায়ী কোনও টাকা কি আপনারা জমা দিয়েছেন ?

যদি দিয়ে থাকেন

তাহলে যে বছরে টাকা জমা দিয়েছিলেন তার দু'বছর পর থেকে পাঁচটি সমান কিস্তিতে সুদশুদ্ধ জমা দেওয়া টাকা আপনার ফেরৎ পাবার কথা।

অর্থাৎ—

নিম্নোক্ত সময়ে জমা দিয়ে থাকলে	নিম্নোক্ত তারিখগুলিতে সমান কিস্তিতে সুদশুদ্ধ ফেরৎ পাবেন
১-৪-৭৪ থেকে ৩১-৩-৭৫	১-৪-৭৭, ১-৪-৭৮, ১-৪-৭৯, ১-৪-৮০ এবং ১-৪-৮১
১-৪-৭৫ থেকে ৩১-৩-৭৬	১-৪-৭৮, ১-৪-৭৯, ১-৪-৮০, ১-৪-৮১ এবং ১-৪-৮২

এইভাবে চলবে।

পাওনা নেবেন কী ভাবে ?

যে দপ্তরে জমা দিয়েছেন সেখানে ফর্ম 'ঐ' ভরে, সঙ্গে পাসবই জমা দিন। ফর্ম 'ঐ' জমার দপ্তরে পাওয়া যাবে।

শীঘ্র করুন

১-৪-৭৭ — ১-৪-৭৮এ যা পাওনা হয়েছে তা নেবার ব্যবস্থা করুন।

কারণ

যে কোনও কিস্তির পরিশোধের তারিখ পেরিয়ে গেলে তার ওপর সুদ জমা পড়ে না, তা সে পাওনা টাকার জন্য আপনি দাবী জানান বা না জানান।

ভুলবেন না

পরবর্তী কিস্তির টাকা দাবী করার তারিখ হল ১-৪-৭৯, ১-৪-৮০, ১-৪-৮১ ইত্যাদি।

ডিরেকটার অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড পাবলিকেশান)
ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

ডিএডিপি ৭৮/২৯৮

বাংলা/২

সংখ্যাতত্ত্ববিদরা সংখ্যাচর্চা করেন। সংখ্যার ইন্দ্রজাল তাঁদের চমকে দেয় না। কিন্তু আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁদের কিছু কিছু সংখ্যার ইন্দ্রজাল স্বভাবতই তাকিয়ে তুলবে। এ সংখ্যা জনসংখ্যা। অতিজনতা আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে এটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই তো সেদিন, এই শতাব্দীরই প্রথমদিকে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫০ কোটির কম্বাকাছি। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে তা ৩০০ কোটিকেও ছাড়িয়ে যায়। অথচ গোড়ার দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা মাত্র ২৫ কোটিতে পৌঁছুতে প্রায় ১৬০০ বছর লেগেছিল। এখন যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হচ্ছে।

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটির মত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার হলো শতকরা ২%। অনেকগুলি অনুন্নত দেশে এই হার তিন থেকে চারের মত। চীনের পরই ভারতবর্ষ হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর প্রতি ৭ জনের একজনই হলো ভারতবাসী। অথচ পৃথিবীর মাত্র ২.৪ শতাংশ স্থলভাগ জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ। আর ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যা কত? সর্বশেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৭-৭৮ সালে ভারতবাসীর সংখ্যা ৬৫ কোটি ছাড়িয়েছে। অথচ ১৯৫১ সালে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি। তার আগে ১৯৪৭ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২৭ কোটি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিগত ৩০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৫ কোটিরও বেশী যা সমগ্র সোভিয়েত দেশের জনসংখ্যার চেয়েও অনেক বেশী। সোভিয়েতের মত বিরাট দেশটির মোট জনসংখ্যা ৩০ কোটিও নয়।

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এদেশের জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪১ জন, ১৯৭৮ সালে এটা নেমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৩৩ জন। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.২%। ১৯৭৬ সালের সরকারী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৯৪%-এ। প্রতি বছর আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিসাবে—যা সারা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনসংখ্যার সমান। অথচ আয়তনের দিক থেকে ভারতবর্ষ হলো অস্ট্রেলিয়ার এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিচারে ভারতবর্ষে প্রতি বছর হরিয়ানা রাজ্যের মত একটি করে রাজ্য সংযোজিত হচ্ছে। আর এর অর্থ হলো, নবাগতদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। শুধু অতিরিক্ত খাদ্যের কথা ভাবলেই বোঝা যায়, সমস্যাটি কত উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ।

দারিদ্র্য আমাদের দেশের প্রধান শত্রু। দারিদ্র্য মোচনের জন্য আমরা পরিকল্পনাবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম করে চলেছি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে নানা গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছে অনেকগুণ। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন ছিল মাত্র সাড়ে তিন কোটি টন, ১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি টন। তবুও মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ এখনো মাত্র ৪০০ গ্রাম। তাই আমাদের অর্থনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আজও আসেনি। এখনো এদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ মানুষ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নীচে। কেন এরকম হল? ত্রিশ বছরের আমাদের এত চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে কেন? কারণটা সহজ। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলে, তাহলে জীবনযাত্রার মানও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। জনসংখ্যার চাপই জীবনযাত্রার মানকে টেনে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। এটা বুঝতে কোন অর্থনীতিবিদের কাছে ছুটে যেতে হবেনা। যেকোন পরিবারের সন্তান সংখ্যা দিয়েই এটা উপলব্ধি করা যায়। যেসব পরিবারে খাওয়া-পরাই ঠিকমত জোটে না সেখানে সুন্দর পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাসযুক্ত ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া-দাওয়া, ইস্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ের কথাটা নিতান্ত কথার কথাই থেকে যায়। এরও মূলে রয়েছে ওই একজন বা দুজনের রোজগারের ওপর অনেকগুলি সন্তানের নির্ভরশীলতা।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মধ্যে তাই এক গভীরতর যোগসূত্র বর্তমান। এরা একে অন্যের সহায়ক। অধিকন্তু দুটি প্রচেষ্টাকে সার্থক-

ভাবে সমন্বিতও করা যায়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত না হলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের অনেক পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন বলেই সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে এই সমস্যাটির মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর। পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ তারই পরিচায়ক। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীকে জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করে মুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত সর্বস্তরে এই কর্মসূচীর রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেছি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গত দুই দশক ধরে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তাতে অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হয়েছে অনেক।

বিগত জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে দেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে নানারকম জোর-জুলুম ও বাধ্যবাধকতার ফলে সারা ভারতবর্ষে এই কর্মসূচীর কাজ খুব ব্যাহত হয়েছে। জনমনে সৃষ্টি হয়েছিল নানা বিভ্রান্তি ও সংশয়। বর্তমান সরকার সেই সংশয় ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সর্বতোভাবে আন্তরিক। 'পরিবার পরিকল্পনা'র নাম পরিবর্তন করে 'পরিবার কল্যাণ' প্রকল্প করা হয়েছে। এই নামান্তরের মধ্যেই এই কর্মসূচীর আদর্শ ও দর্শন পরিস্ফুট। এখন শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণই এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য নয়। এই কর্মসূচীতে যেমন একদিকে সীমিত পরিবারের আদর্শে জনসমাজকে অনুপ্রাণিত করার আয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমনি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের আয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। সন্তানসম্ভবা মায়েদের টিটেনাস প্রভৃতি রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া, মায়েদের পুষ্টির জন্য বিনামূল্যে ভিটামিন বড়ি সরবরাহ, শিশুদের জন্য হুপিংকেফ, পোলিও, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস প্রভৃতি রোগ প্রতিষেধক টিকাদান, পুষ্টির জন্য ভিটামিন বড়ি সরবরাহ, ইত্যাদি নানা-রকম মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচীকে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঘোষিত নতুন নীতিসমূহ যে রূপরেখা রয়েছে তার কয়েকটি এই :—

(১) ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে আমাদের দেশের জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৩ থেকে প্রতি হাজারে ৩০ জন নামিয়ে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে।

(২) পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে কোনক্ষেত্রেই জোর-জুলুম বা বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এই প্রকল্প হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক।

(৩) জনস্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবার কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশব্যাপী একটি সুসংহত জনস্বাস্থ্যরক্ষার কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

(৪) স্বাস্থ্যবিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মরত সমস্ত কর্মীদের সর্বার্থসাধক স্বাস্থ্যকর্মীতে পরিণত করা হবে।

(৫) জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে জনশিক্ষা ও প্রচার বিভাগকে আরো মজবুত করে গড়ে তোলা হবে যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সীমিত পরিবারের আদর্শ গ্রহণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন।

(৬) কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে যাতে তাঁরা পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(৭) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম-পঞ্চায়েত, গ্রাম-সমবায়, মহিলা সমিতি, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যাতে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে।

(৮) স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচীতে জনসংখ্যা-বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য (Population Education) সংযোজন করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে ভাবী নাগরিকদের সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করা হবে।

(৯) ছেলে ও মেয়েদের বিবাহের বয়স সীমা বৃদ্ধি করে আইন প্রণয়ন করা হবে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে ১লা অক্টোবর, ১৯৭৮ থেকে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বৎসর এবং ছেলেদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়েছে।

(১০) পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর রূপায়ণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতা যাতে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির ফলে পরিবার পরিকল্পনার কর্মক্ষেত্রে যে ভাঁটা পড়েছে, তা আজও অব্যাহত আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি পরিবারকল্যাণ প্রকল্পের কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে সরকারী প্রশাসনকে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য অনুরোধ রেখেছেন। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজ্যে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

পশ্চিমবঙ্গেও বিগত বছরে এই প্রকল্পের কাজ আশানুরূপ হয়নি। চলতি-বছরেও সেই মন্থরগতি অব্যাহত আছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির ফলে জন-সাধারণের মনে যে সংশয় ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, আজও তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। তাই পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এরাজ্যের জেলা প্রশাসনকে পরিবার

কল্যাণ কর্মসূচীর রূপায়ণে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য জেলাশাসকদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে রাজ্যের সমস্ত বিধানসভা সদস্য ও লোকসভা সদস্যের কাছে নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণকে এই কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন।

রাজ্যের শিল্পাঞ্চল, কয়লাখনি অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা অঞ্চল ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় যাতে এই কর্মসূচীর সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, সেজন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জেলায় জেলায় এই কর্মসূচীর কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্য সর্বপর্যায়ে যথাযথ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা ও ব্লক পর্যায়ে এই কাজের লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয় সেদিকেও সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যে সব দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য সরকারী আর্থিক অনুদানও পুনরায় চালু করা হয়েছে। যে সব সংগঠন বা ব্যক্তি পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন, তাঁদের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এ সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার সমস্যা আরো জটিল, তাই এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তাও বেশী। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা দেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী নরনারী। সমস্যাসঙ্কুল এই রাজ্যে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ লক্ষেরও কিছু বেশী। জনবসতির ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কেরলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির সংখ্যা ৫৫৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫১৭।

এই রাজ্যের প্রশাসনীয় ও আগ্রহী জনসাধারণের কাছে তাই সীমিত পরিবারের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চলছে। জেলার জেলায় গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি স্তরে গ্রামীণ নেতৃবৃন্দ, গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, গ্রাম-বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর অনুকূলে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। জনশিক্ষা ও প্রচার কর্মসূচীর কাজকে আরো জোরদার করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। সম্প্রতি যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, এই রাজ্যে মায়েরা 'টিউবেকটমি' অপারেশন করিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবে এগিয়ে আসছেন, সেই অনুপাতে 'ভেসেকটমি' অপারেশনের ক্ষেত্রে পুরুষদের আগ্রহ খুবই কম। অথচ 'ভেসেকটমি' স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ ও একেবারে নিরাপদ একটি উপায়। টিউবেকটমি অপারেশনের সুযোগ সর্বস্তরে নেই, তাই আগ্রহী মায়েদের ইচ্ছানুযায়ী সেবা ও সহায়তা প্রদান বহু ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ ভেসেকটমি অপারেশনের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে থাকা সত্ত্বেও পুরুষেরা এই পদ্ধতি গ্রহণে এখনও অগ্রণী নন। 'ভেসেকটমি' অপারেশনের জন্য পুরুষদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির কাজটি তাই খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রাজ্যে প্রজননশীল দম্পতির সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। এই ৮০ লক্ষ দম্পতিদের অর্ধাংশে হলেন তাঁরাই যাঁদের দুটি বা তিনটি সন্তান আছে। অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ দম্পতি যে কোন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের উপযুক্ত। বাকী ৪০ লক্ষ দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী সাময়িক পদ্ধতি যেমন নিরোধ বা লুপ গ্রহণ করে দুই সন্তানের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়াতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ প্রায় ১৮ লক্ষ দম্পতি স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং সাময়িক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন মাত্র ৬ লক্ষ দম্পতি। বাকী ৫৬ লক্ষ দম্পতি এখনও কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে এগিয়ে আসেননি। তাঁদের এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার করে দেখলে, এক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মনোভঙ্গী বদলের, নতুন মূল্যবোধ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের। পুরনো মনোভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার এই কাজটি যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সামাজিক। শিক্ষার মাধ্যমে মনোভঙ্গীর পরিবর্তন না করতে পারলে চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, তা স্থায়ী ও দীর্ঘায়ু হবে না। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা ও সর্বোপরি দারিদ্র্য আমাদের সকল প্রয়াসকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করবে। প্রসঙ্গত সোভিয়েত রাশিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জার আমলে রাশিয়া যখন অনগ্রসর ছিল, তখন সেখানে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই ছিল বেশী—জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৫.৫ এবং মৃত্যুহার ছিল ২১.১ জন। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্যাণে এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে সেখানে জন্মহার ও মৃত্যুহার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ১৮ জন ও ৭ জনে। ভারতবর্ষে আজও শতকরা ৭০ জন অশিক্ষিত। এই অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তোলার বলিষ্ঠ কর্মসূচীর ওপরেই পরিবার কল্যাণ তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সফল পদ্ধতি হল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং উন্নততর মানের জন্য জনমনে আগ্রহ সৃষ্টি করা। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে উত্তরণ স্বতঃসিদ্ধভাবেই এই আগ্রহ এনে দেবে। গত মাসের শেষার্ধে সারা দেশে যে পরিবার কল্যাণ পক্ষ উদযাপিত হল তারও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই জনশিক্ষা কর্মসূচীর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস দুটি চিরদিন পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে চরম বিভীষিকার সাক্ষী হয়ে থাকবে। এই দুমাসে এই রাজ্যের জনজীবনে নেমে এসেছিল এক দারুণ দুর্যোগ, মর্মন্তুদ বিপর্যয়ের অন্তহীন দুঃখ। বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েছিল তাদের সর্বস্ব। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাজ করেছিল শ্মশান-পুরীর স্তব্ধতা। এ রাজ্যের ইতিহাসে এমন বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কোন নজির নেই।

বন্যার উত্তাল জলরাশি অসংখ্য গ্রাম ও শহর তলিয়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য সব কিছু যেন মিশিয়ে করে দিয়েছিল। তারই মানুষ প্রাণটুকু বাঁচাবার তাগিদে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কোন উঁচু জায়গায় অথবা বাড়ীর ছাদে কিংবা গাছের মাথায়। কত লোক কিভাবে করাল বন্যার ছোবল থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য দিনের পর দিন সংগ্রাম করেছিল তা এক একটি অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে দু'তিনদিন ধরে এক মুঠো অন্ন বা এক ফোঁটা পানীয় জলও জোটেনি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্ত তারা দুঃসহ যন্ত্রণায় সহ্য করেছে। আর রাত্রির অন্ধকার যখন নেমে আসত তখন খোলা আকাশের নীচে অবিরাম বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করত কিভাবে চারিদিকে বন্যার জল বেড়ে তাদের কোন গ্রাস করতে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার মধ্যে তারা প্রহর গুনতো ভোরের আলোর জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই অসহায়ভাবে দেখেছে খরস্রোতা বন্যার জল তাদের আপনজনকে কীভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কিছুজনের জন্য শোক করবার চেতনাও তখন তাদের ছিলনা। এই মর্মন্তুদ দুঃখের পাঁচা অসংখ্য লোকের অশ্রু দিয়ে লেখা হয়ে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে।

এর আগে এত ব্যাপকভাবে এমন ধ্বংসকারী বন্যা এ রাজ্যে কোনদিন আসে নি। মাত্র তিন দিনের মধ্যে কোন কোন জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরপর তিনবার বন্যার কবলে পড়েছে। নিম্নচাপের গতিবিধি এবং বর্ষণের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা কোন সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারেননি। প্রাদেশিক আবহাওয়া দপ্তরের একজন মুখপাত্র স্বীকার করেছিলেন, এই প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবহাওয়া বিজ্ঞানের কোন নিয়মকানুন মেনে চলেনি। গত ১০০ বছরের মধ্যে এবারের বর্ষণ ছিল একটি রেকর্ড। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্ধমানে ৩৪২.৫ মিলিমিটার, বাঁকুড়ার ১৮০ মিলিমিটার হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে ১৬৪.৫ মিলিমিটার, কৃষ্ণনগরে ১৩৭.৩ মিলিমিটার এবং মেদিনীপুরে ১২৬.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। একমাত্র দামোদর বরাকর নদী ৮ লক্ষ ৫১ হাজার কিউসেক অতিরিক্ত বন্যার জল বহন করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলাই এই সর্বনাশা বন্যার শিকার হয়েছিল এবং এই বন্যা এসেছিল ধাপে ধাপে। প্রথম পর্যায়ে সেপ্টেম্বর

এঁদের বাড়ী ঘরের চলাচল। এমন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

মাসের গোড়ার দিকে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার দেখা দিল প্রবল বন্যা। গঙ্গার উজানে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে অতিরিক্ত বর্ষণে গঙ্গা-নদীতে যে জলস্ফীতি হয়েছিল তারই ফলে এই কটি জেলা প্লাবিত হয়েছিল। তারপর এল মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলী জেলার পালা। প্রবল বর্ষণে কংসাবতী, শালকেয়া এবং শীলাবতী নদী কূল ছাপিয়ে মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য গ্রাম ভাসিয়ে দিল। মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে প্রচুর জল ছাড়ার ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত বর্ষণ হওয়ায় দামোদর নদীতে দেখা দিল অসাধারণ জলস্ফীতি এবং হাওড়া এবং হুগলী জেলার বহু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে গেল।

এই দুই পর্যায়ের বন্যার ব্যাপকতা অন্যান্য বছরের তুলনায় তেমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তারপরই এল তৃতীয় পর্যায়ের বন্যা, যা রাজ্যের ১২টি জেলার জনজীবনে এনে দিল নজিরবিহীন দুঃখ-দুর্দশা। এই মহা-প্রলয় শুরু হয়েছিল ২৬শে সেপ্টেম্বরের রাত্রি থেকে। আর তার তাণ্ডব চলেছিল দুই সপ্তাহেরও বেশীদিন ধরে। মরার উপর খাঁড়ার ঘার মত আমরা পশ্চিম-বঙ্গের বুকে নেমে এল বিশাল প্লব। বিরামহীন প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর নদী রাজসী মূর্তি নিয়ে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী এবং বাঁকুড়ার বিশাল এলাকা গ্রাস করল। জলস্ফীত অজয় নদী বর্ধমান জেলার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ডি.ভি.সির বাঁধগুলি থেকেও জল ছাড়তে হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই এই চারটি জেলাতেই বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে গেল। স্থানীয় অত্যধিক বর্ষণ ও কংসাবতী বাঁধ থেকে ছেড়ে দেওয়া জল সমস্ত রূপনারায়ণ-হুগলী নদী অঞ্চলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল এবং মেদিনীপুর জেলার গ্রাম ও শহরগুলি আঠার জলের তলায় চলে গেল। অভূতপূর্ব স্থানীয় বর্ষণের ফলে অজয়, ভাগীরথী ও ময়ূরাক্ষী নদীও ধারণ করল ভয়ঙ্কর মূর্তি এবং বীরভূম,

হাওড়ার নারায়ণ হাসপাতাল জলে ডুবে আছে

বন্যাত্রাণ হাওড়া—এই ছবি হাওড়া-আমতা রাজপথ

হাওড়া জেলার একটি জলমগ্ন কারখানা

একটি বর্ষিষ্ণু গ্রামের অধিকাংশ জলের তোড়ে ভেসে গেছে

মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় সৃষ্টি করল মহা প্লাবন। নবদ্বীপের বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে মরুরাক্ষী নদীর তাণ্ডবলীলা আরো বেড়ে গেল। মালদহ জেলায় প্রবল বর্ষণসঞ্জাত গঙ্গা ও মহানন্দা নদী বহু অঞ্চল ভাসিয়ে দিল। পুরুলিয়া এবং ২৪ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলও অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে প্লাবিত হয়ে গেল। শহর কলকাতাও এই মহাপ্লাবন থেকে রেহাই পায়নি। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৭২২.৮ মিমি. বৃষ্টি-পাতের ফলে কলকাতা মহানগরী কেন জলে ভাসতে লাগল। কোথাও কোথাও ১০ থেকে ১২ ফুট সত্তীর জল দাঁড়িয়ে গেল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের ১০১ বছরের ইতিহাসে এটাই ছিল রেকর্ড বৃষ্টিপাত। ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিন কলকাতার বৃহত্তিতের কোন গমন ছিল না।

বন্যার এই দ্বিতীয়িকলমন্ত তৃতীয় পর্যায় চলল দিনের পর দিন। কোন জায়গা থেকে বন্যার জল সরে যেতে শুরু করার আগেই নতুন করে প্রবল বর্ষণের ফলে জলের মাত্রা আরো বেড়ে যেতে লাগল। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টিই শুধু নয়, নদীগুলির উজানে যার যার বর্ষণের ফলে বাঁধগুলি থেকে ক্ষণ ক্ষণ জল ছাড়ার জন্য লক্ষ লক্ষ বিপন্ন জনবসতীর জীবনে দিনের পর দিন চলল অবর্ণনীয় একটানা দুর্দশা।

এই ভয়াল পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ স্বভাবতই দুরূহ ছিল। ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে অন্তরায় ছিল অনেক। বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলো সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছিল অতল জলে, বহু সেতু ভেঙে গিয়েছিল প্রবল স্রোতে। রেলপথের নীচের মাটি ধসে গিয়ে বহু জায়গায় রেল লাইন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং টেলি যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বন্যা কবলিত এলাকাগুলির অধিকাংশ জায়গাতেই বন্যার প্রবল স্রোতে নৌকা কিংবা নৌকা চালানো সম্ভব ছিলনা। দিনের পর দিন খারাপ আবহাওয়া থাকার ফলে আকাশ পথেও ত্রাণের কাজ ব্যাহত হয়েছিল। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা শহরও প্লাবিত হয়ে যাওয়ার প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে ত্রাণের কাজে হাত দেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষেও সম্ভব ছিলনা। রাজ্য সরকার অবশ্য অবিলম্বে বিপুল আকারে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে-এ একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হল। সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে ত্রাণের আবেদন পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ও বড় বড় নৌকা বোঝাই খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সৈন্যবাহিনী ও বিমান বাহিনী রাজ্য সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বিমানবাহিনীর হেলি কপ্টার, ডাকোটা এবং পরিবহন বিমান বাগডোগরা, কলকাতা, কলাইকুণ্ডা এবং পানাগড় থেকে প্রচুর খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে শুরু করল নিরন্ন-নিরাশ্রয় জনবসতীদের কাছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকেও খাদ্য ও উদ্ধারের সাজ-সরঞ্জাম আকাশপথে এরাজ্যে নিয়ে আসা হল। ত্রাণের কাজে বিমান বাহিনীর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ অনেকক্ষেত্রে যারা অনেক বন্যাকবলিত অঞ্চল স্থলপথে পৌঁছতে পারেনি। ছিল এবং এইসব এলাকার বন্যাপীড়িতদের একমাত্র ভরসা ছিল বিমান থেকে নিক্ষেপ করা খাদ্য। সৈন্যবাহিনীর অবদানও কম ছিলনা। তারা নিয়ে এল অসংখ্য ট্রাক ও শক্তি চালিত নৌকা। সেনাবাহিনীর বা ছোট ছোট দল বন্যার তীব্র স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবিরাম পরিশ্রম করে দিনরাত্রি বিভিন্ন জেলায় বহু মানুষদের উদ্ধার করেছে এবং তাদেরকে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে।

● ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্যাদুর্গতদের জন্য ত্রাণের কাজে রাজ্য সরকারের একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ

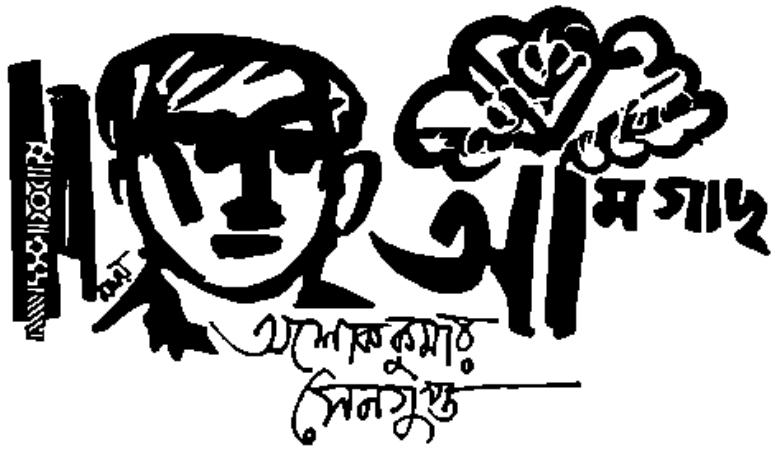

ধূর্জটিবন তিনমাস পর বাড়ী ফিরছে। পুজোয় আসার কথা ছিল। টাকা পাঠিয়ে আসা বন্ধ হতে হয়েছে। শম্ভু চলে গেল বাড়ী। মিঠে অসুখে পড়ল। সে বাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব দিতে জগৎজননী ট্রান্সপোর্টের ম্যানেজার বৃন্দাবন মাসি টাক মাথা নাচিয়ে বলে উঠল,—অসম্ভব। তারপর চোখ ছোট করে বলল, অত ঘন ঘন বাড়ী কেন? মায়া কাটাও। সংসারে তাপ কর।

লোকটা মহা ধড়িবাজ, মিটমিটে শয়তান। সব কথাতেই ইয়ার্কি, বয়স হয়েছে, কিন্তু রসে টইটম্বুর। সাদা ধবধবে সার্ট আর খাটো ধুতিতে যেন বিনয়ের অবতার। হাসির ব্যবহার প্রতিটি কথায়। মুখে পান, ঠোঁটে বিড়ি রেখে জগৎজননী ট্রান্সপোর্টের কেনা কড়া। ট্রান্সপোর্টের দুটি ট্রেলার, একটি লাইনের বাস। কিন্তু মালিক জ্যাসা বাদুড়ের কপাল বলতে হবে। গাড়ীগুলো খারাপ হতে জানে না। দুটি ট্রেলার নয় রূপসী মেয়েমানুষ যেন, চারজন ব্যবসাদারের এমন টানাহেঁচড়া লাগে।

যাহোক বাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে চাপ দিতে ধূর্জটিবন। বসেছিল ড্রাইভার জামিল। শুনে খিক খিক করে হাসল। বলল, তারজন্যে বৃন্দাবনদা সপ্তাহে দুবারে বাড়ী যান। বৃন্দাবন টাকের নিচের ভুরুজোড়া কপাল, তবু যদি বৌটার মুখমিষ্টি থাকত। সূর্যমুখী লজ্জা যেন। জামিল বিড়ি মুখে সাইডের বোতাম আলগা করে তারপর নিয়ে এল স্ত্রী প্রসঙ্গ। যৌবন জ্বালা, অশ্লীল কথাবার্তা, তার বৌকে টেনে তারসঙ্গে জুড়েই প্রবন্ধ বোঝাবুঝি। ব্যাপারটা চলে গেল কৌতুকের দিকে। তারমধ্যে বৃন্দাবন যেন গুপ্তধনের সন্ধান দিচ্ছে এমন ভঙ্গীতে বলল,—ডবল ইনকাম ছেড়ে মরতে পা ছাড়বি কেন? অমন সীরিয়াস হয়ে মনের ভেতর বাড়ীর জন্য আকুলিত বাতাস নিয়ে ধূর্জটিবন এসেছিল, তা উধাও। সেই রাতেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বোলপুর—সিউড়ী যাওয়া আসা, ঘন্টি বাজান। কণ্ডাক্টারীর যা জীবন। পুজোর দিনগুলো বাড়তি কিছু টাকা দিয়ে।

কিন্তু দুনিয়াতে টাকাটাই তো সব নয়! টাকার ভুসী প্রবন্ধা তাকে প্রফুল্ল রেখেছিল। মনকে ভুল করে দেয়নি। রাতে পরিশ্রমের ক্লান্তিসত্ত্বেও ছটফটানি মরেনি কিন্তু। তখন সে মনে মনে স্বর্ণ, তার যুবতী স্ত্রীকে বলত।

—দেখ, টাকাতো চাইলো! তুমিই তো বলেছিলে,—যেখানে কাজ পাও, সেখানেই চলে যাও। তা হুগলীর মানুষ এলাম বীরভূমে। মশাইের বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরির বিল্টু দত্ত নিয়ে গেল। কাজ শেষ হতে নতুন কাজ ধরল জলপাইগুড়িতে। আর আমি লেগে গেলাম জগৎজননী ট্রান্সপোর্টে। তোমার মত নিয়েই প্রবন্ধ। বীরভূম জলপাইগুড়ির চেয়ে ঘরের কাছে বলে তুমিও রাজী হলে। যাক্ সোজা কথাটা হল তোমার মতেই কাজ! লোকে তো মুখ দেখে পয়সা দেবে না। তাদেরও সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে। ধর বাস তো বন্ধ করা যায় না! শম্ভু নেই, আমি নেই, চালাবে কে? স্বর্ণ, রাগ করো না লক্ষ্মীটি! আমার কথাটা বোঝা। বিছানায় ছটফট করছি, ঘুম আসছে না।

এসবের মধ্যে মায়ের চারখানা চিঠি এসেছে। সে স্বর্ণকে দিয়েছে সাতখানা চিঠি। স্বর্ণ চিঠি লেখে না। হাতের লেখা খারাপ। ওই খারাপ হাতের লেখাই যে তার কাছে কত বড় শিল্পকলা, তা যদি বুঝত স্বর্ণ। চিঠিতে স্বর্ণকে সে লিখেছে, তোমার কাছেই মনপাখি আমার বাঁধা পড়িয়া আছে। তুমি নিশ্চয় তাহাকে দেখিতে পাও? লিখেছে, মনে হয় এখান হইতে পলাইয়া যাই, কিন্তু পায়ে আমার শিকল বাঁধা। এই শিকল তুমিই পরাইয়াছ। ঢিঠিতে তুমি আমাকে পাইবে, নইলে ঢিঠিতাম। লক্ষ্মীটি, একটি পত্র লিখিও, আমার বিরহযন্ত্রণা কিঞ্চিত লাঘব হইবে। প্রাণপাখি খাঁচিবে। স্বর্ণ লেখেনি। তবে মায়ের চিঠিতে থাকে, বৌমার জন্য চিন্তা করিও না। সে ভাল আছে।

হাওড়া থেকে সাতাশ এ বাসে মশাই নেমে ধূর্জটিবন চলল, রাধাবল্লভপুরের মিনিবাস এইমাত্র বেরিয়ে গেল। অন্তত ঘন্টা দেড়েকের অপেক্ষা। তবে শীতের দিন। রোদের তাপ বাড়লেও মিষ্টতা আছে। দেরী হচ্ছে, হোক না। কে কেমন আছে কে জানে! মায়ের কথাও মনে পড়ছে না। সে কেন এরকম লজ্জা অনুভব করছে? এতদিন বাইরে থেকে ফিরছে বলে! মোড়টায় বাজার বসে। এখন ভাঙা বাজার। বিকেলে ভাই বসবে। বেনারস রোডের উপর গাড়ী দুইছে। খাবারের দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চিতে ব্যাগটাকে রেখে ধূর্জটিবন বসল।

মিনিবাস ঘুরে আসতে ভুবনমোহন সঙ্গে দেখা হল। পাড়ার দাদা। প্রত্যহ পাতাড় সম্পর্কটা এত দূরের। ওর মুখেই শুনল মায়ের খবর সব ভাল। ধীরেনের সঙ্গেও মারা গিয়েছেন। অন্যান্য

শান্তির বিয়ে হয়েছে। মা, স্বর্ণ তাল আছে। মায়ের জ্বর হয়েছিল কিছুদিন আগে। এখন ভাল। যাক্ নিশ্চিন্ত। সি.ই বসে বিড়ি ধরাল ধূলিপদ।

জ্বর জানার পর বাসে, তারপরে মাইলখানেক হাঁটায়, পানাভর্তি কৌশকী নদীর পুল ডিঙিয়ে খৌপজাড়ের ভেতর দিকে পুকুর তোধা পাশে রেখে ঘরের দুয়ার পর্যন্ত মোটামুটি সে নিশ্চিন্ত ছিল। বাড়ীতে পা দিয়েই বুকটা ধাঁৎ করে উঠল। ধেড়ার আগলটা সরিয়ে মাকে ডাক দিতেই এলেন। ব্যাগটাও নিলেন। মিষ্টি আর নিজের জামাকাপড় ছাড়া ব্যাগে কিছু আনে না। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু কেন জানি মনে হল মায়ের আপ্যায়নে যেন তফাত। তারপর স্বর্ণর রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়া। কপালের সিঁদুর লাগাতে থাকল। লাল-শাড়ীর সামান্য অংশ দেখা গেল মাত্র। কি হয়েছে!

মুখ হাত ধুয়ে ভাল মেয়ে বিশ্রামের সময় সে হিসেব করে দেখল, স্বর্ণ তাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে। হুঁ, এটা ধরবার কথা নয়। সুযোগ এর মধ্যে ধরেছিল কয়েক আসার। এখনও তো পান হাতে আসতে পারে। পরিষ্কার দেখাও হয়নি ওকে। লাল শাড়ীটা বুঝি পুজোয় কিনেছে। সে শাখোজকথা, সীঁথাপাটী, ঈষৎ লম্বাটে মুখের আয়ত চোখের স্ত্রীকে লালশাড়ীতে দেখতে ভালবাসে। মেয়েরও তাই ওই শাড়ী কেনা। হুঁ, অভিমান হয়েছে। কিন্তু রাত্রির তো এখনও ঢের দেরী।

শুধুই অভিমান। স্বর্ণ বলে না, তুমি আসতে দেরী করলে রাগ হয়। মনে হয় কিছুতেই তোমার কাছে যাব না। এলে আর সামলাতে পারি না নিজেকে। ধূলিপদ বলেছিল, দেখ তাহলে কত আদর প্রতাপ। ঠোঁট বেঁকিয়ে স্বর্ণ বলেছিল, প্রতাপ না ছাই। মায়ার। বুঝেছ, জানি আদা, বেচারা কেমন জলজলে চোখে তাকাচ্ছে। যাই, নইলে হয়ত কেঁদেই ফেলবে। আমি আবার কান্না দেখতে পারি না কিনা। হুঁ, তাইজন্যেও তো আসা উচিত ছিল। কি হয়েছে।

শীতের বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরায়। রোদের রক্তিম ফোঁটা নারকেল পাতায় দোলা যায়। তারপর টুপ করে খসে পড়ে। ধূলিপদ এখন মনে হয়, পড়ছে না। কে যেন ধরে আছে। রাত্রি যে কখন হবে। স্বর্ণকে চাই। তাকবে নাকি?

—এক গ্লাস জল দেবি।

মা জল বাড়িয়ে দিলেন শুধু। আসও পড়লেন। সাদা থানের ঘোমটার মধ্যে চিন্তিত বলি রেখাঙ্কিত ভারী মুখখানা। কত রোগা ছিলেন মা। বছর চারেক হল খুলতা রোগে ধরেছে। হুঁ, বাবার মৃত্যুর পর।

মা কোনরকম ভূমিকা না করেই সুরু করলেন, জামিস ঘোষের জামগাছ নিয়ে আবার গণ্ডগোল হয়েছে।

আর বলার দরকার করে না। ঘরের যাওয়া ঘোলাটে কেন বোঝা গেল। বিবাদটা দীর্ঘদিনের। দু'জমির মাঝে গাছ। ওড়িটা দু'পাশ সমানভাবে অধিকার করে আছে। নৃপতি ঘোষ বলে আমার, ধূলিপদরা বলে, আমার। দু'পক্ষই অধিকার বজায় রাখতে গুটি জাম পাড়ে। স্বর্ণ নৃপতি ঘোষের মেয়ে। পক্ষের মেয়ের সঙ্গে আমগাছকে কেন্দ্র করেই প্রেম। তারপর বিয়ে। মেয়ের দোষ, কাতটা করিয়েছে। মায়ধোর ছেলেও নাকি বুলি ছাড়েনি,—বিয়ে করবই আমি ওকে। যাক্, তারপর আর কোন বিবাদ হয়নি।

—নারায়ণ বলেছে গাছটা কেটে নেবে। আমি আপত্তি করেছি। তোর বাবাও গাছ কেটে নতুন বাড়ীর দরজা জানালা বানানোর মতলব ছিল। তা বাড়ীই তো হল না। না হোক, তুই বলবি। নারায়ণ বাড়ী ফেঁদেছে। গাছ চাই।

—চাই বললেই হল। গাছ আমাদের। আসুক না একবার। ধূলিপদ ওয়েছিল। উত্তেজনায় উঠে বসেছে।

—আস্তে বল খোকা।

—আস্তে কেন? ভয় কাকে?

—বৌমা দাদার দিকে।

আঁ। চোখের তারা স্থির হয়ে গেল ধূলিপদর। ও মেয়েই না বিয়ের আগে স্বীকার করেছিল, গাছটা তোমাদের। বাবা দাদা মিথ্যে বলছে। কি করব। ঘরের সবাই বলত তাই কথাটা বলতাম। নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করেছিল না সে।

—আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

—বলার দরকার নেই। গাছ আমাদের বাস। ওরা কাটতে লোক লাগায়নি তো।

—না। এখন শোনাচ্ছে। আমাদিকে বাজিয়ে দেখছে। মা ছেলের সাড়ে ভারী খুশীর ভাবী কল্পজন।

রাত্রিবেলায় চার দেওয়ালের মধ্যে স্বর্ণকে পেল ধূলিপদ। সাজেনি। সেই লাল শাড়ী। কোন প্রসাধন নেই মুখে। বিশুষ্ক, বিমর্ষ, চাপা ক্ষোভ। টের পেয়ে গিয়েছে পক্ষের পুরীতে বাস। হাতে কাঁচের চুড়ি, কানে দুল। তবু শাড়ীদেরা তার যুবতী স্ত্রীর মধ্যে সে তিনমাসের ব্যবধানকে টের পায় আরও যেন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে স্বর্ণ। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ আগের চেয়ে আরও তীব্র। দু'হাত তার ব্যাকুল হয়। রক্ত ধারার উষ্ণতা বাড়ে।

—কাছে এসো তো। মরে যাচ্ছি। ধূলিপদ সব ভুলে অন্তরঙ্গ হতে চায়।

স্বর্ণ আসে। পাশে বসে। কিন্তু কপালে সাদরে হাত বুলায় না। রোগা হয়েছে বলে রাগ করে না। তিনমাসের ব্যবধানে তাদের দূরত্ব যে কত কঠিন ছিল, তা আদুরে স্পর্শে, আশ্লিষ্ট হয়ে যন্ত্রণার মত ঠেকে না।

—রাগ কেন এত।

—কোথায় রাগ।

—মুখেই মালুম। ধূলিপদ কাছে টানে। ও পক্ষ আপত্তি করে না কেন জানি। তবে মুখ ঘোরায় না। ফলে ধূলিপদকে বলতে হয়,—বুঝতে পারছি, আমগাছটার জন্যে তো। সে আমাদের ব্যাপার। তোমাকে ভাবতে হবে না। কল্পনা...।

—কল্পনা কিসের। স্বর্ণ এবার ঘর তোমে, গাছটা বাবার। দাদা কাটবে। বস।

—চমৎকার। ধূলিপদর কামনার রঙ ফিকে হয়ে যায়। বলে, কবে হল। চিরকাল তো ওটা আমাদের।

—মিথ্যা বলো না।

—বাংলো যুধিষ্ঠির অন্যা, মিথ্যা বলিনি।

—যুধিষ্ঠির অনেককেই বিয়ের জন্যে দেখেছিলে একদিন মনে রেখো।

—তুমি না আমি।

স্বর্ণ হাসায়। কিন্তু ধামে না। বলে যায়—শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে চেয়ে নাও। মস্তানি করতে যেও না। দাদা ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেবে। ঘর করছে দাদা। দরজা জানলার কাঠ কিনবার ক্ষমতা ওর আছে।

—দান নেব তোমার দাদার?

—দান নেবে না! আমাকেও দানই করেছেন তো।

দান! ধূলিপদ বুক পাইলে করে,—নিয়ে এসেছি জোর করে।

ঠোঁট বেঁকায় স্বর্ণ—ও কত ক্ষমতা!

—দেখতেই পাবে। আমদাহ কেউ তক্তা খানাতে হবে না। পিটিয়ে তোমার দাদাকেই তক্তা খানিয়ে দেব। হ্যাঁ, আমার নাম ধূলিপদ। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে ধূলিপদ।

—ওরে বীরপুরুষ। তবু যদি হাতগুলো লোমা থেত।

—চোপ। মেয়েছেলে না হলে এক থাপ্পড় মারতাম।

—তোমার মার খাবার জন্যে তাহলে বেটা ছেলে হতে হবে। কি মুরোদগো প্যালোর!

দু'জনের চাপা গর্জন চার দেওয়ালে প্রতিহত হয়। রাত্রি বাড়ে। একসময় দু'জনেই বিছানার দু'প্রান্তে দুটি কাষ্ঠ খণ্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা স্বর্ণ বাপের বাড়ী যেতে চায়। লোটা চারেক বাড়ী পেরুলেই বাপের বাড়ী। ধূলিপদ মোটেই আপত্তি করে না। মাও বাধা দেন না। আমগাছটার অধিকার এত সহজে ছেড়ে দিতে হবে। শুধু বৌয়ের জন্যে। তিনদিন থেকে ধূলিপদ ফিরে যায় আবার। বলে যায়, ও মেয়েকে ছুকতে দিও না। ওরা আমদাহ কাটলেই খবর দিও। চৈলিয়াম করবে। পেয়েছি কি এসেছি। তুমি তত-ক্ষণ আটকাবে।

দেখতে দেখতে দিন যায়। মায়ের চিঠি আসে। নারায়ণ আমদাছটা কাটেনি। লোধকরি কোন মাতব্বর পর বুঝেছে কাজটা সহজে হবার নয়। স্বর্ণও বাপের বাড়ীতেই আছে। ধূলিপদ কিন্তু বাড়ী আসেনি। হাঁ একেবারে কুরুক্ষেত্রে সে নামবে। স্বর্ণ এবং তার ভালবাসার স্মৃতি, পাশুপতজীবনের মধিষ্ঠ মধুর ছবি মনে এলেই সে আমগাছটায় কথা ভাবে। সবুজ পাতা, লটাঠঠা গায়ের কালো গুঁড়ি। ছুঁড়ে ফেলার মত ছিটকে যায় স্মৃতি ছবি। মায়ের চিঠিতে আমগাছের প্রসঙ্গ বেশই থাকে। মাকে সেইই জানাতে লিখেছে। মুকুল ধরার সংবাদ সে পায়। কেমন গুটি হয়েছে, তাও জেনে ফেলে। এসব কেনদিনই সে জানতে চায়নি। শম্ভু, কৃষ্ণাবন মাঝি, জামিল, প্রদ্যোত সবার কাছেই সে আমগাছের কথাটা শোনায়। স্বর্ণ প্রসঙ্গ অবশ্য বাদ থাকে। স্বপ্নটাও। এমন কি পাকা হলে আম যে চমৎকার স্বাদের হয়, এবার খাওয়াবে, এমন প্রলোভন দেখাতেও কসুর করে না।

চৈত্রমাসের শেষ দিকে মায়ের চিঠি আসে। মা লিখেছেন, আমগাছটির ভিতরটি একেবারে ফাঁপা ছিল। এতদিন বুঝা যায় নাই। কিভাবে যেন নষ্ট হইয়া গিয়েছে। পুরান ছাড়া কোন কাজেই লাগিবে না। নারায়ণ হাট বাড়াইতেছে না। লোকে ডাল ভাঙিতেছে। ওনিলাম উহারা লইবে না। পোড়ার কাঠ আমিইবা কেন লইব। আধাআধি হইলে রাজী হওয়া ভাল! না হয় লোকে লইয়া যাক। পোড়ার কাঠের দাম কতইবা। শুধু শুধু উহাদের সহিত বিবাদ কেন? উহারা শুনিতে পাইতেছি, এরূপ কথাবার্তাই বলিতেছে। তুমি আসিলে ভাল হয়। বৌমা এখন আসিতে চায়। আসিব কিনা জানাইও।

ধূলিপদ উত্তর লিখে ফেলল চটপট, তোমার বৌকে লইয়া আসিবে।

আমগাছের কোন কথাই চিঠিতে থাকল না। শুধু ভাবল, ভালিয়াস ফাঁপা ছিল। ভালিয়াস ঝড় হয়েছে। বাইরের সবুজ পাতার চেকনাই রেখে কি ঠকান না ঠকিয়েছিল এতবছর।

জানা অজানা

১। বিশ্বে সর্বপ্রথম কোন্ দুটি স্থানের মধ্যে বিমানডাক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল?

২। রাজস্থানের কেল্লা কিজন্য প্রসিদ্ধ?

৩। বেদব্যাস রচিত মহাভারতের শব্দটি সংখ্যা কত?

৪। কাঁচ (Glass) তৈরীর উপাদান কি কি?

৫। ভারতে কোন্ ধর্মীয় সংস্থা এবছর শতবর্ষপূর্তি উদযাপন করছেন?

৬। কোন্ খেলায় বিজয়ী দলকে থিস্ হটাতে হয়?

৭। ভারতের প্রধান অ্যাটর্নি জেনারেল কে?

৮। ১৯৭৭ সালের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী কে?

গ্রাম বাঙলার কড়চা

গ্রাম বাঙলার নদীপথে আপনি কখনো ভাওয়ালী মাঝির সঙ্গী হয়েছেন? শুনেছেন কি তার সপ্রাণ গলার সেই গান: 'মন মাঝিরে তোর বৈঠা নেরে... আমি আর বাইতে পারলাম না' অথবা 'নদীর এপার ভাঙে ওপার গড়ে এই তো নদীর খেলা, সকালবেলায় রাজারে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা।' উদাস নদীর সেই ভাওয়ালী তো বাংলার চিরকালীন। তার ওপর আজ সেই নদীরই অন্য প্রলয়ঙ্করী রূপ পশ্চিম বাংলার সর্বত্র দেখা গেল। মহাপ্লাবনে প্রসারিত গ্রামবাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন নদীতে রূপ নিয়েছে। ক্ষেত-খামার, ঘরবাড়ী গাছপালা সব জলে ডুবে একাকার। হাজার হাজার গ্রামে লোহা গ্রামটাই নদী। একলাল মাঝি, সতীশ মণ্ডল সবার সর্বস্ব গিয়েছে। তাই গান ভাসছে না আজ নদীপথে, ভাসছে মরা গরুছাগল, মানুষ জন আর কান্নার আওয়াজ।

নদীয়া জেলায় এবারের মত প্রবল বন্যা কখনো দেখিনি। চাকদহ থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, রানাঘাটের বহু গ্রাম বন্যার কবলে। ভাগীরথী নদীর এখন বিকট রূপ, নদীপারের সব গ্রাম এখন সমুদ্র। সাতেলচর, কালীপুর, কালিদহ, গিরীপুর, মদনপুর, সরাটি, চরগঙ্গানমনোহরপুর, চরজাজিরা, চরনওসরাই, চরবীরপাড়া, চাঁদমারি, মাঝেরচর গ্রামগুলোর ঘর-বাড়ী সব ভাসছে। তারা কেননতে প্রাণ সম্বল করে কল্যাণী এবং আশেপাশের উঁচু জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে। বীরপাড়া এবং আশপাশের গ্রামে যাবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু যাবো কী করে একটি নৌকাও পর্যন্ত নেই। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। কোথাও বা ডুমানুষ ডুবু।

কাঁঠালতলার দেখা হরেকেষ্ট পদসের সঙ্গে। কপাল চাপড়াচ্ছে বসে বসে। সারা বছরের আউনীর ফসল পাই সব জলে ভেসে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলাম তার এবার দশ বারো মন পাই হত। কিন্তু এখন সে ফকির। আগামীকাল কি খাবে সে সম্বলটুকও হাতে নেই। মণীন্দ্র শীল কাঁদতে কাঁদতে জানাল—সারা বছরের যা ধান ঘরে ছিল সব গেছে। একটা ধানও বাচাতে পারিনি। করিম মোল্লা জানাল তার হালের বলদ দুটি ভেসে গিয়েছে। এবার চাষ করার কোন উপায়ই তার নেই।

তাদের সঙ্গে মেঠো পথ দিয়ে নদীপার ঘুরেছিলাম অনেকটা। দেখেছিলাম নদী তাণ্ডবে প্রচণ্ডরূপে। চরগঙ্গানমনোহরপুর গ্রাম তখন পুরোটাই জলের তলায়। হয়তো অচিরে গঙ্গানমনোহরপুর, চরসরাই গ্রামের অনেকটা তলিয়ে যাবে ভেবে-ছিলাম। সেদিন নির্মল পাস দুঃখ করে বলেছিল—তারা জমি কিস্তী করতে পারেনি। পাও এগিয়ে এসেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের জমি ভাঙবে। তখন দেখেছিলাম নদীর মাঝখানে চর জেগে উঠছে। তাদেরকে বলেছিলাম ওসব

ভাঙছে গা আসছে বান

চরের জমি তোমরা পাবে না? জানতে পেরেছিলাম চরের জমি নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। যার গায়ের জোর আছে সেই দখল করবে চরা জমি। গ্রামবাসী সেদিন দাবী করেছিল সরকার থেকে পাড় না বাধালে জমির ভাঙন ঠেকবে না। ক্রমশ পাও এগিয়ে আসবে গোটা গ্রামগুলো গ্রাস নেবে এই সর্বনাশা পাওে।

কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। এরপর বন্যার প্রচণ্ড তাণ্ডব গত প্রকৃতির অকৃপণ করুণা আজ অবাক্তিগত ভাবে বইতে শুরু করেছে। আলবিল নদীমালা বাড়ীঘর সব আজ পাও ...শুধু জল আর জল। অথচ গাঙের মানুষদের আবার বাঁচতে হবে। দরকার হবে হালের গরু, ধানের বীজ, থাকার ঠাঁই, পড়ানের কাপড়, দুবেলা দুমঠো দানাপানি। সবার চোখে মুখে শুধু সেই চিন্তা। গাঙের ২৫ সোয়াপী সন্ধ্যাদিদির হাতে তাই প্রার্থনা জানাই, "মা গঙ্গা সব নিয়েছ আবার সব ফিরিয়ে দাও মা... আবার প্রাণভরে দোল দুর্গোৎসব করব..." জলের মাঝে মিলে যায় কথাগুলো... প্রতিধ্বনি হয়তো মুখ ভাঙচায়।

রসুল মিঞা

রাখাল দত্ত

রেকর্ড খাদ্যোৎপাদনের নেপথ্যে

এবছর (১৯৭৭-৭৮) বারো কোটি আট লক্ষ টন খাদ্যশস্য ফলিয়ে আমরা সর্বকালীন রেকর্ড করেছি। ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালের ১২ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ফলনের রেকর্ডটিও এবার তেঙে গেল। ১৯৭৬-৭৭ সালে অবশ্য উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১১ কোটি ১৬ লক্ষ টনের মত। তবে এই উৎপাদন কমে যাওয়ার বড় কারণ ছিল অরিষ মরশুমের প্রতিকূল আবহাওয়া। ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যতটা জমিতে খাদ্যশস্য লাগানো হয়েছিল তা প্রায় ৩.২ শতাংশ কমে যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ঠিক সময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ার জন্য কম জমিতে চাষ হয় ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও কমে। কিন্তু এখানে যা বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় তা হল ১৯৭৬-৭৭ সালের এই তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ সাল বাদ দিয়ে সত্তরের দশকের পূর্ববর্তী যে কোনও বছরের উৎপাদনের চেয়ে বেশি। ১৯৭০-৭১ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু তার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টন।

এই অতিরিক্ত থেকে আমরা একটা বিষয় জানতে পারছি। তা হল, আবহাওয়া ভারতীয় কৃষির পক্ষে আজও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষি অর্থনীতিতে বিবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে উৎপাদনে ওঠানামা আগের চেয়ে বহুলাংশে কমে গেছে।

১৯৭৭-৭৮-এর ১২ কোটি ৬০ লক্ষ টনের রেকর্ড উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১২.৯ শতাংশ বেশি। এবছর চালের উৎপাদন বেড়েছিল ১৯৭৬-৭৭-এর ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টন থেকে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টন বা ২৩.৪ শতাংশ। গমের উৎপাদন একই সময়ে বাড়ে ২ কোটি ৯১ লক্ষ টন থেকে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টনে বা ৮.৩ শতাংশ। অনুরূপভাবে অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছিল ৪.২ শতাংশে, তার জাতীয় শস্যের উৎপাদন ৬.২ শতাংশে, আখ ১৬.১ শতাংশে, তৈলবীজ ১৫.৪ শতাংশে, বাদামে ১৫.৪ শতাংশে এবং কাপাস তুলো ২২.৮ শতাংশে। বস্তুত, ভারতীয় কৃষিতে ১৯৭৭-৭৮ সালের মত আগে কখনই আসেনি।

কিন্তু এটুকু বলেই যদি আমরা থেমে যাই তাহলে যথেষ্ট হবে না। আজ সেটা আরও বেশি দরকার তা হচ্ছে গত বছরের এই অভূতপূর্ব উৎপাদনের কারণ খুঁজে বের করা এবং তা থেকে আগামী দিনের কৃষি কার্যক্রমের শিক্ষা নেওয়া। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ১৯৭৭-৭৮-এর রেকর্ড কৃষি উৎপাদন কোনও হাত না বদলের ফলশ্রুতি নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই এক ধরনের তৈরী হয়ে আসছিল এবং দ্বিতীয় "সবুজ বিপ্লব" বলি বা না বলি দেশ আজ আবার একটা মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ বছরের (১৯৭৭-৭৮) রেকর্ড উৎপাদনের কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কথা। ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টার জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৩-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ এই দুই বছর ভারতীয় কৃষি প্রচণ্ড খরার কবলে পড়ে। এই কারণেই ১৯৬৭-৬৮ সালে সেচ-ব্যবস্থা প্রসারের উপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়। আমরা একথাও জানি, অল্প দিনের মধ্যে তাতে ভাল ফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তারপর এ দিকে কিছুটা ঢিলেমি দেখতে পাই ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে সামগ্রিকভাবে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় ১৩ লক্ষ হেক্টারের কিছু বেশি জমিতে। পরবর্তী বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে সেচব্যবস্থা জোর করা হয় ১৫ লক্ষ হেক্টার জমিতে। ১৯৭৬ সালে নতুন করে ২০ লক্ষ হেক্টার জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ১৯৭৭-৭৮-এর কৃষি মরশুমে এই সুবিধা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছিল প্রায় ২৪ লক্ষ হেক্টার জমির ক্ষেত্রে। এর মধ্যে ১৩ লক্ষ হেক্টার জমি বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্প এবং ১১ লক্ষ হেক্টার জমি ছোট সেচ প্রকল্পের আওতায় ফেলা হয়েছিল। এই লক্ষ্যমাত্রার কতটা অর্জন করা গেছে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত হিসাব না পাওয়া গেলেও মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে গত বছর প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টারের মত জমিতে নতুন করে সেচব্যবস্থা সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক বছরের সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ১৯৭৭-৭৮ সালে কৃষিতে রেকর্ড উৎপাদনের একটা বড় কারণ।

সেচের সুযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে জড়িয়ে রয়েছে অধিক উৎপাদনশীল বীজের বহুল ব্যবহার। ১৯৬৮-৬৯ সালে মোট ৭২ লক্ষ হেক্টার জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহৃত হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে গিয়ে ১৯৭৯-৭২-এ দাঁড়ায় ১ কোটি ৮১ লক্ষ হেক্টারে। পরের বছর নতুন করে আরও ৪০ লক্ষ হেক্টার জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রয়োগ করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে আরও ৪০ লক্ষ হেক্টার জমিতে এ ধরনের বীজ দেওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তী বছরে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রতিরিক্ত মাত্র ১০ লক্ষ হেক্টার জমিতে লাগানো হয়েছিল।

কিন্তু আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৭৫-৭৬ সালে উচ্চ ফলনশীল বীজের অধীন জমির পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫-এর ২ কোটি ৭০ লক্ষ হেকটার থেকে বেড়ে হয় ৩ কোটি ২১ লক্ষ হেকটার। ১৯৭৬-৭৭ সালে এ ধরনের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ হেকটার এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ হেকটার। এ ভাবে কমেই বেশি জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রয়োগ করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উচ্চ ফলনশীল বীজের বর্ধিত ব্যবহার এই দুই দিকেই একটা পরিবর্তন উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব রাজ্যে ভাল সেচের সুবিধা ছিল না সেখানেও তা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার ইত্যাদির কথা বলা যায়। উচ্চ ফলনশীল বীজের বেলায়ও একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। গোড়ার দিকে শুধুমাত্র ৪ ধরনের বীজের ব্যবহার উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যেই বেশি হত। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতে যত জমিতে উচ্চ ফলনশীল গম লাগানো হয়েছিল তার ৭৬ শতাংশ জমি ছিল পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে। ১৯৭৪-৭৫ সালে এই অনুপাত কমে আসে ৪২ শতাংশে। ধান বা চালের বেলায়ও একই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এই দুটি রাজ্য ভারতে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজের প্রযোজ্য জমির ৪৫ শতাংশের অধিকারী ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশের মত।

কৃষিতে নতুন যে প্রযুক্তিবিদ্যা গত দশ বছর ধরে আমাদের দেশে ব্যবহার করা হয়েছে তার আর একটা অঙ্গ রাসায়নিক সারের ব্যবহার। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ আমাদের দেশে খুব বেশি দিন ধরে হচ্ছে না। ১৯৬৮-৬৯ সালেও মাত্র ১৮ লক্ষ টনের মত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়েছিল। পরের বছর তা বেড়ে ২০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাক্রমে ২৪ লক্ষ টন, ২৭ লক্ষ টন, ২৮ লক্ষ টন এবং প্রায় ২১ লক্ষ টন করা হয়েছিল। কিন্তু পেট্রোলিয়ামের দাম বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত পৃথিবীতে রাসায়নিক সার তুলনায় দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে গিয়ে ২৬ লক্ষ টন হয়। ভারত সরকার তার পর বেশ কয়েক বার রাসায়নিক সারের দাম কমান এবং ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে আবার রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়তে সুরু করে। ১৯৭৬-৭৭ সালে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়েছিল ৩৪ লক্ষ টনের মত। গত বছর, অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ৪৩ লক্ষ টন। কীট-নাশক পদার্থের ব্যবহারও গত বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১৭.২ শতাংশ বাড়ে।

নিঃসন্দেহে ভারতীয় কৃষিতে আজ যে জোয়ার আসো দেখা যাচ্ছে তাতে এই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান অনেকখানি। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এই প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতীয় চাষীদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা খুব সহজ ছিল না। গত কয়েক বছরের চেষ্টায় কাজকটী প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং কৃষি সংস্কারের অসমাপ্ত কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে ১০ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ একর জমি বণ্টন করা হয়েছে এবং সমস্ত দেশে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ জমি সুসংহত করা হয়েছে। জমির এই সুসংহতির ফলে মাটি ও জলের আরও ভাল বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে সরকারী নীতিতেও একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এতদিন কৃষককে ন্যায্য মূল্য দেবার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল না। কিন্তু একথা আজ স্পষ্ট যে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হতে হলে চাষীকে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত দাম দিতে হবে। তা না হলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাঁর উৎসাহ থাকবে না। ১৯৭৭-৭৮ সালে ধানের পরিপোষক মূল্য (সরকার যে দামে ধান কিনতে বাধ্য) বাড়িয়ে ১৯৫ টাকা করা হয় এবং গমের পরিপোষক মূল্য করা হয় ৭৭ টাকা। আন্তঃরাজ্য চলাচলে সব বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে উৎপাদকরা খোলা বাজার থেকে সর্বোচ্চ দাম পেতে সক্ষম হচ্ছেন। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য আগে প্রচুর ভাল (বিশেষত খোলা) উৎপন্ন হত। কিন্তু সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য বর্তমানে চাষীরা গম উৎপাদন থেকে বেশি লাভবান হন। এই পরিস্থিতিতে সরকার খোলার পরিপোষক মূল্য ৩০ টাকা বাড়িয়ে প্রতি কুইন্টাল ১২৫ টাকা করেছিলেন। কাপাস তুলো, তৈলবীজ এবং পাটের পরিপোষক মূল্যও বাড়ানো হয়েছিল।

কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিঋণের গুরুত্ব অসীম। ১৯৭৩ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃষকদের মোট ১৬৯১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। ১৯৭৫ সালে এ ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৩০৮ কোটি ৬০ লক্ষে এবং গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে মোট ২৭৫০ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়। অবশ্য ভারতের ৭ কোটি ৫ লক্ষ জোতের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ জোতেই জমির পরিমাণ দুই হেকটারের কম। এই সব ছোট চাষী ও গ্রামীণ সমাজের দুর্বলতর অংশ মোট ঋণের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছিল। সরকার চেষ্টা করছেন যাতে তাঁদের ভাগ অন্তত ৫০ শতাংশে তোলা যায়।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি নিয়ে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন সাধারণ প্রকল্পের সুযোগসুবিধা গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতর শ্রেণীর হাতে পৌঁছানো কত কষ্টসাধ্য। এজন্যই আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প প্রবর্তিত করেছি। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য, ছোট চাষী উন্নয়ন এজেন্সি প্রকল্প, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন

● শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

খেত খামার

বিনা সেচে গম চাষ

এবারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পশ্চিম-বাংলার চাষবাসের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। চাষীভাইদের মাথায় হাত। শেষ পর্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিকাশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে। যাই হোক এই বিপদের দিনে আমাদের আবার আশায় বুক বাঁধতে হবে। লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে আবার মাটির সাথে বোঝাপড়া করতে হবে।

এ সময় ভাদো বর্ষা হয়েছে। তমিতে রসও আছে বেশ। এই রসের সুযোগ নিয়ে বিনা 'সেচে' গম আবাদো যেতে পারে। সাধারণভাবে গমচাষে তিনটি সেচই যথেষ্ট। কৃষি বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, তলদি জাতের গম কার্তিক-এর মাঝামাঝি বোনা চলে। নাবি জাতের গম অবশ্য অগ্রহায়ণ মাস ছুঁয়েই বোনা যেতে পারে। উত্তমানের গম বীজের জন্য, ক্ষেতের যে সব এলাকায় সবচেয়ে ভাল গম হয় সে সব এলাকা আগামী বছরের বীজের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। প্রতি বছরই কিন্তু নতুন গমবীজ ব্যবহার করার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করে থাকেন। দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফসল অনেক ভাল এবং বেশী পাওয়া যায়। এই রাজ্যের মৃত্তিকাভূমিতে সাধারণত 'কল্যাণসোনা', 'সোনালিকা' এবং 'কনক' জাতের বীজ বোনার জন্য জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকগণ সুপারিশ করেন। তবে নাবি বুনতে হলে কেবল-মাত্র 'সোনালিকা' ও 'কনক' জাতের গম বোনাই শ্রেয়। এইসব গমের বীজ বিভিন্ন বীজ খামারে পাওয়া যায়। চাষীভাইরেরা যদি বিভিন্ন ডিলারের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে চান তবে অবশ্যই দেখবেন সেটি যেন সার্টিফায়েড বীজ হয়।

সোনালিকা গম তাড়াতাড়ি পাকে। ১০ দিনে ফুল আসে এবং পাকে ১০৫-১০৫ দিনে। ফলন পাওয়া যায় একর প্রতি গড়ে ১১-১৪ কুইন্টাল। কনক জাতীয় গমেরও ফুল আসে ৯০ দিনে এবং পাকে ১১৩-১২০ দিনে। আর ফলন পাওয়া যায় গড়ে একর প্রতি ১১-১৬ কুইন্টাল।

চাষীভাইয়েরা গমের জমিতে নতুন ধরনের আগাছা যেমন 'বুনো জই' এবং 'ক্যানারিস' সম্বন্ধে সাবধান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ, গমচাষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতার কথাও বার বার ঘোষণা করেছেন। উন্নতবীজ বপনের জন্য আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, আসুন আমরা গম চাষ করে তার কিছুটা পূরণ করতে পারি কিনা।

মুকুল বাগচী

এই মহাপ্লাবন

৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

রাজ্য পুলিস ও চলমান বেসামরিক জরুরী বাহিনী বন্যার্তদের ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করে গেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে। দেশী-বিদেশী বহু স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থাও ত্রাণের কাজে সামিল হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী ও বাংলাদেশ সরকারও ত্রাণের আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ও ইউনিসেফ থেকেও এসেছিল বহু ত্রাণসামগ্রী।

বন্যার্তদের দুর্দশা এখানেই শেষ হয়নি। বন্যার পায়ে পায়ে আসে মারী। জল সরার সঙ্গে সঙ্গেই তাই কলেরা ও আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ দেখা দিল। প্রধান কারণ ছিল পানীয় জলের অভাব। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে পৌর জলসরবরাহ ও গ্রামীণ জলসরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষের মৃতদেহ ও গবাদি পশুর লাশ বহু জলে ভাসছিল। এই পরিস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষের জীবন রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল ব্যাপক আকারে চিকিৎসা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। বহু সংখ্যক ডাক্তার ও প্রচুর পরিমাণে ওষুধ ও বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ ছড়ানো হল।

বন্যার জল প্রায় সব জায়গা থেকেই এখন সরে গেছে। কিন্তু এই মহাসঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে সময় লাগবে অনেক। এখন যে বিরাট কাজ সামনে রয়েছে তা হল পুনর্বাসনের কাজ—বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসন এবং রাজ্যের পর্যুদস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন। এই মহাপ্লাবনের কবলে পড়েছিল রাজ্যের ১২টি জেলার দেড় কোটিরও বেশী লোক, অর্থাৎ রাজ্যের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন। যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন দেখা যাচ্ছে বিরাট ধ্বংসের লীলা। রাজ্যের কৃষি ও শিল্পের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়লা ও উপপাত উৎপাদন অঞ্চল এবং পাট, টেক্সটাইল, বস্ত্র ও রসায়ন শিল্প। ছোট ছোট শিল্পগুলিরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এবং গ্রামাঞ্চলে গরু, বীজ ও গবাদি পশুর যে ক্ষতি হয়েছে তা অকল্পনীয়। কুটির শিল্পীদের সব সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই ঘোর দুর্দিনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কয়েকটি রাজ্য সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য দিয়েছেন। অগণিত বন্যার্তদের পুনর্বাসন এবং রাজ্যের বিকল অর্থনীতিকে আবার সচল করা নিঃসন্দেহে একটি পাহাড় প্রমাণ সমস্যা।

সংবাদ

ভাগচাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন

বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের ভাগচাষীদের ঋণ সাহায্য দেয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান জেলার কালনা কৃষি শাখা ঐ মহকুমার ৬৯০ জন ভাগচাষীকে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত টাকা ঋণ দিয়েছে।

বীরভূম জেলার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৬৮৭ জন ভাগচাষীকে, মহকুমাভী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৫,০০০ জনকে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ১,২১১ জনকে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৮১৫ জনকে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ৬৩ জনকে এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ২৭,০০০ জন ভাগচাষীকে মোট ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ঋণ দেবে।

তাঁতশিল্পীদের সাহায্যে

বাংলার তাঁতের কদর দিন দিন বাড়ছে। সেইসঙ্গে তাঁত শিল্পীদের অবস্থারও উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। তাঁত উন্নয়ন পর্ষদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় নিবিড় তাঁত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে ৬০০ জন তাঁতশিল্পী এর আওতায় এসেছে এবং আগামী বছরের মধ্যে আরো দুই হাজার তাঁতশিল্পী এর আওতায় আসবে। আগামী চার বছরের মধ্যে দশ হাজার তাঁত শিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এছাড়াও এই পর্ষদ তমলুক, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। চলতি বছরে নদীয়া, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর এবং কোচবিহারে সুতীবস্ত্র এবং বীরভূমে ও মুর্শিদাবাদে রেশম বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব রয়েছে। এইসব উৎপাদন কেন্দ্রে নিযুক্ত তাঁতশিল্পীদের যাবতীয় উপকরণ ও নানা মজুরি এবং তাঁত বস্ত্রের বিক্রির ব্যবস্থাও পর্ষদই করছেন।

পর্ষদের উদ্দেশ্য হলো, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দানের পর তাঁতশিল্পীদের নিজস্ব উদ্যোগে সমবায় সমিতি গঠনে সক্ষম করে তোলা।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এপ্রিল থেকে চার মাসে রাজ্যের ১৩টি জেলায় ১৫,০৭,৪০০ টাকা নগদে ঋণ করেছেন এবং ১৭,২৫৫ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করেছেন। এর ফলে রাজ্য সরকার বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার গ্রামে অসংখ্য জনজ মজুরের কর্মসংস্থান করতে সমর্থ হয়েছেন।

নিঃস্ব অসহায় মহিলাদের বৃত্তি শিক্ষণ কেন্দ্র

নিঃস্ব, অসহায় মেয়ে ও বয়স্কাদের সেলাই কাজ, কাপড় কাটা ও বোনার কাজ শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩টি জেলার ৩৩টি ব্লকে ৩৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ৫০জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে। স্থানীয় বিধানসভা সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করে সংশ্লিষ্ট বি. ডি. ও এঁদের নির্বাচন করবেন। স্থানীয় কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে এইসব কেন্দ্রের কর্মচারীদের নিয়োগ করা হবে।

জন্মহার কমছে

১৯৭১ সালে দেশে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় জন্মহার যেখানে ৪১ ছিল, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর ফলেতে ১৯৭৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছিল প্রতি হাজারে ৩৪.৪। তারপর থেকে এই হার আরো নেমে এখন ৩৩-এ এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে এই জন্মহার বর্তমানের প্রতি হাজারে ৩৩ থেকে কমিয়ে ৩০-এ আনার জন্য চলতি পাঁচসালা যোজনায় নেয়া হয়েছে এক বিরাট কর্মসূচী। এই কর্মসূচী অনুযায়ী, ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোককে স্বেচ্ছামূলক নির্বীজন অস্ত্রোপচার, ৫০ লক্ষকে লুপ এবং বাকীরে পড়ে আরো ৫০ লক্ষ লোককে জন্মনিরোধের অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের আওতায় আনা হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে এবছর ১৬-৩১ অক্টোবর জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ পালন করা হয়েছে। এই জনসংখ্যা কিভাবে দেশে সঙ্কট সৃষ্টি করছে, প্রতিটি পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করছে এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে—এই পক্ষকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন-মানের উন্নতিকল্পে সীমিত পরিবারের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে এই কর্মসূচীকে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দেওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। চলতি যোজনার শহরে ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার সংহতি সাধনের ওপর সরকার আরো বেশী করে নজর দেবেন। এজন্য রাজ্যে রাজ্যে অধিক সংখ্যায় পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। জনে জনে পরামর্শ দেবার পদ্ধতি গ্রহণ করে রাজ্যে রাজ্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করা হবে। জন-সংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষাকে শিক্ষার অন্যতম পাঠক্রম হিসেবে চালু করারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লেখা এক চিঠিতে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, অধিক জনকল্যাণ যাতে আমাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় না ঘটায় সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

মহিলা মহল

বিজয়ার প্রণাম সারতে পিসিমার কাছে গিয়েছিলুম। বৎসরান্তে এই ছুতোয় একবারেই খাওয়ার অনুমতি মেলে। বার্ষিক ভাড়া ও পথের কষ্ট ত আছেই। পিসিমার বাসা বাড়িটাও দরেতলীতে।

দুটো বাস পাল্টে ওখানে পৌঁছেই চোরের মত দরোজায় আড়ি পেতে শুনলুম শাশুড়ী-বধূর অমধুর সংলাপ। একবার ভাবলুম সাড়া দিয়ে ঢুকে পড়ে ওদের রসভঙ্গ করি। কিন্তু মেয়েমানুষের সহজাত অনাসৃষ্টি কৌতূহলে মনে মনে কিঞ্চিৎ সুখলাভ করে শুনেই গেলুম ওদের কেচ্ছাকাহিনী যা এতদিন নেপথ্যে থেকে গেছে। ঝগড়ার স্রোতের মুখে যার যা দুষ্টির কুটো আছে সব বেরিয়ে পড়ছে। আমি বিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, ওমা তাই নাকি পিসিমার বি.এ. পাশ বৌ আদৌ পাশ করেনি। পিসিমার ছেলেই বৌএর সঙ্গে মন কষাকষির মুহূর্তে চেঁচিয়ে বলে ফেলেছে। এতদিন আমি নিজের তিন্নীহীনমনতোষ বুলছিলুম। খুব মজা পাওয়া গেল। সত্যিই ত বাপু কে কার সার্টিফিকেট দেখতে গেছে। মুখে আজকাল অনেকেই অনেক কথা বলে। আরও শুনলুম আমার পিঠপিটে ওটিবায়ুগ্রস্থা ওচ্চাচারী পিসিমা নাকি চিংড়িমাছ ভাজতে গিয়ে চুরি করে খান। নাতির দুধ চুরি করে বুড়োকে খাইয়ে জল মিশিয়ে রেখে দেন সুযোগ পেলেই।

আরও হয়তো শুনতুম। পিসিমার বার বছরের বড় নাতি এসে আমার পাকড়ে নিয়ে গেল ভেতরে। বললো মা ঠাকুমার অমরা গেলেই আছে। এত বারণ করি শোনে না।

ভেতরে গিয়ে আরো কৃতার্থ হলুম। বিদ্যমান দু পক্ষের বক্তব্য শুনে মধ্যস্থ হতে গিয়ে নিজেকে জজ জাতীয় কিছু মনে হল। পিসিমাকে বললুম 'মানিয়ে যাও। বৌকে নিজের মেয়ের মত মনে করো। ভালোবাসার বদলে পাওও বশ হয়। বেচারী ছেলের মুখ চেয়ে একটু সহ্য করো। ওদেরই খুন এখন।'

শুধু বলতে পারলুম না যে পিসিমাকে তোমার 'বোকা' সংবরণ করো। বৃদ্ধ বয়সে ভিমরতির ভোজ্য করিও না পরম

প্রোটিনের অধিকার

মাছ ভাজা খাইতে গিয়া। সমাজে 'নিশ্চয়' বাতাবরণ সৃষ্টি করিও না ক্ষণিক সুখের আশায়। ক্ষণিক সুখের লোভে পাঁচটি পুত্র একটি কন্যার জন্ম দিয়া সংসার সমুদ্রে নাকানি চোবানি খাইতেছ। পাঁচটি পুত্র পাঁচটি অবতার তাহাদের পয়দা থাকিতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই। তাহার প্রমাণ তোমাদের দুরবস্থা।

বৌদিকে রাগদান প্রসঙ্গে বললুম 'চিরকাল শাশুড়ীরা পরের মেয়েকে কুলোয়ে দেখে থাকে। তোমার সংসার তোমারই থাকবে। বুড়োবুড়ি আর কদিন? একটু সহ্য করো। জানোত সহ্যের বড় গুণ নেই।

পিসিমা বৌয়ের অসাক্ষাতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন 'কী কুক্ষণে মাগো তোমার পিসেমশাইকে মাছের মুড়ো দিতে বলেছিলুম। ঘাড়ারে বৌ দশকথা শুনিয়ে দিলো। বলে কি বুড়ো হাবড়াদের ওসব প্রোটিন না কী বলে ছাই খেতে নেই। পেট ছাড়বে। আচ্ছা বলতো মা আমাদের পেট আমরা বুঝবো। আমাদের নাকি ওসবে দরকার নেই। বাচ্চাদের খাবারে আমরা নজর দিই। তোরাও ত বাপু বুড়োবুড়ি দেখেছিস। তারা কি সব ছাই খেয়ে থাকে? এ বয়সে আর হেনস্থা সহ্য হয় না। সারা জীবন নিজেরা না খেয়ে না পরে কষ্ট করে ছেলে মানুষ করলুম। কোত্থেকে পরের মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে হুকুম চালাবে। ছেলেও বৌয়ের কথায় ওঠে বসে। সেই কথায় বলে না গিন্নী হলো মোড়ল, কর্তা হলো পাকল এ হয়েছে তাই। আর ছেলেটাও কি করবে। ঘেটেঘুটে এসে কার অশান্তি ভালো লাগে। বৌ শুধু চুকলি করে। বাপের বাড়ির সাতগুষ্টি এসে হানে পাশে থাকে। আমার একটা মেয়ে আসবে চোরের মতো। দুদিন দুপাশুর কি কোথাও অন্য ছেলের কাছে থাকবো তার জো নেই। সব বৌদের বাপের বাড়ি ঠাকুর, আমরা কুকুর। যদি একটা ভদ্রকালো বাড়ি ঢুকাতে পারতুম ওই বৌরাই পা চাটতো। তখন কত করে বলেছিলুম খেয়ে না খেয়ে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করো। বলে কিনা আমার ছেলেরা মানুষ হয়ে চাকরিবাকরি করলেই আমার সব হবে। ওই নুনখোরা বুড়ো মরলেই আমার হাড় জুড়োয়।'

আমি ত হাজব। শত দেকাল হলেও কোন নারীকে নিজের বৈধব্য কামনা করতে শুনিনি।

পিসিমা কেঁদেই চলেছেন 'আমি মরলে ভাংড়েছিয়ে ওকে কে দেখবে না? আফিম খেয়ে ভোম হয়ে থাকে। ওর দুঃখে যে শ্বানকুকুর কাঁদবে। সংসারে কাউকে কোনদিন চড়া কথা বলেনি। যত রাগঝাল আমার ওপর। আমি তবু আগলে আসলে রাখি।'

মুখে আটা উহ করলেও স্বাধপর অবচেতন মনটা শুধু বলতে চাইছে বেশ হয়েছে ঠিক হয়েছে। পিসিমা সবাইকে ঠেকা দিয়ে ছেলে মানুষ করেছিল। এতদিন সবাই পিসিমার পাশকরা অনেক রোজগার করা ছেলেদের গোপনে হিংসে করতো। এইবার কেমন হলো।

বৌদির কাছে গিয়ে এর বিপরীত বক্তব্য শুনলুম। ওদের বুড়োবুড়ির নাকি দিনরাত খাইখাই রোগ ধরেছে। সারা-জীবন পাতেপাতে গিলেও নাকি আশা মেটেনি। শুধু বাচ্চাদের খাওয়া নয় ওদের ইংরেজী স্কুলে দেওয়ার জন্যে হিংসে করে। কিন্তু বোঝে না ওখান থেকে পাশ করতে না পারলে ছেলেরা ভালো চাকরি পাবে না। মুখে ফুলঝুরি ইংরেজী না বললে সমাজে প্রেস্টিজ থাকবে না। বৌদির বাপের বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা মিশনারীতে পড়ে। ছেলেদের পড়ার চাপ বেড়েছে। ওদের প্রচুর প্রোটিন দরকার। ওষ্টিবর্গের আমিষ জোটাতে লোল পথে বসতে হবে। বৌদির একমাত্র বাসনা নিজেরা দাঁতে দাঁড়ি দিয়ে পড়ে থেকে মাসে ফুলবাসসহ ছেলেদের জন্যে

দেওয়া খরচ করতেই হবে। সবাই করে। পিসিমাও ঠিক করে বলেন, ছেলেদের জন্যে কষ্ট করেছেন। ওটা কী বলার মত কথা? সবাই করে। যে যতই নাচুক কুঁদুক বৌদি তার দুই পুত্রকে ইংরেজী স্কুলে পড়িয়ে মানুষ তৈরী করবেনই।

মনে মনে তাবি তুমি খুব বাহাদুর বাবা ইংরেজ। নিজেরা মজাসে স্ফূর্তি লুটে দোষী জাতিটার আর্থিক ভিত্তি-ধারাকে অবৈধ অন্যায়সঙ্গ করে দেছো কবে যে ঝালাস হবে কে জানে? আর প্রোটিনের অধিকার মানে তখনো কিন্তুর অধিকার এত মনুষ্য ও মনুষ্যত্বের জীবনসঙ্গে জুড়ে চলছে। কে কাকে লোশি মেরে ফেলতে পারে। জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে ঘরে ঘরে কুক্ষণসরে এই হাঁড়িমান চলছে। দুর্বলকে সবল গ্রাস করবেই। নিয়মের রাজত্বে এটা ঘটে আসছে। ঘটছে এবং ঘটবেই।

কিন্তু পিসিমা সিমেমলাইমের মতো সংসারের অবাঞ্ছিত দুর্বল শ্রেণীর জন্যে আমরা আহাউহ ছাড়া কী করতে পারি? সেই ইংরেজী কায়দায় হোম বা কৃত্রাবাস জাতীয় কিছু কিংবা বৈজ্ঞানিক যত্নশাধীন মৃত্যু।

তবে একটা কথা। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। আমারও কি একদিন এমন দুঃসহ দিন আসতে পারে না? তখন আমিও কি নির্ভরে মৃত্যু সুঁচ নিয়ে যন্ত্রনাহীন মৃত্যু বরণ করে শহীদ হবো সংসারের ভার কমাতে? নির্দিষ্ট সুরে বলতে পারবো কিরায়ে দিনু ঘরের চাবি। রাখি না আর ঘরের দাবী। না বুক ফুলিয়ে জাহির করবো আমারও কিছু দাম আছে। অনেক কিছু করবার আছে। মুখে তখন সুখী সুখী দামী দামী গান করবো। প্রাণপনে চেঁচিয়ে বলবো মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। ওদের সবাইকে মনে করিয়ে দেবো সেই বিখ্যাত নীতি গল্পটি একটি ছোট শিশু তার বাবামায় অপরাধের নজীর হিসেবে তার ঠাকুর্দাকে দেওয়া মাটির গাছ সম্বন্ধে তুলে রেখেছিল তার বৃদ্ধ বাবামার ভবিষ্যত ভাবনায়।

মীনাক্ষী ঘোষ

গ্রন্থ আলোচনা

কোচবিহারের সাহিত্য সভা পত্রিকা। পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদিকা—অম্বিকা রায়চৌধুরী। কোচবিহার সাহিত্য সভা। তাকাজর ও জেলা। ।কোচবিহার। মূল্য। একটাকা।

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল একটি আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় নেমেছিলেন। 'ভারতে ইতিহাস চিন্তা' সম্বন্ধে প্রকৃতই আমাদের কৌতূহল অপরিসীম। অথচ ছোট-বড়, দেশী-বিদেশী হরেক উদ্ধৃতির ভিড়ে আমাদের কৌতূহল অচরিতার্থ থেকে গেল।

নৃপেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত ও অর্জুন ঝিক রচিত একটি নয়া ব্রত-কথার ('সম্পদ নারায়ণ' যার নাম) সঙ্গে নরীন্দ্রনাথ রায় আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। নিবন্ধটি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানী পাঠকদের টানবে।

কোচবিহারের গ্রামগুলির নামকরণের পশ্চাৎপটে যে সব কিংবদন্তী, ঐতিহ্য আছে। যে সব জাতিগত, বৃত্তিগত, সামাজিক ইতিহাস আছে ড: দিগ্বিজয় সে সবকটির গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন 'কোচ-বিহারের গ্রাম-নামে সমাজচিত্র' নিবন্ধে।

অমিতাভ চৌধুরী 'কোচবিহার জেলার পাট চাষের বিভিন্ন দিক' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

কিশোর কল্যাণ। সপ্তত্রিংশ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৫। সম্পাদক: ক্ষেত্রমোহন সেনশর্মা। ২২ ঐতিহাস কালসল স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দাম এক টাকা।

কয়েকজন নামী কবির কবিতা আলোচ্য সংখ্যাটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ইন্টিসন'-এ একটি পরিণামী সম্ভাবনা পৌঁছাবার আকুতি। জলধর চট্টোপাধ্যায় শেষ-সর্বস্ব বাঁকা আত্মজনের সন্তাকে ছুঁয়ে ফেলতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায় ('সন্ধীর অন্ধ-কারে')। কৃষ্ণ ধরের 'পাখির ডানা' ও নবনীতা দেবসেনের 'ধান' কবিতার রোমান্টিক আবেগ ও দুরন্তপ্রসারী কল্পনা সহজেই পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়।

ড। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রসঙ্গে' লেখাটিতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। নিজস্ব ভাবনার বিষয়টিকে বিচার ক'রেছেন লেখক। আর একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধ জিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'উদ্ভিদ রাজ্যের ছারিজন'। সমুদ্রের আপদমা সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা অনুসন্ধানী পাঠককে খুশী করবে।

পরিশেষে হাতখড়ি'-র মধ্যে নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য আত্মকথনের সূত্র ধরে তারতের অন্তিকুলের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। অরুণ বসুর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক পঙ্কজকুমার' পরলোকগত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। নেহাৎ অবিচুয়ারি ব'লেই লেখাটি পড়া স্কোত পারে, অন্যথায় তাহা ঠকতে হবে।

আহ্বানচনা। ত্রিংশ বর্ষ, দশম সংখ্যা। সম্পাদক। বীরেন্দ্রলাল মিত্র। সংসদ (সেতাজর)। মূল্য। দেড় টাকা।

একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পত্রিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর অনকূলচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকসম্পাত, তাঁর চিন্তাধারা ও বাণী প্রচারই পত্রিকাটির মুখ্য লক্ষ্য।

কুমারেশ ঘোষের 'মনু বলেছেন' মনু সংহিতার সরল অনুবাদ। তাষাগত দুরূহতের ফলে মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাঁদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব এই অনুবাদের তারা তাঁরা সবিশেষ উপকৃত হবেন। অনকূলচন্দ্রের ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির ব্যাখ্যা ক'রেছেন পরেশচন্দ্র ভৌরা। তাঁর নিবন্ধের নাম 'অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র'। অনকূলচন্দ্র রচিত বিভিন্ন ছড়ার পশ্চাৎ-পটে যে সব বাস্তব ঘটনা ও দার্শনিক ধারণা লুকিয়ে আছে 'ছড়ার শ্রীশ্রীঠাকুর' রচনাটিতে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে-গুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখাটিতে গল্পের আস্বাদ আছে।

সুশোভন দত্ত

শিল্প সংস্কৃতি

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী-

ভারতীয় ছবির নতুন দিগন্ত

সত্যজিৎ রায় মুন্সী প্রেমচন্দের বিখ্যাত ছোটগল্পের উপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে চিত্রায়িত করেছেন 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' চলচ্চিত্রে। ভারতের শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের রাজত্বের অন্তিমকাল—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এক মর্মন্তুদ কাহিনী 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে বিধৃত। যে সময় ওয়াজেদ আলি শা নাচ-গান-রঙ্গরসে মত্ত হয়ে ক্ষুব্ধিতে মশগুল সেসময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার সুচতুর থাবা বাড়িয়ে গ্রাস করে নিয়েছে ভারতের এক বিরাট সাম্রাজ্য। জাতির এই সঙ্কটকালে মৌকসী জায়গীরদার মির্জা সজ্জাদ আলী এবং মীর রোশন আলী শতরঞ্জ খেলায় মত্ত, রোমের নিরোর মতো তাদের স্পর্শ করেনা দেশের পরিবর্তনের এই স্রোত। প্রেমচন্দ তাঁর কাহিনীতে এই দুই নবাব খেলোয়াড়ের কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সাম্রাজ্য পতনকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে বিপরীতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় আলোচ্য চলচ্চিত্রে নবাব ওয়াজেদ আলী শা এবং মীর্জা ও মীর রোশনের উপর নবাব খেলাকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন।

কূট-কৌশলে অতি সহজে জেনারেল উটরাম (রিচার্ড অ্যাটেনবোরো) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী নবাব করে নিয়েছে অযোধ্যা নবাব, বিলাসী ওয়াজেদ আলি শাহ (আমজাদ খান) চীজের মতো বিনা বাধায় ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর রাজপাট। এ ঘটনাটিতে পরিচালকেরও আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রের ভিতর, সত্যজিৎ-সৃষ্ট গ্রামের কিশোর বালক কাল্লু যখন বাইরে থেকে ঘুরে এসে দুই দাবা খেলোয়াড়কে জানিয়েছে 'বিনা যুদ্ধে, বিনা বন্দুকের গর্জনে রাজা আত্মসমর্পণ করেছে এবং আজ থেকে ইংরেজ আমাদের রাজা'। এখানে আমরা সত্যজিৎ-এর এক বীরবাস ওয়াটে পাই—স্বাধীনতাকে দিয়ে তিনি তাঁর এই আক্ষেপকে আরো জীবন্ত করে তুলেছেন।

ওয়াজেদ আলির এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের ভেতর নির্মাণধর্মী দাবা খেলেছেন মির্জা সজ্জাদ আলী (সঞ্জীব কুমার) এবং মীর রোশন আলী (সৈয়দ আফরী)। এদের উদ্দাম দাবা খেলার ভিতর পরিচালক কাহিনীকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, এরই পাশাপাশি এদের পারিবারিক ঘটনাও গুরুত্ব পেয়েছে। মীর রোশন আলীর পত্নী নাফিসা (ফরিদা জালাল) মীরের দাবা খেলার সুযোগে মনসবের ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে, অপর দিকে মির্জার তরুণী পত্নী খুরশিদ (শাবানা আজমী) স্বামীর অবহেলায় রাত্রি জাগরণ করলেও স্বামীর সাহচর্য লাভে সে বঞ্চিত। ফ্রেডচন্দ তাঁর পরে দাবা খেলাকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ এবং তার পরিণতি ঘটিয়েছিলেন অস্ত্রাঘাতে দুজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু সত্যজিৎ তার ছবিতে গল্পের শেষদৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুনত্বের দাবী রেখেছেন। এই দৃশ্যে ক্যামেরা ট্রাক-ব্যাক করে লক্ষ্ণৌর বাঁচের বিষণ্ণ অপরাহ্নে ইরোজী নিয়মে দাবা খেলায় রত দুজনকে দেখানো হয়েছে, আর সেসঙ্গে আজানগান এবং কিউপালের ধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই মিলনাত্মক পরিণতি ঘটলেও আমাদের সচেতনভাবে তা স্পর্শ করে। এই শেষ দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর 'অবসাফরের' অন্তিমদৃশ্যের প্রচুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এই চলচ্চিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ডকুমেণ্টারী রীতির প্রয়োগ। বিদেশী-চলচ্চিত্রে এ রীতির বহুল ব্যবহার ঘটলেও সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্র নির্মাণে এরীতি প্রথম প্রযুক্ত হলো 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' চলচ্চিত্রে এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে এরীতি তাঁরই প্রবর্তন। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অমিতাভ বচ্চন মাঝে মাঝেই গম্ভীর কণ্ঠে ভাষ্য পাঠ করে দর্শকদের জানিয়েছেন নানা তথ্য। এই ভাষ্যকারের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের ক্ষয়ন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের সঙ্গে তুলনা চলে। যে ডিটেলের দিকে লক্ষ্য সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য, 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' তার থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়, ডিটেলের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম প্রয়োগে উনিশ শতকের লক্ষ্ণৌ শহর মূর্ত হয়ে উঠেছে। আংরাখা, পাগ, কবা-নুমা প্রভৃতিবস্ত্র, আসবাব (রোকেয়ের ভিন্ন), রূপোর হুঁকা, ঘরের সাজসজ্জা (শিল্প নির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত), বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রমোদ-প্রভৃতির ভিতর দিয়ে পরিচালক সেকালের পরিমণ্ডলকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—ইতিহাসের দিক থেকে এর বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

কাহিনীর অন্যতম প্রধানপুরুষ যেহেতু ওয়াজেদ আলি শা সেহেতু গান এবং নাচ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সারা ছবিতেই ছড়িয়ে আছে সঙ্গীত। আবহসঙ্গীতে লক্ষ্ণৌর নবাবী মেজাজ ধরা পড়েছে (আবহসঙ্গীত: সত্যজিৎ রায়)। ওয়াজেদ আলি শার নৃত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাতে গিয়ে পরিচালক রাজদরবারে শাহজী সেনের কথক নাচ (নৃত্য পরিচালনা: বিরজু মহারাজ) উপস্থাপিত করেছেন। এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি অভিনেতাই সাবলীলভাবে অভিনয় করেছেন। তৎকালীন সময়কালকে ধরে পরিচালকের সমস্ত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়। দুলাল দত্তর সম্পাদনা শতরঞ্জকে দান করেছে বাঞ্ছিত গতি।

সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে ভারতে ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র নামে এক নতুন ধরণের ছবির বাঙ্ময়ের দ্বার উন্মুক্ত হল। এই ছবিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের এক ছোয়াসীমা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

বিভাবসু দত্ত

সমাজ গঠনের ছবি
অবতার

অবতার ছবিতে মাধবী ও অমিত

সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার এবং জীবনসংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষ হিসেবে চলচ্চিত্রকাররাও যে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারেন, তা প্রমাণ করেছেন 'অবতার' ছবির তরুণ পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে পড়াশুনো করার সময় থেকেই ছবি তৈরির প্রতি তাঁর দারুণ ঝোঁক। ফিল্ম মেকারের কাঠামো-কানুন, শৈলী ইত্যাদি প্রাথমিক উপাদানগুলি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে জার্মানির ফিল্ম আকাডেমী থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে সৈকতবাবু ওদেশে থাকাকালীন পরিচালনা করেছেন 'ওয়ে টু ফ্রিডেনাম' এবং 'পোর্ট্রেট অব এ পার্ক' নামের দুটি তথ্যচিত্র। তাছাড়া, কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় তৈরি করেছিলেন 'কোক মিউজিক অব বেঙ্গল' নামের আর একটি তথ্যচিত্র, যা সুধীজন ও গবেষকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু, শুধুমাত্র তথ্যচিত্র তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে চাননি সৈকতবাবু। মান-প্রাণে যে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বিশ্বাস করেন, তাকে দেশের মানুষের কাছে সততা আর সংগ্রামের মহিমা হিসেবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার স্বপ্ন ছিল তাঁর। এইভাবে, সমরেশ বোসের লেখা একটি নাটকের গল্প অবলম্বনে তৈরি করেছেন জীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র 'অবতার'। জরুরী অবস্থার সময় সৈকত ভট্টাচার্যের এই ছবিটি যে রাজনৈতিক চাপ এবং প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিল, সেকথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

অবশ্য, ধার-দেনা করে সৈকতবাবু ছবির কাজ শেষ করেছেন। সম্প্রতি কলকাতার শিশির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এক বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সৈকতবাবুর সেই চাঞ্চল্যকর ছবি 'অবতার' দেখার সুযোগ হয়েছিল। 'রিয়ালিটি' এবং 'প্রোগ্রেসিভ' বোধ নিয়ে আমাদের দেশের কয়েকজন বড় নামী পরিচালক মাঝে-মাঝে দু-একটি ছবি করেন। কিন্তু সৈকতবাবুর মতো নবীন পরিচালকও যে 'সোস্যাল স্যাটায়ার' নিয়ে এত চমৎকার, সার্থক ছবি তৈরি করতে পারেন, তা উপলব্ধি করে সেদিন শিশির মঞ্চের প্রতিটি দর্শকই বাহবা দিয়েছেন।

পঁচাত্তর বছর বয়সী সৈকত ভট্টাচার্য এই ছবিতে ভণ্ড রাজনীতিকের চরিত্র এবং মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বক্তাগত্তা বুলি উচ্চারণ করে যাঁরা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ এবং রসাত্মক ভঙ্গীতে যেন অর্জুনের মতো লক্ষ্য ভেদ করেছেন সৈকতবাবু। অর্থশালীদের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজটি তিনি ভগবানজীর মতো কালোবাজারী ও মজুতদারদের উদাহরণ দিয়ে যেমন সহজ করে তুলেছেন, তেমনি বক্তৃতা-সর্বস্ব রাজনৈতিক নেতার স্বেচ্ছাসেবক মতো অসাধু ও ধূর্ত আদর্শের অত্যন্ত স্পষ্ট, জীবন্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন কোকিল রায়ের চরিত্রের ভিতর দিয়ে। শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে উপরি করে কারখানার মালিক তাদের জন্য নেপথ্য প্রচার, অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে প্রতিপত্তিশালী মুর্তোজা মনোরঞ্জির প্রতিষ্ঠা, বস্তিবাসী গরীব জনসাধারণকে অন্তর্বিবাদে ছিন্নভিন্নের উপদার দিয়ে ঘটা করে উদ্বোধনী ফিতে কাটা কিংবা নিরন্ন গরীব মানুষের ভোট ও হাততালি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার মধ্যে এমন চমৎকার ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গী পরিবেশন করা হয়েছে যে, 'অবতার' ছবিটি তাঁরামি অথবা রসিকতার সীমানা পেরিয়ে শিল্প-সম্মত প্রক্রিয়া এবং উত্তীর্ণমানের শিল্প-শৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের সমস্ত ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে। ছবিটি শ্লোগানধর্মী হয়নি, অথচ শ্লোগানের তাৎপর্যকে পুরোপুরি রক্ষা করা হয়েছে। ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতীক এবং অর্থোপলব্ধনের ভিতর দিয়ে পরিচালক তাঁর মূলবক্তব্যকে আরও জোরালো করে তুলতে পেরেছেন, যেহেতু চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বটিও তাঁর ওপরেই ছিল। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় মনে রাখার মতো। ক্যামেরার কাজ করেছেন তরুণ শুভেচ্ছাকুমার। ইনি ফিল্মে নতুন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ধ্যানেশ খাঁ। তাঁরও প্রথম আবির্ভাব। মাত্র দুজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই অপরিচিত।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সৈকতবাবু বললেন, ফিল্মে স্টার-সিস্টেমকে ভাঙতে হলে নতুন, সাহসী, সৎ পরিচালকদের উচিত নতুন শিল্পীদের নিয়ে ছবি করা। কেননা, ফিল্ম ইতিহাসটিকে এক বিশেষ পুঁজিপতি ও বণিক শ্রেণীর হাতের মুঠোয় থাকতে দিলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সমধর্মী হিসেবে চলচ্চিত্রশিল্পের দিকে-শ্রীকরণ তাই একান্তভাবেই আকাঙ্ক্ষিত।

সৈকতবাবুর 'অবতার' চলতি বছরের আগস্ট মাসে ইতালির 'আমেডিলিনো ইন্টারন্যাশনাল নিউ ডিরেক্টরস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ আমন্ত্রিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ছবিটির সার্থক পরিচালনার জন্য সৈকতবাবু ইতালি থেকে 'সিগনোরা অব অনার' পেয়েছেন। ১৯৭৮ সালে এখনো অবধি 'অবতার'-ই একমাত্র বাংলা ছবি, যেটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার কুড়িয়ে আনতে পেরেছে।

কাজী নুরুশিচল আরেফিন

প্রাসঙ্গিক

বাংলা আবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন

ভারতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আরো একবার প্রমাণিত হল শ্রীনগরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে। সব বাধা, সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেড়া ডিঙিয়ে বাংলা এবারও সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে। এবার জেতায় বাংলা পর পর চারবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হল। এ কৃতিত্ব এর আগে আরো একবার বাংলা লাভ করেছে। সে সেই ১৯৪৭ সালের কথা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলা টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ বছরের মধ্যে আবার ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নি। শুধু তাই নয়, বাংলার মত বেশীবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সন্তোষ ট্রফি ঘরে তোলার কৃতিত্বও অন্য কোন দল অর্জন করতে পারে নি। এবার নিয়ে মোট আঠারো বার বাংলা সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে।

এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে শৈলশহর শ্রীনগরে। বাতাস সেখানে হাল্কা। শ্রীনগর থেকে ফিরে এসে বাংলার অধিনায়ক গৌতম সরকার বলেছেন, অতো উঁচুতে খেলতে প্রথম দিকে বড্ড হাঁস লাগতো। অল্পতেই হাঁপিয়ে পড়তাম আমরা। তা ছাড়া আবহাওয়াও বড্ড অসুবিধে ঘটাতো। বৃষ্টি হলেই দুরন্ত ঠাণ্ডা। অতো শীতে খেলতে জীবন কণ্ঠ হতো।

গতবার অর্থাৎ কলকাতার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছিল বাংলা, পাঞ্জাব, রেলওয়ে আর কেরল। এদের মধ্যে পাঞ্জাব আর কেরল দল হিসেবে এবার একেবারেই আলাদা। পাঞ্জাব আর কেরলের সামনের সারির খেলোয়াড়রা কলকাতায় খেলবেন বলে আত্মরাম্য ছাড়পত্রে সই করেছেন। পাঞ্জাবের হরজিন্দার সিং, গুরদেব সিং আর অমরজিৎ সিং এবার আসেন নি। তবু পাঞ্জাবের অধিনায়ক বর্ষীয়ান ইন্দার সিং জোর গলায় বলেছিলেন যে পাঞ্জাব এবার বাংলার চেয়েও শক্তিশালী দল। বাংলাকে হারিয়ে তারা কলকাতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। গত পঞ্চম, অর্থাৎ গতবারের বয়সে ভুল হবে। কারণ কলকাতায় জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল গত জানুয়ারি মাসে। সেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলার কাছে পাঞ্জাব হেরে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে চলে যাবার সময় ইন্দার সিং সহ পাঞ্জাবের সব খেলোয়াড়রা সগর্বে বলেছিলেন যে শ্রীনগরে পাঞ্জাব কলকাতার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। তাঁদের কথায় এতই অন্য সুর ছিল। ওঁরা যেন বলতে চেয়েছিলেন, কলকাতার আসরে ওঁদের জোর করে হারানো হয়েছে।

শ্রীনগরে সেই পাঞ্জাব মোটেই সুবিধে করতে পারে নি। সেমিফাইনালে ওঠা তো দূরের কথা। অথচ বাংলাকে হারাবে বলে তারা দেশ ফিরেই অনুশীলন শুরু করেছিল। কিন্তু লীগার্স জাব ভেঙে যাওয়ায় এবং কলকাতায় খেলবে বলে চাকরি বাকরি পাওয়া হয়ে যাওয়ায় হরজিন্দার গুরুদেব আর মনজিৎ সিং কলকাতায় চলে এলেন। ফলে পাঞ্জাব কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিকই।

তবে এবারের প্রতিযোগিতার গোড়া থেকেই গোয়া আর সার্ভিসেস দারুণ খেলছিল। রেল দলে গতবারের খেলোয়াড়রা প্রায় সকলে থাকলেও তারা এবারের প্রতিযোগিতায় মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। অথচ রেল দলে ছিলেন কলকাতার রেল দলগুলোর খেলোয়াড়রাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু তাঁরা এবারের প্রতিযোগিতার প্রথম থেকেই ব্যর্থতার পরিচয় দিতে শুরু করলেন। ফলে রেল দল প্রাথমিক গণ্ডীই ডিঙোতে পারে নি। কেরলের অবস্থাও তাই। তাদের সামনের সারির খেলোয়াড় কলকাতায় খেলার জন্য আত্মরাম্য ছাড়পত্রে সই করেছেন। ফলে মাজিদ, ক্রিসিপস প্রভৃতির মত খেলোয়াড়রা ছিলেন না দলে। তাই গতবার যে কেরল ডার্কসাইডে দল হিসেবে কলকাতার আসরে নামাটে খেলেছিল সেই দল শ্রীনগরে খেলতেই পারে নি।

বাংলার অধিনায়ক গৌতম সরকার বলেছেন যে এবারের প্রতিযোগিতায় ভাল দল হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে গোয়া আর সার্ভিসেস। কিন্তু বাংলাকে সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে হার স্বীকার করতে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের কাছে। বাংলার সেই পরাজয় ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সকলেই আশা করেছিলেন বাংলা সহজেই মহারাষ্ট্রকে হারাবে। কিন্তু ফল হল অন্যরকম। হেরে গেল বাংলা। তবে তাতে আশা ছাড়েন নি কেউ। কারণ দল হিসেবে বাংলা অনেক শক্তিশালী। মহারাষ্ট্রের পাত্তা পাওয়ার কথা নয়। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা অন্তত দু গোলের ব্যবধান গড়তে পারলে তবেই ফাইনালে ওঠার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার খেলোয়াড়রা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ফরোয়ার্ড খেলেছেন বাংলার খেলোয়াড়রা। খেলার শেষ বাঁশী বাজার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা দু গোলে এগিয়ে রইল। কিন্তু খেলার অন্তিম লগ্নে মহারাষ্ট্র একটি গোল শোধ করে দিল। ফলে ফলাফল হয়ে গেল সমান সমান। দু পর্ব মিলিয়ে মহারাষ্ট্র দুটি ও বাংলা দুটি করে গোল দিয়েছে। তাই খেলা গড়ালো অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আকবর গোল করে বাংলার জয়ের রাস্তা পাকা করে দিলেন। ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল বাংলা।

অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠল গোয়া। গোয়া এবার দারুণ খেলছে।

অবশ্য তাদের সেই খেলা অনেকটা শারীরিক শক্তির ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। তেরো রাউন্ড, মেরে ধরে খেলেছিলেন সোবার খেলোয়াড়রা। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে বাংলাকে গোল দিতে দেয় নি। দু দলের খেলা শেষ হয়েছিল ২-২ গোলে। তবে বাংলা-গোয়ার আগেকার খেলাগুলির ফলাফলের ওপর ভোর বুলোলে বাংলারই জয়জয়কারের কাহিনী বেরিয়ে আসে। সেমিফাইনালে গোয়ার সঙ্গে বাংলার তিনবার খেলা হয়েছিল। সেই তিনবারই বাংলা জিতেছে। ফাইনালে ডোবলের প্রতিপক্ষ হিসেবে গোয়া নিজেকে তাহির করলেও তেমার সম্ভাবনা ছিল বাংলারই বেশী। তা ছাড়া গোয়া এবারই প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল।

কিন্তু ফাইনালে তারা জেরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও বাংলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি। বাংলার খেলোয়াড়রা তেতার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। শেষ পর্যন্ত খেলার মীমাংসা হল এক গোলে। এবং সেই একমাত্র গোলটি করলেন মানস ভট্টাচার্য। বাংলা আধার জিতল। প্রথমবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে বাংলাকে হারাবার জন্যে, বাংলার কাছ থেকে সান্ত্বনা ট্রফি কেড়ে নেবার জন্যে অনেক অনেকভাবে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাই বিফলে গেল। বাংলা তার ঐতিহ্যের পতাকা প্রথমবার মাঠে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনাল জিতে এসেছে।

সাতের বছর পরে

প্রায় সাতের বছর পরে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা হল। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এবারের আগে তিনটি মরশুমে মোট পনেরোটি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমবারে অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত দুটি টেস্টেই এবং পাকিস্তান একটি টেস্টে জিতেছিল। তারপর থেকে দু দলের মধ্যে খেলায় আর কোনদিন হার জিৎ হয় নি। ঝুঁকি নিয়ে খেলে নি কোন দল। খেলাকে মর্যাদার রঙে রঙিয়ে অমীমাংসাকে আঁকড়ে ধরে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল দুই দেশ। তাই প্রথম বারে ২-১ টেস্টে জিতে ভারত সেইবার ট্রফিটা জিতেছিল, আজো তা রয়েছে ভারতেরই হাতে।

তবে এবার সেই ট্রফিটার ভারতের মুঠোর মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে পাকিস্তান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তারা আগে বাদ দিলেও এখন ভারতের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে আদার করে ডেকে এনেছে পাকারের দলের খেলোয়াড়দের। ৬১ তাই নয় পাকিস্তানের সঙ্গে দুটিবছর মুস্তাক মহম্মদের হাতেই তারা তুলে দিয়েছে পাকিস্তান দল পরিচালনার ভার। অথচ পৃথিবীর কোন দেশই এখন তাদের সরকারী টেস্ট দলে পাকারের দলের খেলোয়াড়দের খেলাচ্ছেন না। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সব দেশই ঐ পথ বেছে নিয়েছে। কারণ দেশের কথা চিন্তা না করে যাঁরা টাকার প্রলোভনে তুলে পাকারের দলে যোগ দিয়েছেন তাঁদের জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকার নেই।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে খেলা মানেই পাকিস্তানের মর্যাদার লড়াই। তাই সব আদর্শের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তান কেরি পাকারের দলের খেলোয়াড়দের ডেকে এনে তাতীয় দলে খেলাচ্ছে। যাতে এ সব খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া নিয়ে খেলে ইংলণ্ডের কাছে হেতাবে তারা হেরে গেছে সেইভাবে ভারতের কাছে হেরে যায়!

পাকিস্তানের সেই চাল নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে এবং ফৈজলাবাদের প্রথম টেস্ট ড্র হলেও পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অনেক ভালো খেলেছে। লাহোরে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেও পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রেকর্ড খাদ্যোৎপাদনের নেপথ্যে

● ১৪ পৃষ্ঠার পরবর্তী

এজেন্সি প্রকল্প, খরাপ্রবণ প্রকল্প, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্প, মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, উপজাতি অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। এই সব প্রকল্পের সামগ্রিক প্রভাব যে সামান্য নয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কৃষি গবেষণার ওপর বর্তমানে অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে কৃষি গবেষণার জন্য ৬২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাই শুধু যথেষ্ট নয়। এই গবেষণার ফল চাষীদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে এবং চাষীদের বাস্তব সমস্যা নিয়ে কাজ করতে গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এই দিকে এক নতুন পদ্ধতি আজ দেশে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে "শিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা" বলা হয়। এই ব্যবস্থার দুটি ধাপ রয়েছে। একটি শিক্ষণ ও অপরটি পরিদর্শন। গ্রামভিত্তিক কর্মীদের প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারপর এই সব কর্মী নিয়মিতভাবে চাষী পরিবারদের কৃষিক্ষেত্রে পরিদর্শন করে থাকেন। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে সুফল পাবার পর দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কাজেই ১৯৭৭-৭৮ সালের রেকর্ড কৃষি উৎপাদনের জন্য কোনও জাদু বা অস্বাভাবিক ভাগ্য আবহাওয়া দায়ী নয়। ধীরে ধীরে সমস্ত দেশে কৃষিক্ষেত্রে যে সব অগ্রগতি ও পরিবর্তন এসেছে তারই সম্মিলিত ফলশ্রুতি এই অভূতপূর্ব উৎপাদন। এই অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে, মোটামুটিভাবে আমরা ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। ১৯৭৮-৮৩ সালের জন্য যে কৃষি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তাতেও এই উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয়। একথা বলার অর্থ এ নয় যে কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু আমরা বোধ হয় আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, আমরা জানি কীভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় ও গ্রামীণ উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়।

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ, ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং এম, কে, ভেঙ্কেন্স অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্য

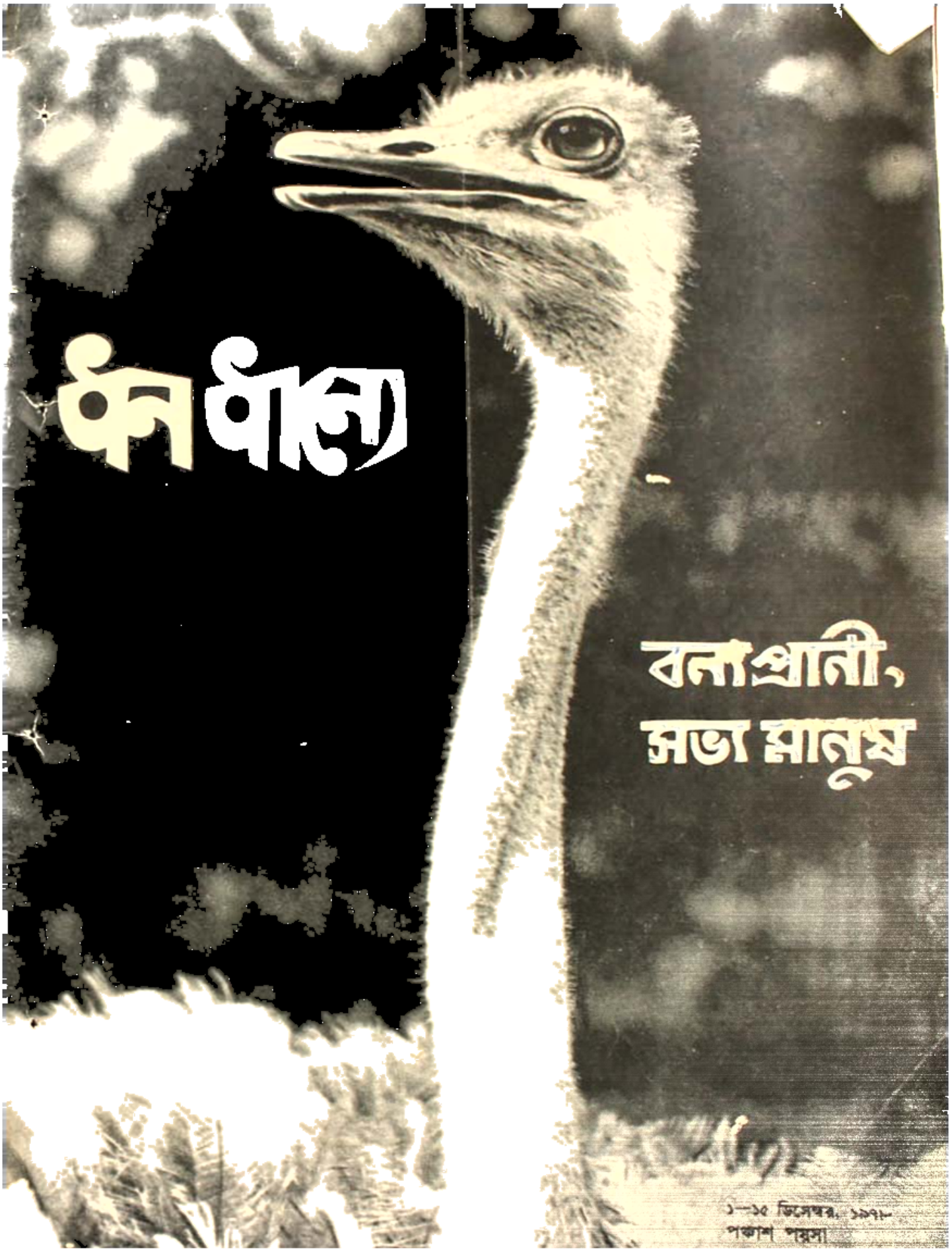

বন্যপ্রাণী, সভ্য মানুষ

১—১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৮
পঞ্চাশ পয়সা

চিঠি

বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ—প্রতিবেদকের বক্তব্য

পাঠক 'মনধানো'র স্বাধীনতা সংখ্যাটি বেশ মন দিয়েই পড়েছেন। তার জন্য প্রত্যেক লেখক (এম. এল. এ. সাদর। মহাশয়কে ধন্যবাদ।

আমি এই চিঠিটি আমার তীব্র দীপ্ত-ভাষ দীপ্ত করতে চাইনা আদৌ। প্রত্যেক-বাবু মোদ্দা সরকারী ব্যবস্থার খবরের তীব্র নিন্দা এবং মিথ্যা বলে অভিযোগ করেছেন। না, মহাশয় আপনার অভিযোগ সত্য নয়। কারণে কলমে এই নজিরবিহীন কাজ অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আমি সে বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল। তবে বলি, এখনো চলে। ১৯৭৫ সালে আমি যখন সাগরে যাই তখন এই অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয় একজন ব্যক্তি। এবং বলেছিলেন, আপনি স্বচক্ষে দেখে নাম। আমি দেখি। এছাড়াও আমি বার পাঁচেক সাগর পাড়ি দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি এবিষয়ে জানতে চান আমি আপনাকে সেই সমস্ত মহিলাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে হাজির করতে পারি।

আমার সমস্ত লেখাটির ভেতরে অর্থাৎ 'বাংলার দর্পণে গ্রামের মুখ ও মর্ম' প্রবন্ধে গ্রামের কৃষিবিকাশ দেখাতে চেয়েছি মাত্র। আগে কি ছিলো। এখন কেমন। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন পাশাপাশি দুটি ছবিই লেখাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেখানে মেয়েদের অগ্রণী ভূমিকাকে কোন অংশে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করবার মত নাস্তিবাচক শব্দকে প্রসঙ্গস্থলে টেনে মিথ্যা প্রচার করিনি। প্রত্যেক বাবুকে অনুরোধ তিনি প্রবন্ধটি আর একবার পড়ে গ্রামের কৃষিবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখুন। তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কোন কষ্ট-কল্পিত বিকৃত মানসিকতার ইতিহাস নয়। সহজ সরল সত্য কথা।

মলয় সিংহ
কলকাতা-৭০০ ০০৮।

আঠারো বছর পরে টেস্ট লড়াই

মনধানোর ১৬-৩১শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রাঞ্জল বিভাস শাস্ত্রিবাবুর লেখা 'আঠার বছর পরে আবার টেস্ট লড়াই' পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। তবে উনি পাকিস্তানের দর্শকদের ভালো লাগা বোলারদের নাম বলতে গিয়ে চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, বেঙ্কটরাঘবনদের বলেছেন। এবং বেদীকে স্থান দিয়েছেন একেবারে শেষে অধিনায়ক হিসেবে, কিন্তু বেদী টেস্ট বর্তমানে ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সেরা ন্যাটা লেগ স্পিনার। তাঁকে কি পাকিস্তানের দর্শকরা ওঁদের মত ভালোবাসেন না? মনে হয় ওঁদের অর্থাৎ বোলার হিসাবে বেদীর নাম দিয়ে দিলেই ভাল হত এবং লেখাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। আর যদি উনি বেদী সমর্থক বা বেদীকে ভালো না বাসেন তখন অন্য কথা। আর যদি উনি বেদীকে পছন্দ করেন তবে বেদীর নাম বোলার হিসাবে বাদ পড়ার কারণ 'প্রিন্টিং মিস্টেক' বা ছাপাজনিত দোষ ছাড়া অন্য কিছু না। আর ওই বাদ গেলে আমি শাস্ত্রিবাবুকে বেদীর নাম বোলার হিসাবে না দেওয়ার কারণ কি সেটা জানার জন্য অনুরোধ রাখছি। এখন আমার অনুরোধ পালন করার ভার শাস্ত্রিবাবুর উপরেই পরে আমার মনে হয়।

দীপক মুখা
আমলামেথী, ২৪ পরগনা।

শারদসংখ্যা প্রসঙ্গে

আপনাদের সুসম্পাদনায় মনধনোর পূজো সংখ্যাটি এবার অপূর্ব হয়েছে। সবকটি রচনা পড়লাম। এসংখ্যায় কবিদের একটি কবিতা হাতে পেয়ে কবিতা পাঠপ্রিয় আমরা খুব খুশী হয়েছি। কবিতাগুলির মধ্যে বীরেন সাহার 'সিগনাল নীল হয়ে যায়' কবিতাটি দ্বিতীয় বার পড়তে ইচ্ছে করে। অন্যান্য কবিদের লেখা কবিতাগুলির গঠনশৈলী বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। এবং প্রবন্ধকারের লিখিত পাঁচটি প্রবন্ধ ও ছোট গল্পের অর্ঘ্য খুব ভাল লেগেছে। লেখাগুলি পড়ার পর ফলের মধ্যে অনুরণন রেখে যায়।

'পুরস্কার' গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক। লেখাটির জন্য লেখক সুমধনাথ ঘোষকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। এবং অভিনন্দন রণজিৎ ভট্টাচার্যের 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক গল্পটির জন্যও। এবং বিশেষ রচনায় সুভাষ সমাজদার, বেলা দে, অরুণি চৌধুরী ও কিন্নর রায়ের লেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেবাশিস কন্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি বেশ উন্নত মানের। 'মাটি টাকা, মাটি থেকে টাকা' শীর্ষক প্রবন্ধটির ওপর তিনি অনেকখানি আলোক সম্পাত করেছেন। সম্পাদক মণ্ডলীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি পূজো সংখ্যার মত আগামী সংখ্যাগুলিতে যেন কবিতা স্থান পায়।

আশিসকুমার ভুইয়া (পরনবীশ)
মুরিদপুর, ২৪ পরগনা।

'মনধনো' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে বেরোয়। পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখকদের যথাযথ সম্মানের নিয়ম।

গ্রাহকমূল্যের হার

একবছর ২০ টাকা, ৭'বছর ১২ টাকা এবং দ্বিবছর ২৪ টাকা। ডাক মাশুল ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

প্রকাশনা, শিল্পাঞ্চলগুলিতে, শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রাহকমূল্যের উপর ২০ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হয়। 'মনধনো'র সমস্ত গ্রাহক ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত বই কিনলে ২০ পার্সেন্ট ছাড় পাবেন।

এজেন্সী

'মনধনো'র এজেন্টদের উপহারে কমিশন দেওয়া হয়। প্রকাশন বিভাগের এজেন্টরা সাধারণ কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞাপনের হার

পুরো পৃষ্ঠা ৪০০ টাকা, অর্ধেক পৃষ্ঠা ২৫ টাকা, শেষমলাট কভার ৪৫০ টাকা, দ্বিতীয় কভার ৪০০ টাকা এবং তৃতীয় কভার ৩৭৫ টাকা।

গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক,
মনধনো,
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা—৭০০ ০৬৯
ফোন: ২৬-২৪৭১

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

অগ্রহায়ণ ১৫-২৯, ১৪৮৫
১-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৮
দশম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

কলাপাতা, লজ্জা আমার
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২

পঞ্চায়েতী সংগঠন : মেহতা কমিটির প্রতিবেদন
ড। অসিতকুমার বসু ৫

ধান কুড়ানি
অধীর মুখোপাধ্যায় ৭

একটি প্রতীকের জন্ম
নীরেন সাহা ৯

মহিলা মহলে
উমা দাশগুপ্ত ১৩

খেত আমার
এ. এফ. কামরুদ্দীন আহমেদ ১৪

গ্রাম বাঙলার কথকতা
রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫

জানা অজানা ১৫

গ্রন্থ আলোচনা
অমিতাভ চক্রবর্তী
সোমনাথ দে ১৬

আলাপ
মঞ্জুর দাশগুপ্ত ১৭

শিল্প সংস্কৃতি
সত্যানন্দ গুহ ১৯
পরিমল চক্রবর্তী ২০

সংবাদ ২১

প্রচ্ছদ
ব্রহ্মদেব সেন ২২

প্রচ্ছদ চিত্র— বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী—কমল ঘোষ দস্তিদার

সম্পাদকীয়

সীমিত পরিবারের সপক্ষে জনমত গড়ে উঠুক

দেশের জনসাধারণকে জনসংখ্যার প্রত্যাশিত বৃদ্ধির প্রকৃত পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করবার প্রয়াসে গত অক্টোবরের মাসে যে জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ পালন করা হল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর গুরু হিসাবে স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা। এই ধরনের একটি সামগ্রিক সুসংহত নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা ধার্য করেছি তা অর্জনের পথে সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে না।

যে আশঙ্কাজনক হারে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তা রোধ করা আমাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনের পরই আমাদের দেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। আমাদের ভূখণ্ড পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের যেখানে ২। শতাংশেরও কম সেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের বাস আমাদের দেশে। ১৯২১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি যা ছিল বছরে ১১ কোটি বেড়ে ১৯৩১ সালে ৩১ কোটিতে দাঁড়ায়। তারপর সাতাশ বছরে আরো ২৮ কোটি বেড়ে আজ এ জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় ৬৪ কোটি। এই হারে বৃদ্ধি পেলে আগামী ২১ বছরে অর্থাৎ এই শতাব্দীর শেষে দেশের জনসংখ্যা আরও ৫৭ কোটি বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১০০ কোটিতে।

পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গত তিন দশকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৫.৬ গুণ অথচ মাথাপিছু প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় একইরকম আছে—দৈনিক ৪০০ গ্রামেরও কিছু কম। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পাবে না যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হয়।

আমাদের দেশের ৬৬ শতাংশ লোক এখন করেন দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং ৭০ শতাংশ লোক নিরক্ষর। এই দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। যতদিন দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের মনে এই উপলব্ধি না আসবে যে জীবন ধারণের মান ও পরিবারের আয়তনের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা না জাগবে ততদিন তাঁরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন না।

আমরা ছোটো জন্মনিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে জোর দুটোর পথ পরিহার করেছি এখন সীমিত পরিবারের সপক্ষে জোরালো জনমত গড়ে তুলবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাতেই হবে। এবং এই প্রয়াস চালাতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে। গ্রামে গঞ্জে শিক্ষাকেন্দ্রে আমরা যদি জনমত সংগঠকের দল গঠন করতে পারি তবেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেবে।

বন্যপ্রাণী, স্বভা মানুষ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

"বাঘটাকে দেখে এলাম
ছাদের উপর বাস বসে।
সে বাসেতে মানুষ যায় না,
রূপ দেখাতে রেখেছে॥"

বহুদিন আগে আসানসোলের কয়লা-খনি এলাকার এক ছাত্রদলনের খাতা থেকে এই দুটি পংক্তি আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলাম। বাঘের মধ্যে আক্রমণাত্মক কোন মেজাজ ফুটে ওঠেনি। সে এমন বিজয়ীর বাস যে নিজের রূপের গর্ব করতে পারে। প্রদর্শনযোগ্য তার রূপ। মানুষের তা ভালো লাগে। মানুষের ছাদে সে বসে থাকে। বাস থেকে চলমান সংসারের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। লোভ নয়, ভালোবাসার চোখে। এবং মানুষ তাকে ও তার রূপকে ভালোবাসে।

বন্যপ্রাণী সপ্তাহ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর কথাগুলি কানে এলে আমার কেন জানিনা ছাত্র পাশের ওই দুটি পংক্তির কথা মনে পড়ে। বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী হবে তা ওই আমোদ দুটি পংক্তিতেই বলা হয়েছে। এমন ব্যঞ্জনাময় অসাধারণ দুই পংক্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এবং এখানে মনে পড়ল ওড়িশার কাঠের তৈরী বাঘ, সিংহ ইত্যাদি খেলনা পুতুলের কথা। বাঘ, সিংহের কপালে ও নাকে তিলক কাটা। মানুষই তাকে ওভাবে দেখেছে। তিলক এঁকে দিয়েছে ওর প্রতিরূপে। আমরা ভারতীয়রা একসময় তাদের ওভাবে দেখেছি। ভালোবেসেছি। কেননা আমরা সুন্দর—প্রখ্যাত বাঙালী লেখকের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত তার একটা গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। যারা সুন্দর তাদের বিনাশসাধনে কেনমতেই আমরা যেন তৎপর না হই। আমাদের অসচেতনতা ও নিষ্ঠুরতার ফলে তারা যদি বুনেপ্রান্ত হয় তাহলে নিজস্ব পরিবেশ ও প্রকৃতিকে আমরা পুরোপুরি দূষিত করে ফেলব। সুতরাং বন্য-প্রাণীদের সংরক্ষণ এবং মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে তাদের জীবনযাপনের দায়িত্ব সত্য মানুষ হিসেবে আমাদেরই বহন করতে হবে।

আর বন্যপ্রাণীরা তো আমাদেরই প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সঙ্গে যেমন আমরা সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক রেখে চলি তাদের প্রতিও সেরকম সহৃদয় আচরণের নজির আমাদের রাখতে হবে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও ধর্মে বন্যপ্রাণীরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। লোককথা, রূপকথা, উপকথা ও পুরাণে আমরা আমাদের অত্যাধুনিক কল্পনাশক্তি দিয়ে বাঘ, সিংহ, হাতি, শেয়াল, পাখি প্রভৃতি বন্যপ্রাণীদের স্বচ্ছন্দে মানুষের মত আচরণ করিয়েছি। তারা মানুষের মত কথা বলেছে, হয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক। এমনকি তাদের নিয়ে এক একটি গল্প বা কাহিনী রচনা করে তাদের মাধ্যমে মনুষ্যজীবনের পক্ষে প্রযোজ্য নানা নীতিকথাও আমরা প্রচার করেছি। যে শিশু দূরদর্শনে আবদ্ধ থাকে, যে কখনও দূরের কটি পৃথগালিত প্রাণী ও গ্রাত্যহিক জীবনে অতিপরিচিত কয়েকটি পাখি ছাড়া আর কিছু দেখেনি সেও তার সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তি দিয়ে বাঘ, সিংহের মত অরণ্যের ভয়ংকর সুন্দর প্রাণীদের সঙ্গে একটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। রূপকথার মতই বাঘ, সিংহের গল্পের অসীম আকর্ষণ তার কাছে। ছোটবেলা থেকে নিজে নিজেই অরণ্যের প্রাণীদের সঙ্গে যে চমৎকার মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে উত্তরকালে তাতে ছন্দপতন ঘটলেও অরণ্যপ্রাণীদের প্রতি কিছু না কিছু মমতা অধিকাংশ মানুষের থেকে যায়। ভারতের নানা জায়গার কাঠ, মাটি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ নিয়ে শিল্পদের যে খেলনা তৈরী করা হয় তার অনেক-গুলিতেই বন্যপ্রাণীদের দেখা যায়।

ভারতে বন্যপ্রাণী

অযথা অবহেলা ও যথেচ্ছ বিনাশ সত্ত্বেও ভারত এখনও বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ। এদেশে প্রায় ৫০০ রকমের বন্যপ্রাণী, ২,০০০ রকমের পাখী এবং ২০,০০০ রকমের কীট-পতঙ্গ আছে। সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় এদের বাসস্থান। তবে বেশীর ভাগই রয়েছে বনাঞ্চলে। কিন্তু ন্যাশনাল পার্ক, অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া অন্য বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। ৫০ বছর আগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত ৪০,০০০ বাঘ বিচরণ করত। আজ মাত্র ২,০০০টি বেঁচে আছে।

যেমন পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে যে সব তীর্থযাত্রী ও পুণ্যার্থী যান তাঁরা অনেকেই ওদের বাড়ির শিশুদের কথা মনে রেখে কাঠের নানা আকারের বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি খেলনা পুতুল কিনে নিয়ে যান। ছোট্ট মেয়ে যেমন পুতুল খেলতে খেলতে একদিন পাকাপোক্ত গৃহিণী হয়ে যায়, সেরকম কাঠের বা মাটির বাঘ, সিংহ ইত্যাদি খেলনা পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতে শিশু যে তার ভবিষ্যৎ জীবনে একজন বন্যপ্রাণী প্রেমিক সৎ নাগরিক হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ঠিকমত বুঝতে, জানতে ও তাকে বজায় রাখতে শিশুদের খেলনা পুতুল থেকে শুরু করে

একেবারে ধর্মীয় পুঁথি, পুরাণ, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি আমাদের যে শিক্ষা দেয় তা আমরা মানি বা না মানি তার যে একটা অসাধারণ মূল্য আছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমরা, ভারতীয়রা সাধারণ-ভাবে আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে যতটা তুলে ধরি, তাকে অবহেলা করি তার দ্বিগুণ বস্তির জন্যও খুঁজতে পাওয়া দুষ্কর। আমরা কি জানি যে আমাদের অবহেলা ও অনেকের হিংসোন্মত্ত বর্বর আচরণের পরও আমাদের এদেশে এখনও অন্তত পাঁচশ রকমের বন্যপ্রাণী, ২ হাজারেরও বেশি জাতের পাখি ও অন্তত কুড়ি হাজার রকমের কীটপতঙ্গ কোনক্রমে বেঁচে বর্তে আছে? সিনেমা, সস্তা উপন্যাস ও রাজনীতি নিয়ে আমরা যতটা মাথা ঘামাই সেই অনুপাতে অন্তত কিছুটা মনোযোগ এদের প্রতি দিতে পারলে আজকের আমাদের ক্ষতি কিছু হত না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দেশের নানা অঞ্চলে অন্তত চল্লিশ হাজার বাঘ ছিল। আজ সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু হাজারে। এক-সময় জোকেরা দিনদুপুরেও টিংপুর থেকে কালীঘাটের মন্দিরে আসতে ভয় পেতেন। আজকের এই কলকাতা শহর তখন ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ডাকাত ও বাঘের ভয়েই লোকেরা ওই ভয় পেতেন। ছোট্ট তিনটি গ্রাম নিয়ে যে কলকাতা শহরের পত্তন তা আজ বাড়তে বাড়তে বিরাট এক মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। চিড়িয়াখানা ও আলমুক সারকাসের দৌলতে ছাড়া এখনকার নতুন নাগরিকরা কলকাতার পথে আর বাঘের ভয় পাবেন না। আজ বাঘের এমনই অবস্থা যে খোদ সুন্দরবনের মত জায়গাতেও বাঘ রক্ষা করে, বহু পরিশ্রমে 'প্রজেক্ট টাইগারের' কাজ হাতে নিতে হয়েছে।

বাঘ নিয়ে সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেনসাসের কাজ হাতে নেওয়া হয় ১৯৭২ সালে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এই কাজে হাত দেন। কার্যত গোনাগুনতি হিসেবে মাত্র ১৮২৭টি বাঘ পাওয়া গেল। ১৯৭২ সালেই 'প্রজেক্ট টাইগারের' কাজ শুরু হল। এর জন্য উত্তর প্রদেশের কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক, রাজস্থানের রনথম্ভোর সাংচুয়ারি, মধ্য প্রদেশের কানহা ন্যাশনাল পার্ক, মহারাষ্ট্রের মেলঘাই, কর্ণাটকের বন্দীপুর সাংচুয়ারি, ওড়িশার সিমলিপাল সাং-চুয়ারি, বিহারের পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক, আসামের মানস সাংচুয়ারি ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনকে নির্বাচন করা হল। বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এই নটি এলাকায় বেশ তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

পশ্চিম ভারতের অরণ্যাঞ্চলে সিংহ একদা অজস্র ছিল। এখন সিংহ মাত্র গুজরাটের গীর ওয়াইলড লাইফ সাংচুয়ারিতেই আছে। ভারতীয় সিংহ যাতে একেবারে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্য গুজরাট সরকার ৪৫ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৮-র সেনসাসে গীর অরণ্যে ১৭৭টি সিংহ পাওয়া গিয়েছে।

অরণ্য সংরক্ষণ বিভিন্ন পরিকল্পনা ছাড়াও সম্প্রতিকালে ভারত সরকার এ সম্পর্কে আরও কিছু কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ন্যাশনাল পার্ক ও সাংচুয়ারিগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়া হবে, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গবেষণার জন্যও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৬০টিরও বেশি পার্ক ও সাংচুয়ারি আছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য এধরণের আরও বেশ কিছু পার্ক ও সাংচুয়ারি গড়ে তোলা হবে। ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রতি বছর তাঁরা সবচেয়ে ভালভাবে পরি-চালিত ন্যাশনাল পার্ক ও সাংচুয়ারিকে শীল্ড পুরস্কার দেবেন। এর ফলে ন্যাশনাল পার্ক-সাংচুয়ারির কর্তাব্যক্তিরা

তাঁদের নিজ নিজ এলাকা সুন্দরভাবে রাখার একটা প্রেরণা পাবেন। হাতমরা বাঘ ও বাঙ্গালোর শহরের কাছেও শীঘ্রই সিংহ সাফারি পার্ক গড়ে তোলা হবে।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার ইন্ডিয়ান বোর্ড ফর ওয়াইলড লাইফ প্রতিষ্ঠা করেন। এটা একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা বোর্ড। ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতি কী হবে তা তাঁরা ঠিক করেন। কাজ কতটা এগোচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য বছরে একবার বোর্ডের বৈঠক বসে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার নানাভাবেই চেষ্টা করছেন। ১৯৭২ সালটি ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বছর শুধু ব্যাঘ্র-প্রকল্প বা 'প্রজেক্ট টাইগারের' কাজই হাতে নেওয়া হয়নি, ভারতীয় সংসদে এই বছরেই বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) বিল গৃহীত হয়। এই আইনে রাজ্যগুলিকে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড গঠন, বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ অফিসার নিয়োগ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এই কর্মচারীরা পশু-পাখি শিকারের আইনকানুন প্রয়োগ ও অপরাধীদের জন্য কার্যকর পরিচালন-ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। বন্যপ্রাণী বেচাকেনা, চামড়া, নাংস ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে লাইসেন্স নিতে হবে। লুকিয়ে শিকার করলে ৬ মাস জেল ও অন্তত ৫০০ টাকা জরিমানা হতে পারে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যই এই আইন গ্রহণ করেছে। চোরাবাজারে গণ্ডারের খড়্গের খুব নাম। এইজন্য লুকিয়ে গণ্ডার শিকারের ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। স্রেফ লোভের বশে হত্যার ঘটনা বন্ধ করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে ততদিন আইন করে বা প্রহরী রেখে এই কাজে আংশিক ফল পাওয়া যাবে না। একসময় গাছের উপত্যকায় নাকি বেশ কিছু গণ্ডার দেখা যেত। কিন্তু এখন শুধুমাত্র আসাম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকা ছাড়া এই প্রাণী আর ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রতি বছর রক্তচুষে বন্যায়

কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যে গণ্ডার পরিবারের খুবই ক্ষতি হয়। বন্যায় এখানে বেশ কিছু গণ্ডার মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এখন ভারতে গণ্ডারের সংখ্যা মোট ৭০০ বলে ধরা হয়েছে।

জুলজিক্যাল সারভে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন। যে সব বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ ও সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের কিছু কিছু গবেষণাকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। আসাম ও অরুণাচলে প্রসেপে সাদা পাখা-বিশিষ্ট বুনো হাঁস, আসাম ও উত্তর বাংলার বন্য জাতের হুইসলিং টিল ও মণিপুরের এক ধরনের হরিণের উপর (সায়েনাক্সিয়া এরাভি, এরাভি) জুলজিক্যাল সারভে ব্যাপকভাবে গবেষণা করছেন।

সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্মের পাশাপাশি কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন। একজন মানুষ একলা সাধনার ও পরিশ্রমে গবেষণাকর্মে যে কী সিদ্ধি আজ করতে পারেন তার জলন্ত উদাহরণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পক্ষীবিশারদ সালেম আলী। পক্ষীবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে সালেম আলী আজ একটি বিশিষ্ট নাম। বার্ধক্য তাঁর উৎসাহ ও পরিশ্রম ক্ষমতাকে এতটুকুও কমাতে পারেনি। একটি পাখির প্রতি সাধারণ মানুষ আর কতটা মনোযোগ দেন। সালেম আলী বহু বছর ধৈর্য সহকারে নানা জাতের পাখি সম্পর্কে একের পর এক তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছেন। এই সংগ্রহের ইতিহাস ঘটনাবহুল, রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাসকে ম্লান করে দেয়। একটি পাখি হঠাৎই এক প্রভাতে সালেম আলীর চোখে পড়ল। সেটি যে প্রতি বিরল জাতের পাখি তিনি তখনই তা বুঝতে পারলেন। আনন্দাতিশয্যে ভুলে সন্তর্পণে ওই পাখিটির পিছনেই তিনি কাটিয়ে দিলেন কয়েকটি দিন। তাঁর নোট-বুকে জমা পড়ল কিছু তথ্য। কিন্তু দেখা গেল এটুকু তথ্য সংগ্রহ করতেই কী করে যেন পুরো একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে।

লোকের এক একটা হবি থাকে। পক্ষীবিদ্যা সালেম আলীর হবি নয়, অস্তিত্ব। বন্যপ্রাণীদের ভালোবাসলে আমাদের এরকম কিছু কিছু হবি জন্মাতে পারে। এবং হবি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে অস্তিত্বের প্রশ্ন। বন্য-প্রাণী সংরক্ষণের জন্য তখন হয়ত আর কোন প্রচার বা নিয়মকানুনের প্রয়োজন হবে না। আমাদের ভালোবাসা থেকে বন্যপ্রাণীরা উপকৃত হবে। তারা বাঁচবে।

বাঁচবো আমরাও।

পঞ্চায়েতী সংগঠন : মেহতা কমিটির প্রতিবেদন

ডঃ অসিতকুমার বসু

ভারতের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো হল গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী করতে হলে তা নিম্নস্তরেও কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। সমাজস্তরে রাজ্য আইনসভা বা লোকসভার নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। জনগণের অংশগ্রহণ আরও ফলপ্রসূ হবে যদি তা বুনিয়াদি স্তরে—বিশেষ করে গ্রাম দেশে—কার্যকরী হয়। আজ এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ ১৯৭৭ সালে দেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনৈতিক জগতেও তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের পরিকল্পনায় কেন্দ্রীভবনের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামোন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনসাধারণের নিকট সাহায্য, সুযোগ-সুবিধা, ঋণ, বাজার এবং অন্যান্য উপকরণ পৌঁছে দেওয়া যাতে করে তাঁরা বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ পান। এজন্য এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব দিতে হবে গ্রামবাসীদের নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই। এর অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। তবে এই বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে না এলে অনেক অসুবিধা আছে। তাছাড়া স্থানীয় স্তরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বারা সমন্বিত ও পরিপুষ্ট হলেই জাতীয় স্তরে গণতন্ত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চলতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নের সরকারী সিদ্ধান্তগুলি সবই যদি দূরবর্তী রাজধানীতে নেয়া হয় তাহলে সরকার কীভাবে চলছে এবং সরকার কী করতে পারেন বা পারেন না সে সম্পর্কে নাগরিকদের জানবার সুযোগ খুব অল্পই থাকে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রয়োজন নয়, জাতীয় উন্নয়নের জন্যও এটা একটা বড় হাতিয়ার। সুতরাং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে অশোক মেহতা কমিটির প্রতিবেদনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগে বলবন্তরায় মেহতা কমিটি সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নতুন গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রতিবেদনে পঞ্চায়েত সম্পর্কে পুরাতন ধারণার এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র পৌর দায়দায়িত্ব নিয়েই ব্যস্ত থাকবে সেটা কাম্য নয়। দেশ বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করছে। সুতরাং গ্রামবাসীদের এই পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে জড়িত করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা সম্ভব পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই। তাই অশোক মেহতা কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন।

আট মাস ধরে অনুশীলনের পরে পঞ্চায়েতী রাজ সম্পর্কে অশোক মেহতা কমিটির প্রতিবেদন আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছে। কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তৃণমূলে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। পল্লী অঞ্চলে বিশাল সম্পদ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে এবং উন্নয়নের নতুন গতি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয়সাধন দাবি করে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের সঙ্গে জনগণকে যুক্ত করতে পারলেই তা সম্ভব। পঞ্চায়েতী রাজ হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা যা গণতান্ত্রিকশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রামের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটাতে পারে এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও কেরালা বাদে প্রায় সব রাজ্যেই গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকা খুবই ক্ষুদ্র। সাংগঠনিক ও আর্থিক দিক থেকে এত ক্ষুদ্র গ্রামপঞ্চায়েতগুলি স্বয়ম্ভর হতে পারেনা। তাছাড়া, তাদের পক্ষে আধুনিক জটিল পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাজ হবে মূলত পৌর কর্তব্যগুলি দেখাশোনা করা। অপরদিকে গ্রামসভার কাজ হবে সকল কর্মসূচীর পর্যালোচনা করা। স্থানীয় জনসাধারণকে জড়িত করা এবং একেবারে তৃণস্তর থেকে কর্মসূচী রচনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামে গ্রামসভার বছরে দুবার বৈঠক অনুষ্ঠানের সংস্থান রাখা দরকার। কেননা আলোচনা যত ব্যাপক হবে সমস্যাপূরণ প্রস্তাবের সাফল্য তত বাড়বে।

ভারতে প্রায় দুয় লক্ষ গ্রাম এবং দু লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলির অধিকাংশই এত ক্ষুদ্র যে আর্থিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে গ্রামপঞ্চায়েতগুলি স্বয়ম্ভর নয়। তাদের টিকে থাকাই সুকঠিন। তাই অশোক মেহতা কমিটি কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটা নতুন পঞ্চায়েত গঠন করার সুপারিশ করেছেন। সমতলভূমিতে প্রত্যেক নতুন পঞ্চায়েত থাকবে পনেরো হাজার থেকে কুড়ি হাজার লোক। তবে পাহাড় বা মরুভূমি এলাকায় লোকসংখ্যা থাকবে আরও কম। কৃষি আজ একটা শিল্পে পরিণত হতে চলেছে। এর জন্য প্রয়োজন উপকরণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার। তাদের আরও প্রয়োজন ঋণের সুযোগ-সুবিধা। এর অর্থ হচ্ছে, এই

গ্রামগুলির মধ্যে একটা কেন্দ্রস্থল থাকবে যেখানে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সকল সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে। তাছাড়া, প্রত্যেক মণ্ডল পঞ্চায়েতের জন্য থাকবে একটা দণ্ডাত্মক প্রতিষ্ঠান।

গ্রামাঞ্চলে বিরোধ ও সংঘর্ষ মিটিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারলে সেখানকার প্রকৃত উন্নয়ন সহজতর হবে। ন্যায় পঞ্চায়েত পল্লী-বাসীদের এমনি একটি পরিষেবা যা এ দায়িত্ব বহন করতে পারে। বর্তমানে আটটি রাজ্যে এ ধরনের চালু আছে। তবে সেগুলি ভালভাবে কাজ করছে না এবং অনেক রাজ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনে একটা অনীহা রয়েছে। ন্যায় পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুশীলন করে মেহতা কমিটি কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটি পঞ্চায়েত আদালত গঠন করতে সুপারিশ করেছেন। এই প্রতিবেদনে এই আদালতের সংস্কারের জন্যও অনেক সুপারিশ আছে।

জেলা এখনও ভারতীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই কমিটি সুপারিশ করেছেন, রাজ্য সরকারের ঠিক নীচেই পঞ্চায়েতী রাজের যে স্তর শুরু হবে সেটা হবে জেলা পর্যায়ে। জেলা স্তরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার কারিগরি ও প্রশাসনিক সাহায্য সহজেই পাওয়া সম্ভব। আর জেলা পরিষদের কাজ হবে নিম্নস্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা এবং তাদের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। জেলা স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত না হলে, বিকেন্দ্রীকরণ হবে একটা অর্থহীন অভিনয়। জেলা পরিষদকে একরকমভাবে ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব দিতে হবে এবং সেসঙ্গে আর্থিক ক্ষমতা। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে তাই করা হয়েছে এবং মেহতা কমিটি গুজরাট-মহারাষ্ট্র মডেলই সুপারিশ করেছেন। এ কমিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা গঠনের পক্ষপাতী। কারণ কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং যতদিন সমিতি থাকবে তা মহারাষ্ট্রের ন্যায় জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। সংক্ষেপে, কমিটি মনে করেন, ক্রমবিবর্তনের ফলে পঞ্চায়েতী বিকেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান দুটি স্তরেই থাকবে—জেলা ও মণ্ডল পর্যায়ে। এই দ্বিস্তর পঞ্চায়েত যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি কাজ করতে থাকবে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্বন্ধে কমিটি দুটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। প্রথমটি হল, রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চায়েতের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। দ্বিতীয়টি হল, নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতের কার্যাবলী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং ঐ কমিটিগুলি রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হবে। সুতরাং কমিটি আশা করেন, রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামীণ উন্নয়নের কথা মনে রেখে যৌথভাবে কাজ করবেন। দলীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন, তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ এবং দুজন মহিলার প্রতিনিধিত্ব মেহতা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেরা যাতে প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে সে বিষয়ে কমিটির সুপারিশ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দুর্বলতর শ্রেণীগুলি উন্নয়ন-প্রকল্প থেকে বিশেষ লাভবান হয়নি এবং পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তেমন সুবিধা আদায় করতে পারেনি। সেজন্য মেহতা কমিটি বিবিধ সুপারিশ পেশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য সামাজিক ন্যায় বিচার কমিটি। এ কমিটি পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে গঠিত হবে এবং একজন তপশিলী সদস্য হবেন এর সভাপতি। তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্য আইনসভাতেও একটি কমিটি থাকবে যার কাজ হবে পঞ্চায়েতের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। এই কমিটিতে অন্তত সংখ্যায় তপশীলি সদস্য থাকবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধা না দিতে পারলে গ্রামীণ উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়বে, গ্রামের উৎসাহী লোকেরা শহরে পাড়ি দেবে। সেকারণে কমিটি গ্রামোন্নয়নকে নগরোন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখেননি। গ্রামোন্নয়নমূলক সকল দায়িত্ব পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে হবে। কিন্তু সরকারী দপ্তরগুলি পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ব্যাপারে অনিচ্ছুক। সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্যের মত রাজ্যসরকার ও পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের জন্য সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। দেশের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে মেহতা কমিটির সুচিন্তিত সুপারিশগুলি বাস্তব রূপায়ণের ওপর।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যায় যা আশাক মেহতা কমিটির প্রতি-বেদনে স্থান পায়নি। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হল দরিদ্র গ্রামবাসী। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা অনেকেই শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত। তাদের শিক্ষা সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সুযোগসুবিধা দানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না করতে পারলে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান-গুলিতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে কখনোই আশা করা যায়না। তাই আজ প্রয়োজন হলো আর্থিক সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া এবং বাধ্যতামূলক সার্বজনীন ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ। যতদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য থাকবে ততদিন তারা কোন নির্দিষ্ট সৌসোদ্যোগিক এককের মানুষ বলে নিজেদের ভাবতে পারবে না। আর এধরনের অবস্থায় পঞ্চায়েতী রাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কোথায় যাচ্ছিস রে তারা?

সামন্তবাড়ীর জয়দেব তারাকে পথে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল। তারা জয়দেবের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, বাঁধের ধারে যাচ্ছি গো।

—একা যাচ্ছিস যে? তোর ভাইটা কই? জয়দেব ফের জিজ্ঞেস করল।

—ওর্র জ্বর ক'দিন ধরে।

—তাই বল।

জয়দেব সেসময় ছেলেদের সবে রাস্তায় এসে হোদে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু না বলে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুটতে লাগল। সূর্য তখন অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। তারাও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করতে চাইল না। শীতের বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। এখান থেকে বাঁধের জমি কম করেও পনের মিনিটের পথ। তাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে আবার সন্ধ্যার আগে আগেই। কারণ, সন্ধ্যার পরে ভয়ে ওদিকে বেশী লোক মোটেই চলাফেরা করে না। গাঁয়ের একঝোড় খেকড়ো কাঁচা মাটির পথ ধরে তারা তাড়াতাড়ি বাঁধের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

পৌষের মাঝামাঝিই এদিকের ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে আসে। ধান তুলে নেবার পরে জমিতে পড়ে থাকে শুধু খড়কুটো, মাটির ডেলা আর বড় বড় কতগুলো ইঁদুরের গর্ত। আর থাকে ওরই ফাঁকে ফোঁকে ছড়ানো ছিটানো দু'চারটি ধান। গাঁয়ের অনেক গরীব ছেলেমেয়েরা মাঠে নেমে ওই ধান সোনার দানা মনে করে পরম যত্নে খুঁটে খুঁটে তুলে নেয়। এভাবে সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে কেউ পাঁচ-সাতসের ধান পর্যন্ত ধান কুড়িয়ে পায়। কোন কোনদিন বা কারোর বরাত জোরে বেশী ধুলে যায়। হঠাৎ মাঠের মধ্যে এমন এক-একটা ইঁদুরের গর্ত আবিষ্কার হয়ে পড়ে যার ভিতর তিন চার কেজি পর্যন্ত ধান লুকিয়ে থাকে। মুঠো মুঠো করে সেই ধান তুলে নেবার সময় ওদের মনের অবস্থা যা হয় তা অনেকটা

ধান কুড়ানি

অমীয় মুখোপাধ্যায়

ভিখারীর ভাগ্যে মাংস জোটেরই মত। তাই তারাও এসময় কোনদিন ঘরে বসে থাকেনা। মাঠে মাঠে সেও বেরিয়ে পড়ে তার ছোট ভাইটাকে সঙ্গে নিয়ে। দু'ভাই-বোন মিলে প্রতি বছর বেশ কিছু ধানই কুড়িয়ে ঘরে আনে। ক'দিন ধরে তারা কিন্তু ঘর থেকে একদমই বেরুতে পারেনি। বাড়িতে ছোট ভাইটা জ্বরে ভুগছে। এই যুবতী বয়সে মাঠে ঘাটে একা একা ঘুরে বেড়ানোটা এখন তার মুখই সংকোচে বাঁধে। তবু সবকিছু উপেক্ষা করে সে আজ একাই বেরিয়ে পড়ে একটা বেতের চুপড়ি হাতে নিয়ে। ভোর বেলাতেই সে খবর পেয়েছিল, বাঁধের ধারে জমির ধান গতকালই সব উঠে গেছে। খবরটা শোনার পর থেকেই তারার মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বাঁধের ধারে নন্দকুমারের এই জমিটা তার খুবই পছন্দ। গতবারও সে প্রায় পাঁচ কেজি ধান এ জমি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। এমন পরমন্ত জমির রাজত্বটা এবার সবাই জেনে লোকে লুটেপুটে খাবে, মনে মনে তারা তা মোটেই সইতে পারছিল না।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই জয়দেব আবার পিছন থেকে ডেকে বলল—আমার ছাগল দু'টো ওখানে বাঁধা আছে, একটু দেখিস তারা।

তারা শুনল এবং যেতে যেতে পিছন ফিরে বলল, দেখব গো মাষ্টার, দেখব।

জয়দেব এখনো অবিবাহিত এবং বয়সে সে তারার চেয়ে মাত্র বছর তিনেকের বড়। অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে গ্রামের এক প্রাইমারী স্কুলে সে শিক্ষকতা করে। সেই সুবাদে তারা তাকে মাষ্টার বলেই ডাকে। বাড়ির অবস্থা জয়দেবের মোটেই ভাল নয়। একমাত্র বাস্তুভিটা ছাড়া জমিজমা বা পুকুর ভেড়ি ওদের কিছুই নেই। বুড়ো মা-বাবা আর ভাইবোন মিলে বাড়িতে তার ছ'সাতটি পুষ্যি। স্কুলের সামান্য মাইনেতে সংসার চলে না বলে অনেক ভেবেচিন্তে শেষে সে দু'টো ছাগল কিনেছে। দু'টো ছাগলই দুধ দেয় এবং দুধের ব্যবসাটা মোটেই খারাপ নয় জয়দেবের। হাতে পয়সা এলে শুবিধামতে একটা ভাল গাই কেনবার ইচ্ছেও যে তার আছে, তারাকে সে কথা জয়দেব অনেকদিনই জানিয়েছে।

বাঁধের কাছে আসতেই তারার মনটা কেন হঠাৎ কেমন তুরু দুরু করে উঠল। সমস্ত মাঠটাই তখন ফাঁকা আর ধু-ধু করছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে মনে মনে ভেবেছিল, মাঠে গিয়ে এ সময় তার পরিচিত দু'একজন সঙ্গী-সাথী সে খুঁজে পাবে। কিন্তু যাদের কথা সে মনে মনে ভেব রেখেছিল, তারা অনেক আগে এসেই কাজ হাসিল করে মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। কিছুদূরেই তারা জয়দেবের ছাগল দু'টোকে তখন মাঠের পাশে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই ছাগল দু'টো ঘাস খোড় খেতে একবার তার দিকে মুখ তুলে ফিরে তাকাল। ওদের দেখে তারা যেন মনে অনেকটা ভরসা পেল। মনে মনে সে ভাবল, জয়দেবও আর একটু পরেই ছাগল নিতে মাঠে আসবে।

তারা মাঠে নামল এবং রোদ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সারাটা মাঠ সে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু ওই ঘোরাঘুরিই

সার। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দু'মুঠোর বেশী ধান সে সংগ্রহ করতে পারেনা। ভাইটার জন্য মনে মনে তারার তখন খুবই আপসোস হয়। ভাবল, সর্দারটার ঘর না হলে এমন দুরবস্থা তার কখনো হতনা। সকলের আগে এসে ধামা ভর্তি করে সকলের আগে আসেই সে বাড়ি ফিরে যেতে পারত। হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে তারা তখন বাঁধের উপর উঠে এসে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই জয়দেবের হাসল দু'টো হঠাৎ ডেকে উঠল ভ্যা-ভ্যা করে। ওদের ডাক শুনে তারা বুঝল, বাড়ি ফিরে যাবার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে হাসল দু'টো। কিন্তু জয়দেবের তখনো মাঠে দেখা নেই। এদিকে নদীর পাড় থেকে ঝিকেলের মিষ্টি রোদটুকুও তখন ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। ছুটে এল শীতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তারা তখন উঠে দাঁড়াল, ঠিক সে সময়ে এক নতুন দৃশ্য তার চোখে হঠাৎ ভেসে উঠল। লাল নীল এক ঝাঁক পাখিকে সে তখন মাঠের এক জায়গায় এসে জড়ো হতে দেখল। ধানের লোভে এসময়ে অনেক পাখিই উড়ে এসে যে মাঠে বসে, তারা তা জানে। কিন্তু এক জায়গায় এত পাখিকে জড়ো হতেত সে কোনদিন দেখেনি? বছরভর মাঠে ঘুরেই ওদের সে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

মনের কৌতূহল মেটাবার জন্য তারা আবার সে সমস্ত মাঠে নামল। কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই পাখিগুলো মাঠ ছেড়ে উড়ে পালাল। পাখিগুলো চলে যেতেই তারা চেয়ে দেখল, মাটির ঢাওড়ের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ধান তখনো সেখানে ছড়িয়ে আছে। ধান দেখেই তারার বুকটা হঠাৎ খুশীতে কেমন ভরপুর হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, কারোর জানা কখনো কেউ কেড়ে নিতে পারেনা।

একটু পরেই জয়দেব হাসল নিতে মাঠে এল।—কতটা খেলিরে তারা? তারার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল জয়দেব। তারা তখন মাটির ঢেলা সরিয়ে সবে একটা গর্তের মুখ দেখতে পেয়েছে। ঘোমটার দুপাটিটা জয়দেবের সামনে তুলে ধরে সে বলে, বেশী নয় মাষ্টার, মাত্র এ'মুঠটা। কাস্তের তগা দিয়ে গর্তের মুখে সে সমস্ত জোরে এক ঘোঁচা দিতেই গর্তের ভিতর থেকে কেমন ঘস্ ঘস্ শব্দ উঠল। জয়দেব সে শব্দ শুনল এবং শোনামাত্র তাঁর চোখদুটো যেন ঈর্ষায় কেমন চিক্ চিক্ করে উঠল। মনে মনে সে ভাবল, এ-ত গর্ত নয়, যেন এক ধানের খনি। তার অনুমান, কম করেও পাঁচ-সাত কেজি হবে। মনের ভিতর তখন কেমন যেন এক আপসোসই জাগল জয়দেবের। ভাবল, মাষ্টারী না করে সে যদি তারার মত ধান কুড়িয়ে বেড়াত, তবে আয় হয়ত তার অনেক বেশীই হত। মনের আক্ষেপ বুকে চেপে রেখে জয়দেব তখন ধীরে ধীরে তার হাসল দু'টোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে সে বলল—সন্ধ্যা যে হয়ে এল। যা পেয়েছিস নিয়ে এখন বাড়ি যা তারা। রাত-বেরাতে গর্ত থেকে কি বেরয় তার ঠিক আছে?

সন্ধ্যা তখন ঠিকই ঘনিয়ে আসছিল। দূরের গাছপালা ছাড়িয়ে শীতের কুয়াশা ক্রমশই যেন কাছে এগিয়ে আসছে। তবু তারাকে তখন কেমন এক নেশায় পেয়ে বসল। মনে মনে সে ভাবল—এমন সাধা লক্ষ্মীকি কখনো পায়ে ঠেলতে আছে? কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির ঢেলা সমেত ধান মুঠো মুঠো করে তুলতে লাগল।

জয়দেবকে দেখেই তার হাসল দু'টো আবার ডেকে উঠল ভ্যা ভ্যা করে। ওরা তার এখন খুবই পোষা এবং আদরের। জয়দেব কাছে গিয়ে, ওদের গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এর একটু পরেই ফসল তার ভবিষ্যৎ বাণীটা। হঠাৎ কি দেখে তারা তখন ভয়ে লাফিয়ে উঠল ওরে বাবা রে বলে।—ওটা কিলো মাষ্টার!

দূর থেকে তারার লাফিয়ে ওঠার ভাব দেখে জয়দেব মনে করল, বোধহয় ওটা কেলে সাপ-কেলেই হবে। হাসলের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সে দেখল—না, ওদের সাপ-কেলে কিছু নয়, একটা খেড়ে ইঁদুর। জয়দেব জানে, সন্ধ্যাবেলা ওরা প্রায়ই উঠে আসে গর্তের ভিতর থেকে। বেশী দূরে না গিয়ে ইঁদুরটা তখন গর্তের চারপাশেই ঘোস্ মেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জয়দেব সেটাকে মারবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা ঢাওড় তুলে নিল। তারা বাধা দিয়ে বলল—মেরোনা, ওকে মেরোনা মাষ্টার।

ইঁদুরের প্রতি তারার অহেতুক মমতা দেখানো মোটেই পছন্দ করল না জয়দেব, বলল—একবার যখন ওকে নাগালে পেয়েছি, তখন মেরেই ফেলব। তাক্ করে মাটির ঢেলাটা ছুঁড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয় জয়দেব।

তারা তাড়াতাড়ি উঠে এসে জয়দেবের হাত চেপে ধরে, বলে—ওকে মেরোনা মাষ্টার। ইঁদুর মারতে নেই।

জয়দেব অবাক হয়ে তখন তারার মুখের দিকে চেয়ে বলে—কেন? শাস্ত্রের বাচন বাজে?

কোন উত্তর না করে তারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। জয়দেব হাতের ঢাওড়টা ফেলে দিয়ে বলে—যত সব কুসংস্কার তোদের! এরা দেশের যে কত ক্ষতি করে তা জানিস?

তারা এবার তার শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিতে নিতে বলে—ওমা। ইঁদুর আবার দেশের কি ক্ষতি করে গো মাষ্টার?

হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জয়দেব বলে—তা তোরা আর কি করে জানবি? অক্ষরের কাগজও পড়িসনা? দেশের লক্ষ লক্ষ টন ধান এরা খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

জয়দেবের কথা শুনে তারা তখন হেসে উঠল খিল খিল করে—কি যে বল মাষ্টার। ওরা আছে বলেইত দু'মুঠো ধান আমরা মাঠ থেকে কুড়িয়ে পাই?

জয়দেব আর দাঁড়াতে চাইল না সেখানে। বাড়ি ফিরে গিয়ে তার আবার হাসল দুইতে হবে। হাসল দু'টো নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য সে তখন খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

● ২১ পৃষ্ঠাতে দেখুন

একটি প্রতীকের জন্ম

কেওটি

বীরেন সাহা

এই প্রতীকটিকে দেখুন। একটি বৃত্তের ভেতর একটি মানুষ। পরিপূর্ণ, বিকশিত।

এবছর অক্টোবরের দুই তারিখে এর জন্ম হল। এদিন থেকেই দেশব্যাপী জাতীয় বয়স্ক শিক্ষার মহত্তম এক কর্মযজ্ঞের হল সূচনা। প্রতীকটি সেই কর্মসূচীর। এত বিরাট বিশাল সুপরিকল্পিত সুবিন্যস্ত সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচী দেশে এর আগে কখনো নেয়া হয়নি। তাই অসাধারণ এর গুরুত্ব। কিন্তু কেন এই কর্মসূচী? প্রশ্নটা অবান্তর। কেননা স্বাধীনতা লাভের একত্রিশ বছর পরে আজো বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী নিরক্ষরের দেশ হিসেবে ভারত উন্নত দেশগুলির করুণ দৃষ্টিপাত ও ভ্রূকুটিকুটিল অবজ্ঞার গ্লানি বয়ে চলেছে। বিশ্বের কথা থাক। ঘরের কথাই বলি। তিন দশকের অক্লান্ত পরিকল্পিত প্রয়াসের পরেও এদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে রয়েছেন। এই দারিদ্র্য এবং এই নিরক্ষরতার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক সুরাসত্ত হলেও, আছেই। কেননা নিরক্ষরতার দরুণই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রবর্তনা জাগেনা। সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলাকৌশলের দ্বার অর্গলবদ্ধ হয়ে থাকে নিরক্ষরদের সামনে। শিক্ষার সোনার চাবিকাঠির খাদুতে খুলে যায় না তাঁদের মানসিক ও আত্মিক শক্তি। তাই দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির নিশানা মেলেনা, মেলনা দুঃখজয়ের প্রচণ্ড ইচ্ছা ও কর্মশক্তি।

তবু আশ্চর্য, আজ, এই অবসিত ১৯৭৮-এও অধিকাংশে ভারতবাসীই এভাবে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ দেশের এই দুষ্টি ক্রনিক ব্যাধি থেকে নিরাময়ের চেষ্টা তো কম থেকে অব্যাহতভাবেই চলছে। চলছে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনামাফিক কর্মপ্রয়াস। খাদ্য, কৃষি, শিল্প সর্বক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াবার ও বাস্তুতি কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। কিন্তু সে সাফল্য ও অগ্রগতি যেমন দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়নি, তেমনি একথাও সত্য, অনেক মানুষই সে কর্ম-কাণ্ডের কাছাকাছি থেকেও তার শরীক হতে পারেননি। নিরক্ষরতাই এক্ষেত্রে প্রচণ্ড আলার বিচ্ছাচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁদের অনগ্রসরতা কেন, কেন দারিদ্র্য, তার কারণ খুঁজে প্রতিকারের ব্যবস্থা তাঁরা নিতে অক্ষম। অক্ষম জীবিকা অর্জনের উন্নততর রীতিগত দক্ষতা বা কারিগরী বিদ্যা অর্জনে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুস্থ রাখার উপায় কী এবং অধিক সন্তান কীভাবে তাঁদের জীবনে বিপর্যয় ঘটাচ্ছে সে সচেতনতাও তাঁদের গড়ে উঠছে না। ফলে সমগ্র জাতীয় জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবার পথে নিরন্তর অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যও বিঘ্নিত হচ্ছে।

এ উপলব্ধি আজকের নয়। স্বাধীনতার আগে গান্ধীজী নই তালিম শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন এদিক থেকে চিন্তা করেই। ১৯৫৭ সালে জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান ছিল তাঁরই আশীর্বাদধন্য। ১৯৫৬ সালে রাজস্থলিতে যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হল সেসময়েই জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে সাক্ষরতার আলোয় নিয়ে যাবার অভিযান সুরু করেছিলেন। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জ্ঞানসাধনা এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু রাজা রাজা আবার যখন সরাসরি ইংরেজ শাসন ফিরে এল তখন স্বভাবতই এই অভিযানেও ছেদ পড়ল।

সাক্ষরতা প্রসারের ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতের এই অসমাপ্ত কর্মের ভার স্বাধীনতার পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ হাতে তুলে নিতে বিলম্ব করেননি। ১৯৫২ সালে যখন গ্রাম ভারতকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হল তখন সেই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে সাক্ষরতা কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছিল। এর নাম দেয়া হয়েছিল সমাজ শিক্ষা কর্মসূচী। দেশের বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তুলবার জন্য এ কর্মসূচীতে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। কিন্তু বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ অর্থের অপ্রতুলতা এবং পাঠক্রমে ব্যাবহারিক শিক্ষণসূচীর অভাবে উল্লেখযোগ্য সুফল এ কর্মসূচীতে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ফলে দেশে সাক্ষরের সংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ৬ কোটিরও বেশী বাড়লেও নিরক্ষরের সংখ্যাও ঐ সময়ের মধ্যে ২৬.৭৫ কোটি থেকে বেড়ে ৩০.৭২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতা বৃদ্ধির কাজ অগ্রগত হয়েছে সন্দেহ নেই। পঞ্চম পরিকল্পনায় বয়স্ক সাক্ষরতা খাতে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ও হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক সাক্ষরতার মত এতবড় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে যথোচিত প্রাধান্য দেতে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। ব্যাপারটা দুঃখের। তবু বিলম্ব হলেও গত ২ অক্টোবর যে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হল তা বস্তুত

এদেশে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে প্রথম সুপরিকল্পিত নিষ্ঠাবান প্রয়াস। এর লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট, কর্মধারা ব্যাপক। রাজনৈতিক সচিবতা ও জাতীয় সম্পদও রয়েছে এর পেছনে। বিপুল জনবল ও অর্থসম্পদ এর হাতিয়ার।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য কি তা বয়স্ক শিক্ষার নীতিসংক্রান্ত বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের হিসেবে, ভারতে বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। এঁদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। শিক্ষার অভাবে এই সবচেয়ে সৃজনধর্মী বয়সের বিপুল-সংখ্যক যুবকদের প্রাণশক্তির অপচয় যাতে চলতে থাকে বছরের পর বছর। জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, এই দশ কোটি নিরক্ষর মানুষকে প্রায়োগী পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা। এর চাই নয়, এমন একটি উপ-কাঠামো ও সামর্থ্য গড়ে তোলা যাতে বছরে সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষরকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়। এটা জরুরী, কেননা ধরি ধরে নেয়া যায় আগামী দশ বছরে দশ কোটি নিরক্ষরকে শিক্ষিত করবার লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি প্রাপ্তিত হবে, তাহলেও এদেশে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী চালিয়েই যেতে হবে। কারণ ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়-শিক্ষা যতদিন না বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সাংবিধানিক নির্দেশে পালিত হচ্ছে ততদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষররা বয়স্ক নিরক্ষরে পরিণত হতে থাকবে। তখন তাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর দরজা খোলা রাখতেই হবে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, বয়স্ক শিক্ষার এই জাতীয় কর্মসূচী আগেকার মত বয়স্ক নিরক্ষরদের শুধুমাত্র সাক্ষর করবার প্রতিশ্রুতিতেই সীমিত নয়। তাঁদের প্রয়োজন ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এক কৃত্রিম পরিবেশে শিক্ষা-দানের চিরাচরিত প্রকল্প এবার বর্জিত হয়েছে। বরং তাঁদের পরিবেশ ও জীবন-যাত্রার সমস্যার কথা মনে রেখে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও পছন্দমত জীবনযাত্রা পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক চেতনা বিকাশের উপযোগী শিক্ষা তাঁদের দেয়া হবে। সাক্ষরতা হবে সেই শিক্ষারই অঙ্গীভূত এক, প্রধান নয়। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন চিরাচরিত ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হবে, তেমনি তাঁদের সেইসঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির সোপানেও পৌঁছে দেয়া হবে। সেই সঙ্গে থাকবে ভবিষ্যতে সাক্ষরতোত্তর স্তরে পড়াশোনা চালাবার আগ্রহ সৃষ্টি। সামাজিক চেতনা জাগরণের ফলে এই বয়স্ক নিরক্ষররা নিজেদের নানা, বাপরক্ষাচ শোষণের বিরুদ্ধে ভোটবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। ৯ থেকে ১০ মাস ধরে এই শিক্ষাক্রম চলবে। সহজতর সম্ভব স্থানীয় কথা ভাষায় লিখবার ও পড়বার জন্যে তাঁদের মধ্যে পড়ে তোলা হবে। শিক্ষা-পরিচালনায় যথাসম্ভব স্থানীয় লোকই থাকবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়, যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা, কৃষির নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, হস্তশিল্প ও গ্রামীণ শিল্প উন্নতির উপায়, সমবায় ও বিপণনের পদ্ধতি প্রভৃতি হবে তাঁদের শিক্ষণীয় বিষয়। এভাবে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় অগ্রগতির কর্মযজ্ঞের শরীক হয়ে উঠবেন তাঁরা।

তবে এখানেই জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্ম-সূচীর বর্ণক্রম শেষ নয়। ৯-১০ মাসের শিক্ষাক্রম শেষ হবার পরেও যাতে শিক্ষার আগ্রহ তাঁদের অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যাতে তাঁরা উচ্চতর পর্যায়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন তার জন্য শিক্ষোত্তর কর্ম-সূচীর সংস্থানও রাখা হয়েছে। এজন্য পাঠাগার ও গ্রন্থাগার থাকবে, বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, থাকবে দলগত সমস্যা উন্নয়নসংক্রান্ত কর্মপ্রয়াসের ব্যবস্থা। এগুলো হবে অনুসারী প্রকল্প। নবশিক্ষিতদের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের অনুকূলিক ও সুসংহতির ব্যবস্থাও এই অনুসারী কর্মসূচীর অঙ্গ হবে।

সারা দেশে এই বিরাট কর্মসূচীটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার একটা নির্দেশনা কর্মসূচী-সংক্রান্ত রূপরেখায় তুলে ধরা হয়েছে। সে অনুযায়ী গড়ে উঠবে অসংখ্য জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রকল্পকৃষ্ট। এগুলির এক একটি প্রকল্পকৃষ্টের এলাকা সাধারণত সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের সমতুল হবে। তবে দুটি ব্লক নিয়ে এক একটি প্রকল্পকৃষ্ট কিংবা একটি ব্লকের এক অংশে একটি করে প্রকল্পকৃষ্টও গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি প্রকল্পকৃষ্টের দায়িত্বে থাকবেন একজন প্রকল্পকৃষ্ট অধিকর্তা। তাঁর নিম্নরূপে থাকবেন একদল সুপারভাইজার। প্রকল্প-কৃষ্টের আওতায় যে ২০-৩০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র থাকবে তার প্রতিটি কেন্দ্রের দেখাশোনা করবেন এক একজন সুপার-ভাইজার। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক বা ইনস্ট্রাক্টর-ইন্সের নিযুক্ত করবেন প্রকল্পকৃষ্ট অধিকর্তা সুপারভাইজার ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রত্যেক ইনস্ট্রাক্টর বা শিক্ষক মাসে ৫০ টাকা করে সাম্মানিক ভাতা পাবেন। ইনস্ট্রাক্টর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রটিকে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মী ও ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের সাহায্যে গড়ে তুলবেন। কেন্দ্রটি যাতে নিছক সাক্ষরতা কেন্দ্র না হয়ে উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের স্থান হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে ইনস্ট্রাক্টরের দায়িত্ব কম নয়। এই সূত্রেই স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধি-কারিক বা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের মত গ্রাম পর্যায়ের সরকারী কর্মীদের সাহায্য অপরিহার্য। কারণ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে যখন কৃষি বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন আলোচনা হবে তখন তাঁরাই সংশ্লেষণে এগিয়ে আসবেন।

কোন অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গঠন করবার সময় প্রাধমিক ও বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে মহিলা এবং তপশীলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের ছেলে। কেননা নিরক্ষরতার ও অনগ্রসরতার মার তাদের মধ্যেই বেশী। এই অগ্রাধিকার মানে এজন্য যে, কর্মসূচীটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার আগে প্রথম দিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকার

কেন্দ্রীভূত রাখা হবে। তার সে সব এলাকা বেছে নেওয়া হবে উপরিউক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

এইসব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক কারা হবেন? পঞ্চাশ টাকা ভাতা দেওয়া হলেও শিক্ষকের কাজটা হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। কাজেই শিক্ষক হিসেবে স্কুল শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, গ্রামীণ বেকার বা আধা-বেকার যুবক, অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য কর্মচারী, গ্রামসেবক, মাতৃসেবিকা, পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী প্রভৃতির মত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজ-কর্মীদের কথা ভাবা হয়েছে। প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী এঁদের মধ্যে থেকেই শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে কাজ করতে এগিয়ে আসবেন তাঁরা। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন ও পরিচালনার ভার কাদের হাতে দেওয়া হবে তাও স্থির হয়েছে। এক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়া নেহরু যুবক কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগের মালিকপক্ষ, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির মত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। তার যেসব এলাকায় এসবের মধ্যে কোনো সংস্থাই নেই সেখানে রাজ্য সরকার নিজেই বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠনের ভার নেবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী ব্যক্তি-সমাজকে এই বিরাট কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত করলেও এর রূপায়ণের সামগ্রিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এর ওপরে। নীতি রচনা ও নির্দেশিকা প্রদান ছাড়াও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীটি যাতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নীতিসঙ্গতভাবে বিভক্তি অনুযায়ী যথাযথ রূপায়িত করেন তা দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের শাখা স্তর পর্যন্ত এক সাংগঠনিক কাঠামো প্রশাসন ও তদারকির দায়িত্ব নেবেন। বস্তুত এই কর্মসূচীর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তার চেয়ারম্যান। এছাড়া প্রতিটি রাজ্যেও একটি করে বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ থাকছে। এই পর্ষদের সাময়িক নির্দেশনায় একজন করে রাজ্য বয়স্ক শিক্ষা অফিসার কাজ করবেন। জেলা স্তরেও এই পর্ষদের মত একটি করে বয়স্ক শিক্ষা কমিটি থাকবে। সেই কমিটি জেলা বয়স্ক শিক্ষা অফিসারকে পরামর্শ দেবেন। এই অফিসার জেলা সমাহর্তাকে জেলা বয়স্ক শিক্ষা সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। শহর পর্যায়েও এরকম একটি সংগঠন থাকবে।

> জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রথম হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ২ অক্টোবর, ১৯৭৮ থেকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করছেন। ১৭ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ৭৬ কোটি নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এজন্য আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে ২,৩৪,৯৬৯টি নতুন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে সমগ্র কর্মসূচীটি রূপায়ণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১০৫৬ কোটি টাকা। শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় হবে ৮০ টাকা। কিন্তু ১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনাকালে এবাবদ মোট ব্যয় ৬৮৬ কোটি টাকার বেশী হবে না। বাকী টাকাটা পরবর্তী পরিকল্পনার প্রথম বছরের বরাদ্দ। বর্তমান পরিকল্পনায় এই যে ৬৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে তার মধ্যে মাত্র ২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বাকী টাকাটা রাজ্যোন্নয়ন কর্মসূচী, আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচীর তহবিল থেকে পাওয়া যাবে। যোজনা কমিশন আশ্বাস দিয়েছেন, ঠিকমত রূপায়িত হলে এ কর্মসূচীতে টাকার বরাদ্দ আরো বাড়ানো হবে।

শুধু অর্থ নয়, শিক্ষার উপকরণ এবং আনুষঙ্গিক সম্পদ জোগাবার ব্যবস্থাও এই কর্মসূচীতে রাখা হয়েছে। পূর্ববর্তী বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে বর্তমান কর্মসূচীর পার্থক্য এদিক থেকেও লক্ষণীয়। পাঠক্রম ও শিক্ষার উপকরণ তৈরী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচীর সর্বস্তরে মূল্যায়ন এবং এবং শিক্ষোত্তর কর্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ-দান—এসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সম্পদ কেন্দ্র বা রিসোর্স সেন্টারের ওপর। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মিলে এ ব্যাপারে এক জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র বা গুরুপ পরামর্শ দেবেন। কেন্দ্রীয় স্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের বয়স্ক শিক্ষা দপ্তর একক রূপায়িত করবেন। রাজ্য স্তরেও প্রতিটি রাজ্যে এরকম একটি করে সম্পদ কেন্দ্র থাকবে। টিমোথাই আর্থার কর্মসূচীটি চালু হবার দিন থেকেই পনেরটি রাজ্য এরকম সম্পদ কেন্দ্র গঠন করেছেন। বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচীর প্রতিটি প্রজেক্টেই সম্পদ তৈরীর কাজ চলবে। চলবে শিক্ষার উপকরণ তৈরী, বয়স্ক শিক্ষা কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজ। মূল্যায়ন করবেন কেন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সমাজশিক্ষা সংগঠনের কোন প্রতিষ্ঠান বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কর্মসূচীর ত্রুটি দূর করবার জন্য এ মূল্যায়ন সব সময়েই চলবে। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা-কর্মীদের পরিচিত করবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য ২১ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স থাকবে। এছাড়া থাকবে রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা। বয়স্ক শিক্ষার কাজ কতদূর এগোল সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও এই সম্পদকেন্দ্রগুলি করবে।

গান্ধীজয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে এবছর কর্মসূচীটির সূচনা হল মাত্র। আসল কাজ সুরু হবে আগামী বছর ৩১ মার্চের পর থেকে। এর আগে পর্যন্ত চলবে ব্যাপক প্রস্তুতি। সর্বশ্রেণীর মানুষ ও প্রতিষ্ঠান যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর সফল রূপায়ণে এগিয়ে আসেন, যাতে গড়ে তোলা যায় বয়স্ক শিক্ষার এক ব্যাপক উপ-কাঠামো, তারই জন্য এই প্রস্তুতি। ভারতের মত বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরের দেশে বয়স্ক শিক্ষার পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন এক কঠিন ব্রত। এই ব্রতে উদ্যোগী হতে হবে আপনাকে, আমাকে, সকলকেই।

সেবার নতুন প্রতীক

১৯৭৮ সালের ১লা এপ্রিল এই নতুন প্রতীকের জন্ম। পূর্বতন ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে পুনর্গঠিত করে যে পাঁচটি নতুন সংস্থা গঠন করা হয়েছে, **হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড** তার একটি।

শুধুমাত্র সার বিক্রয়ই নয়, বিনামূল্যে জমির মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সার প্রয়োগের সুপারিশ, চাষীর চাষসংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান চাষবাসের উন্নতিতে সবরকমের সহায়তা করার জন্য পূর্বভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এইচ-এফ-সি-এর দক্ষ কর্মীরা ছড়িয়ে আছেন।

আমাদের লক্ষ্য: **গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি।**

হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ

(বিপণন বিভাগ)

মহিলা মহল

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'—একথার যথার্থতা বোঝা যায় প্রতিটি পরিবারের সমস্ত কাজের ভেতর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তির হাতের ছোঁয়ায়।

এই পরিবারকে যদি আমরা আরও বৃহৎ আকারে কল্পনা করি, যদি গোটা সমাজকে আমরা এক অধিতন্ত্র সংসার বলে ধরে নিই, তবে আরও প্রতিটি স্তরে প্রয়োজন আছে এই সেবাপরায়ণা নারীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা যার গুণে ফল ফুল হয়ে ফুটে উঠে সুসংঘে তরিয়ে তুলবে সারা দেশটা।

তাই দেখা যায়, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের মেয়েরাও এগিয়ে এসেছেন দেশসেবার পবিত্র সাধনায়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, মেয়েদের উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি হতে পারে না। আর সমাজের উন্নতি না হলে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য কোনমতেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এইজন্যই বোধহয় ১৯৪৭ সালের পরে সারা ভারতে প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় মহিলারা অংশগ্রহণ করেছেন এদেশের নারী-সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নতির বিভিন্ন পরিকল্পনায়।

সরকারী সাহায্য ছাড়া এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না—একথা ভারতের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখ চিন্তা করেছিলেন গভীরভাবে। তাই তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে দিল্লীতে স্থাপিত হল সেন্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, যার সভানেত্রীর পদে প্রথম বসলেন স্বয়ং শ্রীমতী দেশমুখ।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও তৈরী হল এই ধরনের বোর্ড যাকে বলা হয় সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ। এই উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শ নিয়েই কেন্দ্রীয় বোর্ড বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থাকে সাহায্য করে থাকে তাদের নানা ধরনের প্রগতিমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়ণের কাজে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্যা গ্রহণ করে তৈরী হয় এই পর্ষদ। আর বোর্ডের নির্দেশমতই এঁরা নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় মহিলা-স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয় সাহায্য নিয়ে সার্থক করে তোলেন নানা ধরনের কর্মসূচী।

স্বেচ্ছা-সেবীর কাজে মেয়েরা

এছাড়াও অবশ্য অনেক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী-প্রতিষ্ঠান আছে যারা মহিলা-মণ্ডল অথবা মহিলা-সমিতির পরিচালনায় করে যাচ্ছে দেশের তথা দেশের সেবা।

সারা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের সরকারী, আধা সরকারী আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় হাজার দুই দুই করছে। আর এইসব প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রায় বারোশ হাজার স্বেচ্ছা-সেবিকারা সারা বছর কাজ করে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে।

কিন্তু শুধু কুসংস্কারের অবহেলায় যদি এখনও যে কত মহিলা ছেড়ে থাকেন গ্রামাঞ্চলের ঘরের কোণে তার একটা পরিষ্কার ছবি যদি তুলে আনা যায় তবে দেখা যাবে যে কতখানি অজ্ঞতা আর অসহায়তার অন্ধকারে এখনও ঢাকা পড়ে আছেন সুদূর পল্লী অঞ্চলের মা-বোনেরা।

তাই রাজ্য ওয়েলফেয়ার বোর্ড পরিবার ও শিশু-কল্যাণ প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃ-কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করে চেষ্টা করছেন পল্লী অঞ্চলের মহিলাদের সুপ্ত মানসিকতা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আলো ফেলে কুসংস্কারের কালো পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেলবার।

বাচ্চা বয়স থেকেই যাতে তাদের ছেলে-মেয়েরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বড় হয়ে ওঠে, শারীরিক আর মানসিক সুস্থতাকে বজায় রাখতে পারে তার জন্য এইসব মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা 'বাল-বিকাশ কেন্দ্র' চালাচ্ছেন নিজেদের এলাকায়।

তারা জানেন শিশুরাই দেশের তথা জাতির ভবিষ্যৎ। তাই Children Hobby Centre স্থাপন করে এঁরা চেষ্টা করছেন এই ভবিষ্যতের নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খার কুঁড়িগুলোকে একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলার।

শহরাঞ্চলও কিন্তু বাদ পড়েনি এইসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজের আওতা থেকে। তাই বস্তির উন্নতি করা, বয়স্কা-দের জন্য শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করা, অসহায় মেয়েদের নানা ধরনের হাতের কাজ শেখানো ইত্যাদি রকমারী বিষয় নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন শহরের বিভিন্ন এলাকায়।

এছাড়া সীমান্ত এলাকা প্রকল্প নামে একটি সুন্দর পরিকল্পনা সীমান্ত অঞ্চলে চালু করেছেন নিষ্ঠাবতী মহিলা-কর্মীরা। সুদূর নেপাল-সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্তমানে আটটি প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী উন্নয়নমূলক কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবিকারা।

একটি সুকোশলে কেন্দ্র কর্মরত মহিলারা

এখানে একটি কথা জানানো প্রয়োজন যে, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফর্ম দেওয়া হয়েছে, এজন্য এর ফোটো কপির প্রয়োজনীয়তা নেই।

এ বিষয়ে সরকারী নির্দেশে মুখ্যশিক্ষা-ক্রমে ছয়টি মূল্য পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মূল্যায়নে বলা হয়েছে, সরকারী এবং বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মূল্য প্রয়োজনীয় সাহায্যেই গড়ে উঠে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ।

দুটি সমাজকে একত্রে মেলার পর হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি উপায়। যেমন :—

(ক) সমাজ কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে বহু সংখ্যক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা, আর তার ফলে বিভিন্ন ধরনের সেবাকেন্দ্রসমূহকে পরস্পর এবং জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার মনোভাবের সুষ্ঠু মূল্যায়ন, অন্তরঙ্গ-আলাপ আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কারণ জেনে নেওয়া। তারপর সমাজসেবা-কে মূল ধরার উপায় প্রবর্তন করা,

(খ) প্রতিটি ছেলের মন থেকে জীবন-সম্পর্কের ভাব মুছে দিয়ে "আত্মকেন্দ্রিক" বোধ জাগিয়ে তোলা,

(গ) সবরকম কুসংস্কার দূর করে দিয়ে স্বাধীন মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা,

(ঘ) স্বাধীন মহিলাদের ছেলের মেয়েরা যেন্নী তিন্নী করে নারী-জাগরণ-আন্দোলনের ভার চালাবার ভার তুলে দেওয়া,

(ঙ) চৈত্রিক কিংবা সামাজিক কারণে আমাদের-পশু যা বেমানান উপযুক্ত ভাবের কাজ করবার জন্য কোন কারণে নিন্দা দিয়ে আপনারী করে উঠতে সাহায্য করা ইত্যাদি।

মূলের কথা, এই ভাবে ভাবা দিয়ে ছেলের বিভিন্ন ভাব থেকে আত্মকেন্দ্রিক ভাব এনিয়ে আসবার পরিকল্পনা স্বাধীন ভাবতে একটি মূল-সমাজ সৃষ্টি করা মূলের সমাজ গড়ে তোলার কাজে ছেলে দিয়ে ছাত্রীদের পরিচয় বেমানানের। ছেলে-মেয়ের কাজে ছেলেদের পরিচয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কোনোরকমেই ভাব অবহেলা করা যায় না।

উমা চাপড়ত

যৌ-শাসনের মাধ্যমে পরিবর্তনতা

যাই হক পাঠ্য করে আত্মকেন্দ্র ছেলেদের ভাব নেই। ঠিক এই অবস্থায় আমরা তাদের পাই যৌ-শাসন করবার জন্য ছেলেদের একত্রিত করবার ছেলেরও শিক্ষিত বেকার ছেলে, তখন সমিতি আসলে গড়ে উঠে। পরিকল্পনার ধারণা এর আগে পাকিস্তান ছেলেটি ছাত্রদের বাসিন্দা পরিচালক মো. মি.এ. আলম এবার চাকুরীর জন্যে চেষ্টা করে করেছিল। ছেলে নিজের পরে পরিচালক নিজের ভূমিকায় একক অনুপ্রাণিত করেছে। প্রথমেই যার ছেলে এবে একটা ভাব বিশ্লেষিত। আলোচনা দূর করা। সমিতির ছেলে ছেলেরা দূর। আলম দূর ছেলে যেন চলাচলে কি সমস্যা।

পরিচালক প্রথমেই ছেলে নয়। পরিচালনের ভাবনা পাকিস্তান দূর পরিচালন পাকিস্তান সমিতিতে যে চলে দেয়ে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সমাজের ছেলে বিশ্বাসের ছেলেদের ট্রেনিং নেবার জন্য নির্বাচিত করে। ৭১ সালে আন্দোলনে তার চোখ খুলে দিয়েছে। আলমের ছেলেরা ছিলেন ইনভেস্টিগেটর (আই. মি. এ. আলম) প্রতিষ্ঠানের একক কর্মী ছাত্রে ছেলেদের দিয়েছে প্রতিষ্ঠানের ভাব তাদের। পরে তিনি যৌ-পাকিস্তানের নতুন সমাজ এবং টেকনিক্যাল ছেলেদের মনোনীত।

তা, প্রশ্নগুলোর সমস্যা ছেলে তারা এই ছেলেটির মনে নতুন করে যৌ-পাকিস্তান সম্পর্কে ছেলে? সারা পরিচালক একটি প্রশ্নাবলীর আকারে সমাজের ছেলে-মেয়ে, ছাত্রদের পরিচয় পরিচয় নিয়ে মোট ৫০ ছেলেটির। প্রথম সংখ্যা ছেলে ছেলেরা ছেলে। প্রতিটির প্রথম ১০ মিনিটের দূর ছেলে পরিচালক।

প্রথমে যখন যৌ-পাকিস্তান ছেলে ছেলেরা ছেলে দৃষ্টিতে তারা। তারা আরো ছাত্রির ৩৭৯ পরিচালনার ছেলেদের সাথে দূরে পরিচালনে। ছেলে প্রশ্নগুলোর ছাত্রির ছিলেন সমাজে ছেলে ছেলেদের ছাত্রির ছেলে পরিচালক ছিলেন দূর ছেলে ছাত্রে। প্রথম দৃষ্টি ছেলেমেয়ে ৭৭ ছেলেদের ছাত্রছাত্রী ছেলে, আরে পরিচালক, ছেলেদের ছিলেন ছেলের দূরের পরে। ছিলেন ছেলেদের প্রথম ছাত্রছাত্রী ছেলে ছাত্রে ছেলেদের।

ছেলেদের পরিচালনে দূর ছিলে ছেলে ছেলে ছিলে, আরো ছিলে ছিলে ছেলে ৭০ মিনিট দূর ছিলে ছেলে ছাত্র। বাকি দৃষ্টি ছিলে? ছাত্র।

ছাত্রদের ছাত্র কি ছাত্র? ছেলে ছিলে ছাত্রে যে পরিচালনে ছাত্র ছাত্র দৃষ্টির দূর পরিচালনে ছিলে ছাত্রছাত্রে। ১৭ ছিলেন দৃষ্টির ছাত্র প্রথম পরিচালনে ছেলেরা ছেলেছে। ছাত্রের ছাত্র ছে ছেলেছিলে। ছাত্র, ছেলে ছাত্র ছেলেছিলে। ছাত্র দূরের ছাত্র বাকি ছেলে ছাত্রছি।

দূর ছেলেদের ছাত্রে। ছাত্র ছাত্র ছাত্রী পরিচালনে ছাত্র ছাত্রে ছেলেছে পরিচালক। একটি ছেলেদের ছাত্র ছেলেদের ছিলে ছাত্রে। পরিচালনে ছাত্র ছাত্রে দূর ছিলে দিয়ে। ছাত্রে দূর ছাত্রে ছিলে ছেলে। পরিচালনে ছাত্রে, পরিচালনে ছাত্রে ছাত্রে যৌ-পাকিস্তানের ছাত্রদের ছেলেদের পরিচালনে। ছেলে ছাত্রী পরিচালনের ছিলেনে দূর ছেলে ছাত্র প্রথমের পরিচালনে ছাত্রদের ছাত্রে ছিলে ছাত্রদের পরিচালনে।

পরিচালনে যে ছাত্র ছেলে ছাত্র ছাত্র ছিলে ছাত্রে ছাত্র ছাত্রদের পরিচালনে ছিলে ছাত্রে ছিলে ছাত্রে ছাত্র ছিলে ছাত্রে ছাত্রে ছাত্রে ছাত্রে ছাত্রে ছাত্রে। যৌ-পাকিস্তান অনুপ্রাণিত পরিচালনে ছেলেদের ছাত্রদের ছিলে ছাত্রদের ছিলে ছাত্রে পরিচালনে পরিচালনে।

এ এস. এম. কামরুজ্জামান পাকিস্তান

গ্রাম বাঙলার কড়চা

বাঁশ ঝোপের সাহায্যে কী অপূর্ব সুন্দরভাবে সবুজ মে ছাতা ঘাস করে ঝোপের আবাক করে দেয়।

ছুটোনাটা ঘরে ঢুকে ঘরে নিমুর খাচ্ছে। এদিকে এদিকে মহিলা ঘিরিয়ে আসছে ঘরে ঢুকে পড়ছে খাচ্ছে। আসবাবপত্র ঘরে ঘরে পড়ছে খাচ্ছে। ঘরে ঘিরিয়ে ঘিরেছে খাচ্ছে। খাবারে ঘরে ঘরে ঘরে ঘিরিয়ে খাচ্ছে। ঘরে ঘরে ঘরে

গ্রন্থ আলোচনা

বিদেশীর ভারতবিদ্যা পথিক। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত। জয়ন্তী কে এল এম প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-১২ দাম: ২৫ টাকা

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলেছিলেন বড় ইংরেজ, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যায় স্বল্প। বস্তুত, কোন ইংরেজ জাতির মধ্যে তাবৎ বড় ইংরেজ মানব সমাজের যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যদি তিনি মানসিক ঔপনিবেশিক হন। সেই জাতের ওঁরাও, যাঁরা ভারত-বিদ্যা চর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। যাঁরা ভারত আবিষ্কারের সন্ধানী, দ্রষ্টা। যাঁরা আধুনিক ভারত গঠনে পালন করেছেন অগ্রদূতের ভূমিকা। গৌরাঙ্গ-গোপাল সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর বিদেশীর ভারতবিদ্যা পথিক গ্রন্থে এঁদেরই জীবন ও কর্মের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকেই পশ্চিমী দুনিয়ার লোভের দৃষ্টি পড়েছিল প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রতি। সোনার ভারত ছিল তাদের লক্ষ্য। অবশ্যই সুযোগে একদিন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। এর সঙ্গে, সার্থবাহীদের সঙ্গে একই তরণীতে এসেছেন অন্য আর এক বণিক দল, যাঁদের বাণিজ্য ভারত-আত্মার মহিমমুগ্ধ, চিরন্তন এষণা। ভারত আত্মার বিকাশের পথে তাঁদের অবদান ভারতীয় মনীষীদের চেয়ে কিছু কম নয়। গৌরাঙ্গগোপালবাবু ২৩ জন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদের জীবন ও তাঁদের ভারত বিদ্যাচর্চার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ এসেছিলেন ভারতে বন্দুক হাতে সৈনিক বৃত্তি নিয়ে, কেউ এসেছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে। তারপর এসে ভারতের সাহিত্য দর্শন ও সংস্কৃতির চর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। কেউ কেউ ভারতের মাটিতেই দেহ রাখলেন। যেমন স্যার উইলিয়াম জোন্স। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যিনি এশিয়াটিক জোন্স নামে পরিচিত ছিলেন। অনেকে ভারতে আসেননি। কিন্তু দূর সিঙ্গাপুরে বসে ভারতবিদ্যাচর্চায় নিরলস সাধক সমস্ত বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন ভারতের শাশ্বত সত্তা। যেমন ম্যাক্সমুলার। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর অসামান্য কীর্তি। এইরকম আরও অনেকজন। এছাড়া এই বইটিতে আছে ১৩৭ জন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সমস্ত বইটি পড়লে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মে, পৃথিবীতে এমন দেশ কমই আছে, সম্ভবত আলো নেই, যেখানে ভারতচর্চার প্রয়াস দুর্লক্ষ্য। বিদেশী এই পণ্ডিতদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে আমাদের আত্ম-পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয়। জানতে পারি, আমরা ভারতবাসীরাও গর্ব করতে পারি, এমন সন্তান আমাদের বড় কম নয়। সেই সন্তানের হদিসও আমাদের জানা দরকার। গৌরাঙ্গগোপালবাবুর বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ভারততত্ত্ববিদদের জীবনকথা রচনার শুষ্ক পাশে বিশ্লেষণ করেননি, তিনি ভারতবিদ্যার বর্ণাঢ্য চিত্রপটটিও নিপুণ শিল্পীর মত তুলে ধরতে পেরেছেন।

এই ধরনের বই লেখা খুবই পরিশ্রম-সাধ্য। গৌরাঙ্গগোপালবাবুও এসব জানেন। জেনেশুনেই তিনি এই কঠিন কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। পুরস্কার না মিলুক, আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলবো গৌরাঙ্গগোপালবাবু এই বই লিখে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

অমিতাভ চক্রবর্তী

জাহাজমহলের বিপক্ষে। লু সুন। সান্ত্বনা প্রকাশনী। মূল্য ৮.৫০ টাকা।

অবস্থাপন্ন চীনা পরিবারের ছেলে লু সুন ঘটনাচক্রে পরিচয়ের সন্ধানে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তিনি চিরকালই সংগ্রাম করেছেন। ভুল থেকে পাশ করে জাপান গেলেন ডাক্তার হবার জন্য। হলেন সাহিত্যিক। অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের স্বাদ পৌঁছে দিলেন স্বদেশ-বাসীর কাছে।

লু সুনের লেখায় বিপ্লবপূর্ব চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাপ্রবাহের সংঘর্ষ চলছিল তার আভাস পাওয়া যায়। মানসিকতায় তেজী ও নির্ভীক হলেও লু সুনের লেখায় আশ্চর্য কবিত্বশক্তির পরিচয় নিহিত রয়েছে। লু সুনের বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি পুরোপুরি চীনের পটভূমিকায় লিখেছেন এবং মানসিকতায় তিনি পুরোপুরি স্বদেশী।

লু সুনের আসল নাম চৌ-সু-জেন। তাঁর এই গল্প সঙ্কলনে মোট ৮টি গল্পের অনুবাদ করেছেন সম্পাদকসহ তিনজন অনুবাদক। ইংরাজি থেকে অনূদিত হওয়ায় মূলের আস্বাদ পাওয়া খুবই কঠিন। এবং পুরোপুরি আঞ্চলিক অনুবাদহেতু অনেকক্ষেত্রে নিষ্প্রভ, প্রাণ-হীন। এছাড়া, ছাপার ভুল, প্রুফের রকমের চরক এই সঙ্কলনের মুদ্রণ সৌকুমার্য বিশেষভাবে ব্যাহত করেছে। তবু ভাল লাগল শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী ও শ্রী ব্রজ-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

বর্তমান সঙ্কলনের গল্পগুলিতে বক্তব্য সোচ্চার নয়, তবে ইঙ্গিতধর্মী। 'বন্যার পর' গল্পটিকে বন্যাত্রাণে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করা যেতে পারে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। বইটির ভূমিকায় লেখকের জীবনী ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পাঠকের কৌতূহল মেটালেও গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে পারে না। সম্পাদকের অনামনস্কতার নিদর্শন আছে 'বন্যার পর' গল্পটিতে। প্রথম পাতার ফুটনোট দেওয়া হয়েছে পরের একেবারে শেষে। গ্রন্থসজ্জাও সুদৃশ্য হয়নি।

চীনের সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব প্রসারিত নয়। বাঙালী পাঠকের কাছে চীনের সাহিত্যকে পৌঁছে দেবার জন্য এই প্রয়াস সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

সোমনাথ দে

আলাপ

জুন ১৯০২ সাল। রাজারিবাগের বর্ষাধৌত প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘোলাটেজলের সুন্দর দিনগুলি-রাতগুলি চাঙ্গারিবাগেই কেটেছে তাঁর। সে সময়ে মনীষায় দীপ্ত, বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত সচ্চিদানন্দ ঘোষের সুশ্রিয় ও প্রয়োজনীয় সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। ছোট-বেলাতেই বাইরের আকাশবাতাস জন-মাটি তাঁকে নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। একটি ভিখসী দলের কাণ্ডিভাল কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন কিছুদিন। আসলে তাঁর কর্মজীবন নানা বৈচিত্র্যের এক মনোহারী মালা। সংগ্রহ করেছেন নানাভাবে। কখনো স্টোরকিপারের কাজ, কখনো সুপার-ভাইজার, কখনো সার্কাস কোম্পানীর কর্মী, কখনো বা ইনফ্লুয়েঞ্জার। যিনি উত্তরতিরিশে এসে একটি অসাধারণ গল্প লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন তাঁর জন্যে এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল খুবই।

আমরা এতক্ষণ যাঁর কথা বলছি তিনি বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—এক সহৃদয় জীবনশিল্পী—খ্যাতকীর্তি কথাসাহিত্যিক শ্রী সুবোধ ঘোষ। যে অসাধারণ গল্পটির উল্লেখ করা হয়েছে তার শীর্ষনাম 'প্রযাত্রিক'। অনেক গল্প উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধও কিছু কম লেখেননি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-গুলির দীর্ঘ তালিকা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যাক—'ফসিল', 'তিলাঞ্জলি', 'পরশুরামের কুঠার', 'ছিন্নমস্তা' 'একটি নমস্কারে', 'অযুতস্য পুত্রাঃ' 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস', 'পুতুলের চিঠি', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'অমৃতপথযাত্রী', 'ভারত প্রেমকথা', 'শতক্রিয়া', 'জিয়াভরনি', 'তিলা মালবী'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন।

মহালক্ষ্মীবতী এক রবিবারের ছুটির দিনের সকালে তাঁর সেকটাউনের বাড়ীতে হাজির হয়েছিলাম। তাঁর পূর্ব উপন্যাসিক উত্তম আমি প্রথম আসছে আপনার কলমের ভিতরে আসতে। একটু পরে উত্তমবাবু উঠে গেলেন সৌমেন্দ্রনাথ সুবোধ ঘোষ এলেন। পায়ের ধুলো নিলাম। চায়ের পর এক প্রশ্ন করলাম। অনেকক্ষণ। উত্তর দিলেন পরম রমণীয় এক প্রসন্নতায়। সেই কথামালা নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

— আপনার প্রথম গল্প 'প্রযাত্রিক' কবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোথায়?

— আমার লেখা প্রথম গল্প 'প্রযাত্রিক' আনন্দবাজার পত্রিকার পত্রিকার বার্ষিক (পূজো) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে।

— তখন আপনার বয়স ৩১। হঠাৎ গল্প লিখে ফেললেন? এর পিছনে কি কোনো ইতিহাস আছে?

— ঘটনাটি আকস্মিক। এর আগে আমি গল্প লিখিনি। এ প্রসঙ্গে আমার কোনো অনুপ্রেরণাও ছিল না। অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, সরোজ আচার্য, গোষ্ঠ অধ্যক্ষ বিজন ভট্টাচার্য, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ প্রভৃতির একটি সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। এখানে আমিও একজন নিয়মিত সদস্য। কিন্তু আমার দৃষ্টি কান ছিল। শুধু মন দিয়ে অন্যদের লেখা শুনতাম আর মন দিয়ে খাওয়াদাওয়ার আনন্দটুকু উপভোগ করতাম। এই বৈঠকের আরেকজনের কথা বলি নি। তিনি স্বর্গকমল ভট্টাচার্য। তিনি একদিন আমাকে প্রচণ্ড অনুরোধের চাপ দিলেন। আমাকেও নাকি লিখতে হবে। শেষমেষ লিখে ফেললাম। দুটি গল্প : 'প্রযাত্রিক' ও 'ফসিল'। এক রবিবারে আমার পড়া শেষ হলে ওঁরা সকলে আমাকে প্রভূত অভিনন্দন জানালেন। সত্যি, আমি যে ওঁদের খুশী করতে পারব

[illegible] সে ধারণা ছিল না।

— আপনার দ্বিতীয় প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল।

— হ্যাঁ, সেদিক থেকে প্রথম সৌভাগ্যবান

— এই গল্প দুটির আগে আপনি কি কিছু লিখেছিলেন?

— স্কুলেডিয়ান মনস্তত্ত্ব বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার রবি-বাসরীয়তে।

— আপনার উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' এক-সময় বাংলাসাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। খ্যাতির সঙ্গে বিরোধী সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে কিছু বলুন। এর পরে কি এমন বিতর্কিত উপন্যাস আর লিখেছিলেন?

— সাহিত্যের প্রয়োজনে নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনে 'তিলাঞ্জলি' লিখেছিলাম। এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে যে সমালোচনা মুখরিত হয়েছিল সেটা ছিল একশ্রেণীর রাজনৈতিক অভিমতের ও মতবাদের বিশ্লেষণ। কোনো বিরুদ্ধ মন্তব্য আমাকে বিদ্ধ করেনি। রাজনৈতিক দলের ক্রিয়া-কলাপ অবলম্বনে কোনো উপন্যাস আর লিখি নি। তবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং জনসাধারণের ত্যাগ ও শৌর্যের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখেছি। যেমন, 'একটি নমস্কারে'।

— আপনার 'ভারত প্রেমকথা' আর লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছে। এখনো গল্পটির বিক্রি তেমনি অব্যাহত। এর আগেপরে মহাভারতের প্রেম-কাহিনী আশ্রয় করে অনেকে লিখেছেন, কিন্তু কেউই আপনার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি। আপনার এই বিপুল জনপ্রিয়তার রহস্যটুকু কি?

— 'ভারত প্রেমকথা'র বৈশিষ্ট্য : প্রেম ও প্রণয়ের নিখুঁত রূপের ও অতুল বৈচিত্র্যের উন্মোচন। প্রেম-কাহিনীর আবেদনকে হয়তো সার্থক-ভাবে রূপায়ণ করা গেছে ক্ল্যাসিকাল বাঙ্ময় রেখে রূপসৃষ্ট ভাষায়। অনেকসময় শব্দার্থ না বুঝলেও সহৃদয় পাঠকের কাছে ভাবার্থক পরিচয় পৌঁছে গেছে। এইসব মহা-ভারতীয় প্রেমকাহিনী বড় প্রবলভাবে পাঠকের অনুভবে সঞ্চারিত হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

— 'ভারত প্রেমকথা' কেন লিখতে ইচ্ছে হল?

— মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য থেকে প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পাই। কিন্তু ভেবেছি গল্পে লিখব ক্লাসিক সুষমা অক্ষত রেখে।

— 'ভারত প্রেমকথা'র বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় নি?

— অনেকে সমালোচনা করেছেন যে সামনে পাঁচটা অভিধান রেখে শব্দ বেছে লিখলেই ভাষা সুন্দর হয় না। কিন্তু সাদর (সাগরময় ঘোষ) জানে যে আমি প্রেসে বসেও কয়েকটি কাহিনী লিখেছি। সে যাই হোক, আবার অনেকে বলেছেন অপরিচিত গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহারে কোনো গৌরব নেই। আমি আগেও বলেছি, অনেক শব্দার্থ হয়তো সবার কাছে বোধগম্য নয়। কিন্তু সেই শব্দ রসগ্রহণের অন্তরায় বলে আমি মনে করি না।

— আপনার 'কিংবদন্তীর দেশে' একটি অনন্য গ্রন্থ বলে আমার মনে হয়েছে। এটিও আপনার প্রভূত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং মেধাবী মনস্কতার উজ্জ্বল ফসল বলে আমার মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

— এটাকে Research-cum-creative writing বলা যায়। খানিকটা সৃজনশীলতার সঙ্গে খানিকটা গবেষণা মিশিয়ে উপভোগ্য কাহিনী বোনা হয়েছে। আমা ঐতিহাসিক কাহিনী-গুলি এখানে বাণীমূর্তি পেয়েছে। ...কানাড়া, মালয়ালাম, তামিল প্রভৃতি সাহিত্যেও আমার পরে কয়েকজন এই ধরণের কাজ করেছেন। সেখানকার সাহিত্যিকরা আমাকে পরে তা জানিয়েওছেন।

— আপনার 'জতুগৃহ', 'সুজাতা', 'অবান্তিক', 'বর্ণালী', 'প্রিয়াম্মা' প্রভৃতি কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। মহৎ সাহিত্যিকের রচনার চলচ্চিত্রায়ণ কঠিন নয় কি? যাঁরা আপনার কাহিনীর চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন তাঁরা কি মূলানুগ রূপায়ণে সক্ষম হয়েছিলেন? আপনার কাহিনীর অনুসরণে যে সমস্ত ছায়াছবি হয়েছে তার মধ্যে কোনটি আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?

— চলচ্চিত্রে আমার লেখা বিভিন্ন কাহিনীর যে রূপের প্রকাশ দেখেছি সেটা সুখকর নয়, তৃপ্তিপ্রদও নয়। বেশির ভাগ কাহিনীর চলচ্চিত্রিত রূপ দেখে দুঃখ বোধ করতে হয়েছে। তবে এরই মধ্যে 'সুজাতা' ও 'শিউলি-বাড়ি' আমার কাছে অনেকটা সন্তোষ-জনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

— আপনি কেন উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে সর্বাধিক খুশী হয়েছিলেন?

— কোনো বিশেষ একটি গল্প বা উপন্যাসকে সবার চেয়ে ভালো বলে ধারণা করতে পারিনি। কোনো একটিকে নিয়ে সর্বাধিক খুশী হওয়া সম্ভব হয় নি।

— আপনার তো বিস্মৃত-বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একটি আত্মকথা যদি লিখতেন...

— 'দেশ' পত্রিকার ১৩৮২ সালের সাহিত্যসংখ্যায় একটি ভূমিকা গোছের লিখেছি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথার হাত দিতে পারি নি। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে আমার এ ইচ্ছের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শরীর ভালো থাকলে লিখব।

— গত দু-তিন বছরের আপনার ছোট-গল্পগুলিতে একটি বিশেষত্ব ধরা পড়ছে। সে সম্পর্কে কিছু বলুন না।

— আমার সাম্প্রতিক গল্পগুলিতে মানবেতর প্রাণী ও মানুষের এক বিচিত্র নিগূঢ় সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। কিপলিং লিখেছিলেন, বন্য প্রাণীর জন্যে বন্য প্রাণীর অনুভবের কথা। আমাদের সাহিত্যেও 'মহেশ' প্রভৃতি গল্পে মানব ও মানবেতর প্রাণীর এক নিবিড় আত্মীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার গল্পগুলি একটু অন্যরকম ও বিচিত্র স্বাদের। যাই হোক, প্রায় ষোল পনেরটা গল্প লেখা হয়ে গেছে। আরো কয়েকটা লেখা হবে। তারপরে একটি বড়ো বই করব। ভবিষ্যৎ। জানিনা কে বের করবেন।

— যদিও আপনি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তবু আপনার সাহিত্যকর্ম 'তথাকথিত' পুরস্কারে তেমন ভূষিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

—আমার সাহিত্যকর্ম কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দ্বারা স্বীকৃত ও সম্মানিত। এটাই যথেষ্ট। আর এই স্বর্ণপদক রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন। তাই আমি বেশ খুশী। ...আর তাছাড়া পুরস্কার নানাভাবে নিষ্পন্ন হয়। জনমনের মতামত তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে, বলা যায় কি?

— হালআমলের বাংলা কবিতা পড়েন?

— দুঃখের বিষয়—হাল আমলের বাংলা কবিতা শুধু নয়, হাল আমলের বাংলা গল্প উপন্যাস সম্বন্ধেও আমার জানাশোনার কোনো প্রতিশ্রুতা নেই। ...এটা আমার highbrow attitude নয়। আমার সবের পড়াশোনা আছে। সময় পাই না তাই।

প্রণাম করলাম আবার। একটি উজ্জ্বল দিন আমার স্মৃতির ঝাঁপিতে মুক্তো হয়ে থাকবে। আমৃত্যু।

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত

শিল্প সংস্কৃতি

পি. এল. টি'র তনক উৎপল দত্ত আজ একটি সর্বভারতীয় নাম। নাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে তাঁর যত খ্যাতি অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি তার চেয়ে কম নয়। যাত্রা, নাটক ও হিন্দী বাংলা সিনেমায় আজ তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা। তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন নাটক লেখেননি বা পরিচালনা করেননি। রহস্য ছিন্ন 'ঘুম' এবং পরীক্ষামূলক ছবি 'ঘুম ভাঙার গান' রীতিমত রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়েছিল। তাঁর নাটকগুলি বুর্জোয়া সমাজ, শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখা। বুর্জোয়া শাসকদের তিনি নানা নাটকে নানাভাবে তুলে ধরে তাদের মুখোস খুলে দিয়েছেন। পি, এল, টি'র নাটক একটি যুগ, নাটকের জগতে একটি ইতিহাস।

উৎপল দত্তের সাম্প্রতিক নাটক দুঃস্বপ্নের নগরী, তিতুমীর এবং এবার রাজার পালা কলকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং হচ্ছে। হাজার হাজার দর্শক বিস্মিত বিহ্বল হয়ে ভেবেছে এত বাস্তবভাবে নাটক দেখানো সম্ভব? দুঃস্বপ্নের নগরী সম্পর্কে বলা যায়, এ নাটক দেখতে দেখতে দর্শকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, কলকাতার শাসক (বিদেশ) ও শোষক সম্পর্কে ঘৃণা জেগে ওঠে। কলকাতা কার? এক শ্রেণীর শোষক ও দুঃশ্চরিত্র ব্যবসায়ীর, ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক নেতার, সমাজবিরোধী ও মস্তানদের। কলকাতার উজ্জ্বলতার টীকা কোথায় যায়, কলকাতার কেন উন্নতি হচ্ছে না, কলকাতায় কেন এত সমাজবিরোধী, কেন এত সমস্যা দৃশ্যে দৃশ্যে উৎপল দত্ত তা দেখিয়েছেন, চোখে আঙুল দিয়ে সজাগ করে দিয়েছেন।

পি.এল.টি'র নাটক

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু সোচ্চার হলেও এ নাটক সকলকে ভাবায়, সচকিত করে কলকাতার জন্য সমবাথী করে। কারণ কলকাতা সকলের। এমন সব পেয়েছির দেশ আর কোথায় আছে?

'এবার রাজার পালা' আরও সার্থক নাটক। রাজনীতির নাট্যমঞ্চের কোন এক নায়ককে কেন্দ্র করে এ নাটক। নাটকের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি। তবে নাটকত্ব বর্জিত নয়। আমার মনে হয় উৎপল দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক এইটিই। রাজার অবৈধ সন্তান সিংহাসনে বসেছে। ঘামঝেয়ালীর জন্ত নেই। প্রজাদের দুঃখ দারিদ্র্যের দিকে তাকানোর সময় নেই। বাহাদুর দরকার কাজে হাত দিয়ে পাদলামি করে। ব্যবসায়ীর কারবার চলে, হাতের পুতুল হয়ে যায়। বিদ্রোহী আসরিকদের নানাভাবে শাস্তি দেয়। নানাভাবে শাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অন্যায়ের পর অন্যায় করে যায়।

ইংরেজ রাজত্বের সময়কাল ধরলেও নাটকটি আজকে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, আদালতের উপর হস্তক্ষেপ, পুলিশী অত্যাচার, গণ আন্দোলন দমন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে রাজার সমাজিক পরাজয় ও লাঞ্ছনা এবং বিদ্রোহীদের স্বতঃস্ফূর্ত জয়। নাটকটির আয়তন খুব ছোট্ট। তবে কোথাও কোথাও দীর্ঘায়িত। তাঁর প্রতিটি নাটকে একটি 'বাঙাল' চরিত্র কেন? কিন্তু কিন্তু সন্যাং ভাষা কেন? পোশাকআশাকে বিসদৃশ কেন? রাজবাড়ীর দৃশ্য সত্যি প্রশংসনীয়।

'তিতুমীর' উৎপল দত্তের নতুন নাটক। একসময় 'বাঁশের কেল্লা' নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নাটকটিতে প্রথম কৃষক বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানায় কৃষক নেতা তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ হয়—ইতিহাস একথা বলে। কিন্তু উৎপল দত্তের নাটকের বক্তব্য অন্যত্র গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন প্রস্তুতি না নিয়ে বন্দুক কামানের বিরুদ্ধে লাঠি দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিতুমীর ভুল করেছেন। নিজেও মরেছেন, বহু কৃষককেও মরতে বাধ্য করেছেন। এ নাটকে পরিচালক ইংরেজ শাসকদের চরিত্র এবং স্বদেশী বণিক ও বিশ্বাসঘাতকদের চরিত্র খুবই বাস্তবসম্মতভাবে এঁকেছেন। উৎপল দত্তের এ নাটকটি রাজনৈতিক বক্তব্য সোচ্চার নয়, বরং সর্বশ্রেণীর দর্শকের জন্য একটি আদর্শ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার নাটক।

প্রতিটি নাটকে পি. এল. টি'র শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। উৎপল দত্তের অভিনয় অতুলনীয়। তাঁর বাচনভঙ্গী, চাটা চলা মুখমণ্ডল রীতিমত মর্মস্পর্শী। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভা সেন সমানভাবে পাল্লা দিয়ে গেছেন। উৎপলবাবুর নির্দেশনা ওঁদের অভিনয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। মৃণাল ঘোষ, সমীর মজুমদার, শ্যামল ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা মজুমদার, মুকুল ঘোষ ও কল্যাণী রায়ের অভিনয় উজ্জ্বল। আলো, দৃশ্যসজ্জা, মিউজিক এক কথায় সুন্দর। পি, এল, টি-র নাটকের বড় কথা বক্স অফিস। প্রতিটি শোতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়, বহু লোক ফিরে যায়।

সত্যানন্দ গুহ

তিতুমীর নাটকের একটি দৃশ্যে সমীর মজুমদার, উৎপল দত্ত, মৃণাল ঘোষসহ অন্যান্য শিল্পী

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় কিছুক্ষণ

আমন্ত্রণটা এসেছিল বলতে গেলে তমলুক রাজবাড়ী থেকেই। আর বেড়াবার নামে তো পা বাড়িয়েই আছি। হাতে মাত্র একদিনের ছুটি। তাই সই। রওনা হলাম দলবেঁধে তমলুক। আর গিয়ে সত্যিই রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণের রাজবাড়ীতে রাজার হালে থাকা। রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কবিবাবু জানালেন সেখানে কায়েই সম্প্রতি একটা মিউজিয়াম হয়েছে। অতএব চললাম সেখানে।

একদিকে বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত ছিল এক সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যনগরী। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে বন্দর-নগর তাম্রলিপ্তের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছিল। ৭ম শতাব্দীর পারসিক সাহিত্যিক দণ্ডীর দশকুমার চরিতে এর সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে। যে তাম্রলিপ্তের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই তমলুক অবস্থিত তার সীমা পশ্চিমে ওড়িশা ও তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গল, পূর্বে আদি গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে প্রায় বর্ধমান ও কালনা অবধি তা বিস্তৃত ছিল। এই তাম্রলিপ্তেই এসেছিলেন চীন দেশ থেকে হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত পরিব্রাজকেরা। এই ঐতিহাসিক বন্দরটির প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শনগুলি সংগ্রহ ও সুরক্ষণের এবং অতীত ও বর্তমান তমলুকের মানান বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র"। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর। অল্পদিনের মধ্যেই বহু মূল্যবান দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে এখানে।

আমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে একটু রাত হয়ে যাওয়ায় মিউজিয়ামটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবিবাবু কায়েই এক পানের দোকানে গিয়ে তার মালিক শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র প্রধানকে বলায় তিনি চাবি নিয়ে ছুটে এলেন। পরক্ষণ খুলতে খুলতেই বললেন তিনি এবং তাঁর দুই সাথী শ্রী আশুতোষ মাইতি ও শ্রী প্রসাদকুমার মণ্ডল কিভাবে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে খৃষ্টপূর্বযুগ থেকে বর্তমানে সময় পর্যন্ত এমন বহু জিনিস সংগ্রহ করেছেন যা দিয়ে তমলুকের এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব।

তাঁদের সর্বপ্রথম বৃহৎ সংগ্রহ হল শ্রীমতী তরুলতা ভট্টাচার্য নামে এক মহিলা বৃদ্ধার কাছ থেকে পাওয়া ৫০ খানি মূল্যবান পুঁথি। জোগাড়ও খুব বেশী নয়। দুটি মাত্র আলমারী সাইজের ঘর। তার মধ্যেই মহাভারত সম্ভব মিউজিয়ামের কারসাজিতেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বেশ কিছু জিনিস, যেমন, অসংখ্য পুঁথি, হারপুন, হাতের কুঠার, তাম্রকুঠার, বঁড়শি, শলাকা, পোড়া মাটির মূর্তি, প্রসাধনী সামগ্রী, বিভিন্ন মুদ্রা, অসংখ্য মৃৎপাত্র ইত্যাদি।

কিছু কিছু মৃৎপাত্রের আকার, বর্ণ-চিত্রণ ও নির্মাণপদ্ধতি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেগুলি খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দকে নির্মিত এবং এই কারণেই সেই অন্ধকারময় যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলি খুবই মূল্যবান। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দকের পাদানি ও দীর্ঘ গলদেশযুক্ত এক রকম বর্তুলাকার মাটির পাত্র এই সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

বালা-বড়শি, খাঁড়ি ইত্যাদি তামার জিনিসগুলি দেখে সত্যিই মনে হয় যে, ওখানে ১৫০০-২০০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দে তাম্রসভ্যতার প্রচলন ছিল এবং ওখানকার নাম তাম্রলিপ্ত হবার পেছনেও এর সম্পর্ক থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। খুবই প্রাচীন সব মুদ্রাগুলি দেখে বড় বিস্ময় জাগে। সংগ্রহশালার সযত্নে রক্ষিত আছে কষ্টিপাথর খোদাই করা প্রাচৈতিহাসিক অধ্যায়ের উন্নতমানের সূক্ষ্ম কারিগরী দক্ষতার পরিচয় বহনকারী ছোট ছোট সীল।

এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আকর্ষণ প্রত্নবস্তু হলেও একে এর উদ্যোক্তারা একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। সেইজন্যই মেদিনীপুরের শিল্পকলা, বড়ি, পুঁথি, পট, পুতুল এ সবই সংগ্রহ করে চলেছেন এঁরা।

পরিমল চক্রবর্তী

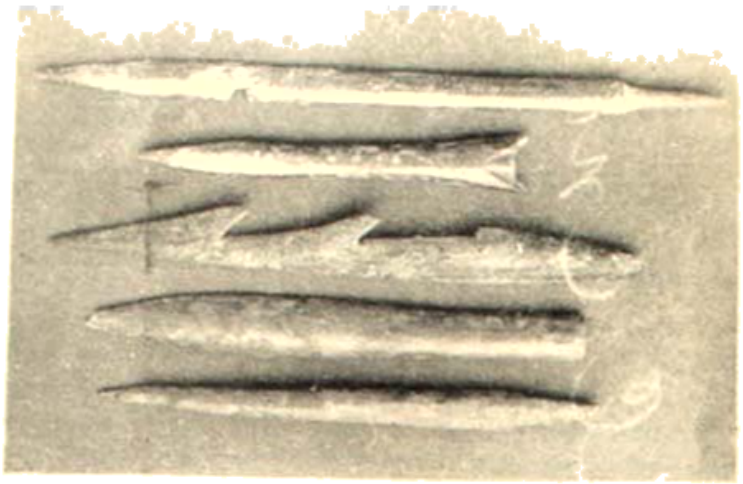

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দকের পাদানি ও দীর্ঘ গলদেশযুক্ত বর্তুলাকার দুটি মাটির পাত্র

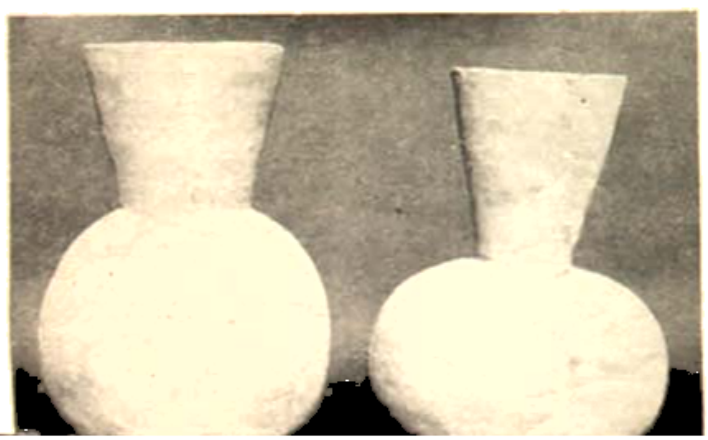

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার কল্যাণ পক্ষ

গত মাসের শেষাশেষি পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ উদ্‌যাপিত হল। সারা ভারতে এই পক্ষ পালন করা হয়েছে অক্টোবর মাসের ১৬ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু যখন পশ্চিমবঙ্গে এই পক্ষ উদ্‌যাপন একমাস পিছিয়ে দিতে হয়েছিল।

১৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষের উদ্বোধন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য বলেন, দেশের জনসাধারণের মধ্যে সীমিত পরিবারের আদর্শকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এই কাজে সফল হতে হলে পরিবার কল্যাণমূলক জনশিক্ষা কর্মসূচীর ব্যাপক আয়োজন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক কর্মসূচী। জনসাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যদি এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন তবেই এই প্রকল্প সার্থক হবে। জনমনে এই আগ্রহ সৃষ্টির কাজে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নে আমরা বেশী দূর এগোতে পারিনি। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যে বিপর্যয় ঘটিয়ে গেল তাতে আমাদের সমস্যা আরো অনেক বেড়ে গেল। তথাপি সরকার পরিবার পরিকল্পনার কাজ গতি বন্ধ না হলেও আগামী দিনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেন, ভারতে জনসমষ্টির জন্যই সে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে এই মতবাদে তিনি বিশ্বাস করেন না। সত্তর শতাংশ লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন। এর কারণ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা অনেক আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল তা হাতে নেওয়া হয়নি। আমরা যদি আগে থেকেই আমাদের জমিতে একাধিক ফসল ফলাতে পারতাম, আমাদের ঘুমন্ত কৃষির শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতাম তবে আরো বেশী জনসংখ্যার জন্য আমরা পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারতাম। তবু, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার পরিবার পরিকল্পনার সমর্থন করেন। দেশের বিরাট সংখ্যক লোকের দারিদ্র্য লাঘবের জন্য আর ব্যবস্থার প্রয়োজন। এখানেই পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও ছোট পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তবে এই আদর্শ জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তাঁরা স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। জোর-জুলুমের মাধ্যমে যে কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নে বিগত সরকার যে জুলুমের পথ অনুসরণ করেছিলেন তা সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষ কিছুদিনের মধ্যে বিদ্রোহ করেছে। বস্তুত তাই হয়েছে। জনগণের মনে বিশেষত উত্তর ভারতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের মন থেকে এ ভয় দূর করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী সার্থক করতে হলে জনগণের মান উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে হবে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজ সহজতর হবে। তবে শিক্ষার প্রসার সময়সাপেক্ষ। তাই আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। নিরক্ষর ব্যক্তিরও সাধারণ জ্ঞান আছে এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আমাদের আবেদন করতে হবে। কিন্তু কিছু সরকারী পোষ্টার প্রথম থেকার ভাষণের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির দুয়ারে পৌঁছতে পারব না। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সংগঠনের একনিষ্ঠ সহযোগিতা। আমাদের অনেক গণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, রাজনৈতিক দল রয়েছে, কৃষক সংস্থা রয়েছে এবং শ্রমিক সংস্থাও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে গ্রামে গ্রামে নির্বাচিত পঞ্চায়েত। এদের সবাইকে সীমিত পরিবারের বাণী সকলের দুয়ারে পৌঁছে দেবার কাজে অংশীদার করে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সমি ভেষ্টী তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, গত দু'বছরে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নে প্রগতি খুব সামান্যই হয়েছে। আমরা যদি আমাদের এ কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে না পারি তবে শীঘ্রই আমরা বিপদের সম্মুখীন হব এবং তার জন্য আমাদের সন্তানসন্ততিরা আমাদের ক্ষমা করবে না। ডাঃ ভেষ্টী বলেন, সীমিত পরিবারের বাণী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে এখনি আমাদের আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে এই কর্মসূচী রূপায়নে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ধান কুড়ানি

৯৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

তারা ডেকে বলল—একটু দাঁড়াও না মাস্টার, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

তারার অশ্রুস্নাত এই অনুরোধটা মোটেই খারাপ লাগল না তরুণের। গাঁয়ের এক ধান কুড়ানী মেয়ে তারা। সে রূপসীও নয়, কালো, রোগা তার উপর অগোছালো তার সাজগোজ। তবু পৌষের এই ধূসর সন্ধ্যায় তার বয়স আর তার কালো ভাবা ভাবা চোখের বোবা ভাষা যেন কাঠের পুতুলের মত তরুণকে সেখানে দাঁড়িয়ে রাখল।

DHANADHANYE
Price 50 paise

YOJANA
Bengali

Regd. No. wa cc-315
December 1 - 15, 1979

প্রাঙ্গণ

ভারত-পাকিস্তান চলতি ক্রিকেট সিরিজ শেষ হল পাকিস্তানের জয়ে। পাকিস্তান জিতেছে দুটি খেলায় লাহোরে এবং করাচীতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে। অন্য তিনটি খেলা—প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। ফলে, ১৯৫২ সালের পর প্রথমবার ভারত যে রাবার জয় করেছিল তা পাকিস্তান ২৬ বছর পর ছিনিয়ে নিল। ৫২ সালের সিরিজে ৫টি খেলার দুটিতে ভারত জিতেছিল, ১টিতে পাকিস্তান আর বাকি ২টি খেলা ড্র।

করাচীতে তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তান দেখিয়ে দিয়েছে নিখুঁত উইকেটেও কি করে খেলাকে প্রাণবন্ত করা যায়, দেখিয়ে দিয়েছে তরুণ কতটা চমকপ্রদ হতে পারে। খেলার পঞ্চম ও শেষ দিনে পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা শুরু করলো এমন একটা অবস্থায় যখন তাদের জিততে হলে করতে হবে ১৬৪ রান। সুমোদ বলতে ৩৫ মিনিট সময় আর হাতে ২০টি যাথাতামূলক ওভার। ৩৫ মিনিটে ওরা ২৫ রান তুললো। বাকি ১৫৮টি রান করবার জন্য ওদের হাতে রইলো ন্যূনতম ৪টি ওভার-রেট। অর্থাৎ অন্তত প্রতি ওভারে ওদের করতে হবে প্রায় ৭টি করে রান। ক্রিকেটে কোন কিছুই অসম্ভব নয় এইটুকুই ছিল ওদের ভরসা। এই ভরসা ও লিমিটেড ওভারের খেলার ওদের অভিজ্ঞতাকে [illegible] পাকিস্তান ২[illegible] জন্য প্রয়োজনীয় স্থান [illegible] ৯ ওভার বাকি [illegible] খেলায় ভারত অনিবার্য জয়কে এভাবার অবস্থায় পৌঁছেছিল ৬ উইকেটে ১৭৩ রানকে ৩০০ রানে পৌঁছে দিয়ে কপিলদেব আর ঘাউরীর দৃঢ়তায়। কপিলদেবের সংগ্রহ ৬৪ এবং ঘাউরীর ৫৩ রান।

কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বোলীর ব্যর্থতায় ভারতকে এ খেলাটি হারতে হল। খেলা শেষ হতে তখন ৫ ওভার বাকি আর ঐ ৫ ওভারে পাকিস্তানকে করতে হবে ৩৮ রান। এই মুহূর্তে ইনিংসে ২ বার সেঞ্চুরী করার গৌরব যুদ্ধিষ্ঠিরের যে ক'জন অর্জন করেছেন পাকাসকার তাঁদের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। পাকাসকার এই সিরিজে ৩টি সেঞ্চুরী সহ মোট ৫৬৪ রান করেছেন। ৪০টি টেস্টে তাঁর মোট সংগ্রহ ৩ হাজার ৬শো ৭৪। এই সিরিজে পাকিস্তানের পক্ষে তাহির আব্বাস একটি তবল সেঞ্চুরী সহ ২টি সেঞ্চুরী করেছেন (২৫৫ ১৭৬)। জহিরুল মিয়াদাদ ২টি (১৫৪ ১০০), আর আসিফ ইকবাল করেছেন ১টি (১০৪)

ছাব্বিশ বছর পরে ভারত পাকিস্তানের কাছে হারল

দরকার ছিল রান আটকানো নাদকার্নীর। কিন্তু বেদী নাদকার্নী নন। হয়তো উইকেট পাবার লোভে তিনি ইমরানকে দিতে লাগলেন ফ্লাইটেড বল। ইমরান সে ওভারে ২টি ওভারবাউণ্ডারী ও একটি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ১৭ রান তুলে নিলেন। বেদীর এই ওভারটি ভারতের খেলা শেষ করে দিল। আর ক্ষেত্রার খেলা যে কেমন তা দেখিয়ে দিল পাকিস্তান।

মেরুদণ্ডহীন দল যে খেলা জিততে পারে না তা আরও একবার প্রমাণ করলো এই খেলাটি। ভারত প্রথম ইনিংসে করেছিল ৩৪৪ রান। এরমধ্যে প্রথম ২টি উইকেটের দান ১৩১ রান। বাকি ৮টি উইকেট করেছে ২১৩ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করেছে ৪০০ রান। এক্ষেত্রে প্রথম ২টি উইকেটে রান উঠেছে ১২২, কিন্তু পরবর্তী ৪টি উইকেট গুড়ো হয়ে গেল মাত্র ৫১ রানে। অথচ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখছি ৫ উইকেটে ১৮৭ রান থেকে ওদের ইনিংস পৌঁছে গেছে ৯ উইকেটে ৪৮১ তে।

এ টেস্টে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সুনীল গাভাসকরের। তিনি প্রথম ইনিংসে করেছেন ১১১ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রান। একই টেস্টে উভয় সেঞ্চুরী। ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন গাভাসকার ছাড়া তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ, ১৪৫ রান।

গ্রাঁ-প্রী টেনিস

ইডেনে নজীর বিহীন সেমি-ফাইনালের পূর্বাভাস দেবার কদিন পরেই ২৭শে নভেম্বর নেতাজী স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ৫০ হাজার ডলারের কলকাতা গ্রাঁ-প্রী টেনিস প্রতিযোগিতা। ওরা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। এর আগে ২৫ এবং ২৬শে নভেম্বর সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা। দেশ-বিদেশের ৮৩ জন খেলোয়াড় এতে যোগ দিয়েছেন, তারমধ্যে ৩২ জনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূল প্রতিযোগিতা।

এ.টি.পি.র তালিকা অনুযায়ী এই গ্রাঁ-প্রী বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছে। এক নম্বর বাছাই বিজয় জোহনসনের এ.টি.পি.র তালিকায় ৩৮তম স্থান ছিল। তিনি আসেননি। এর পরেই আছেন বিজয় অমৃতরাজ। বাছাই তালিকার প্রথম ২৩ জন সরাসরি প্রতিযোগিতায় খেলবেন। ২৩ জনের মধ্যে ভারতের বিজয় ছাড়া আনন্দ অমৃতরাজ এবং শশী মেননের নাম আছে।

প্রণবেশ সেন

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত যোজনার বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী, অসমীয়া, গুজরাতী, মালয়ালম, মারাঠী, তামিল এবং তেলেগু সংস্করণের প্রধান সম্পাদক—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
বাংলা সংস্করণ 'ধনধান্যে'র সম্পাদক—দিলিপকুমার রায়, সহকারী সম্পাদক—বীরেন সাহা, উপ-সম্পাদক—ত্রিপদ চক্রবর্তী।
এস. কে. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—৭০০০৬৭ কর্তৃক মুদ্রিত।

কৃষিকল্যাণ

১-১৫ মার্চ ১৯৭৯

চিঠি

প্রচার বুদ্ধির বাহুল্য চাই

গত ১৬-৩০ নভেম্বর (১৯৭৮ সংখ্যা) বই বাজারেই 'বনবাসন্তী'র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আর প্রথম পরিচয়েই আমি মুগ্ধ ও মুগ্ধ। সুন্দর পুস্তা, সুন্দর মুদ্রণ, সুন্দর প্রচ্ছদপট আর সুন্দর সম্পাদনা স্বরূপ পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগের নামগুলি উচ্চ মূল্যায়ন দেবার দাবি রাখে।

উদ্বিদ্ধ সাধারণ মুগ্ধ করল 'আবাদন চিন্তা' বনাম পরে' এবং সম্পাদকীয়তে 'জাতীয় স্তরে শিক্ষা কমসূচী' বিষয়ে ভাল লেখাগুলি। লেখাগুলির সঙ্গে 'ঝাকি'-তে কিছু নতুন থাকলেও ঠিক ওঠিয়ে নেওয়া হয়নি। 'আমন ওপার কড়তা' বিভাগে সংগ্রামপুর হাইস্কুলের 'সাগরদীপের সওয়ারী' মুলিখিত।

পরিশেষে বলি, এত সুন্দর একটি পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করুন না। 'বনবাসন্তী' হবে পাঠকের উপকারে আসবে---এ-বিশ্বাস আমার আছে।

পুলক সেনগুপ্ত

বিদ্যাসাগরী, ইছাপুর-৭৪৩১৪৪, ২৪-পরগণা।

গ্রামের বরাদ্দ বাড়ুক

বনবাসন্তী মারফৎ গ্রামবাংলার চাষীবাসী মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। পরিচয় আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে আত্মীয়তায় পরিণত হয়ে উঠতে কিছু সময় লাগবে বইকি। গ্রামীণ সার্বিক উন্নয়নের খবরাখবর প্রকাশের আরও সুযোগ না দিলে এ আত্মীয়তা গড়ে উঠতে বিলম্ব হবে। শুধু এক পাতার খেত খামারের খুঁটি-নাটিকায় 'নৈব নৈব চ'। অবশ্য গ্রাম বাংলার কড়চায় খুবই জনপ্রিয়তার পথে।

তাই বলি, গ্রামীণ অভ্যুদয়ের জন্য প্রশাসনের বরাদ্দ একটু বাড়িয়ে দেওয়া হোক। গ্রাম গঠনের বাস্তব আজ পরিবেশিত হোক। পরিবেশিত হোক কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা বিভাগ খুলবে বনবাসন্তী অধিকতর জনপ্রিয় হবে বলে আমার ধারণা। তাছাড়া গ্রামীণ অনুষ্ঠান ও মেলার খবর প্রকাশ করা হোক না কেন? তাহলেই পত্রিকাটি হাতে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে।

জানুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষে প্রকাশিত বনবাসন্তী আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে শ্রীবিবেক চালদারের তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধটি একটি নতুন পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সম্বন্ধে কোন পত্র-পত্রিকায় এরূপ বিস্তৃত আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। তবে বিবেচনাধীন সংখ্যাটি আমি আরও কিছু তথ্যের আশা করে-ছিলাম। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রমিকের সংখ্যা কত, কত শিশু ফুটপাতে বাস করে এবং সুযোগ থাকলেও কত শিশু স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না ---এগুলি পত্রোত্তরে জানানোর জন্য অনুরোধ জানাই বিবেচনাধীনকে। প্রবন্ধে কুমারী মাকেরের পরিত্রাণ অবশ্যই শিশুদের কোন উচ্চেশ্য নেই--উচ্চেশ্য হবে ধরিত্রীর তপস্বিনী মা হিসেবে সেবা তপস্যার পবিত্র কাহিনী। বিবেচনাধীন পাঠকদের এভাবে বঞ্চিত করলেন কেন?

দিগিরকুমার চক্রবর্তী

গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
চুঁচুড়া আর এস, হুগলী

বাজেট সংখ্যা

গ্রাহকদের কাছ এবারও বনবাসন্তীর আগামী সংখ্যা বাজেট সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এই বিশেষ সংখ্যাটি ১৬-৩১ মার্চ ও ১-১৫ এপ্রিল—এ দুটি তারিখের মধ্যবর্তীকালে হবে। কেন্দ্রীয় রাজ্য ও জেলা স্তরের বিভিন্ন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এ সংখ্যার আলোচনা করবেন। লেখক হবেন ডঃ অতীশ দত্ত, অধ্যাপক বরীন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ সুব্রত গুপ্ত, ডঃ মঞ্জুলা বসু, অধ্যাপক ধনঞ্জয় রায়, শ্রীনিরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং উপরোক্তদের অনুযোগাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে লিখছেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুবিমল সেনগুপ্ত এবং ডঃ সোমনাথ রায়চৌধুরী।

এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম হবে ১ টাকা।

বনবাসন্তী ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে বেরোয়। পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার

এককপি ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৭ টাকা এবং বার্ষিক ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম বা মনিঅর্ডারে প্রদেয় করা হয়।

যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন, শিলান্যাসপত্র, শিলক ও গ্রন্থের সাহায্যমূল্যের উপর ১০ শতাংশ কমিশন দেওয়া হয়। বনবাসন্তীর সঙ্গে গ্রাহক বাড়ান সংক্রান্ত প্রকাশ বিভাগ প্রকাশিত বই কিনলে ১০ শতাংশ ছাড় পাবেন।

এজেন্সী

বনবাসন্তীর এজেন্টদের উদ্যোগে কমিশন দেওয়া হয়। প্রকাশন বিভাগের এজেন্টরা বিশেষ কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞাপনের হার

সাদা সূচী ৩০০ টাকা, আধ পৃষ্ঠা ১৭৫ টাকা, সোয়েনের জন্য ৪৫০ টাকা, দ্বিরঙীন জন্য ৪০০ টাকা এবং বহুরঙীন জন্য ১৭৫ টাকা।

যাবতীয় পত্র বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা

সম্পাদক,
বনবাসন্তী,
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা—৭০০০৬৯
ফোন : ২২-৬৫৭৬

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

কলকাতা ১৬—১ মার্চ, ১৩৮৫
১—১৫ ফাল্গুন ১৯৭৯
বর্ষ ১ । সংখ্যা ১০

এই সংখ্যায়

সবুজবেষ্টনী অরণ্যসৃজনে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদানের নীতি ১
অনাবৃত শিলার ওপরে বনসৃজন ডঃ প্রীতা সেন ৪
রাঁধুনীদের কথা অমিয়কুমার বসুরায় ৬
আলোকিত বস্তী : উৎপাদন না উপভোগ? সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ ঘোষ ৯
গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টি ও সিঞ্চনের ব্যবস্থার মোশারফ হোসেনলস্কর ১১
চলচ্চিত্র আলোচনা ১৫
খেলা ফুটল না যারা রাধা ব্যানার্জী ১৩
ছবি আঁকার কথা মালিকা চক্রবর্তী ১৫
খেতমজুর আন্দোলনের অগ্রগতি ১৬
মহিলা মহল সুলতা চৌধুরী ১৯
বন্ধ অর্থনীতির দিগন্তের সন্ধানে ১৭
বাজার ১৮
শিল্প সংস্কৃতি সুব্রত মিত্র ১৯
তখন আর ২০
সরকারের খবর ২০
খবরের সন্ধানে ২১
চলচ্চিত্র
চলচ্চিত্রে মেলা ২২

চলচ্চিত্রকলী—সুবর্ণা চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

উৎপাদন তথা বণ্টন প্রকল্প

দেশ জুড়ে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বণ্টন করবার সরকারী উদ্যোগ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গত নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত যে উৎপাদন তথা বণ্টন প্রকল্পের রূপরেখা অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া লোকসভায় পেশ করেছিলেন সেই প্রকল্প সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করল নবম্বর্ষের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত রাজ্য মুখ্যসচিবদের বৈঠকে। পয়লা জুলাই থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই প্রকল্পের তাৎপর্য অপরিসীম। দরিদ্রতমের জীবনধারণের মান উন্নত করবার যে অঙ্গীকার নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস হয়েছে তার সার্থক রূপায়ণের একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হল অত্যাবশ্যক পণ্য তাদের জন্য সুলভ মূল্যে সহজলভ্য করা। অসামরিক ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সুনিশ্চিত ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ পণ্যের মূল্যস্তরে যে স্থিতিশীলতা এনে দেবে তার ফলে দেশে একটি গতিশীল অর্থনীতি গড়ে উঠবে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিও অব্যাহত থাকবে।

এই উৎপাদন তথা বণ্টন প্রকল্প কার্যকর করা যে সহজসাধ্য নয় তা সহজেই অনুমেয়। উৎপাদন, সংগ্রহ, বন্টন, পরিবহণ ও বণ্টন এই পাঁচটি প্রধান ভূমিকা সম্বলিত এই প্রকল্প সর্বত্র চালু করতে হলে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ কোন্ পণ্য এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এই প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল আভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ করেই হোক অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশী উৎপাদনে ঘাটতি মিটিয়েই হোক প্রতিটি পণ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যাতে এইসব পণ্যের সরবরাহ কখনো বিঘ্নিত না হয়। দেশে বর্তমানে যে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান আছে তার সংখ্যা এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে অনুন্নত এলাকা, পার্বত্য এলাকা অথবা দুর্গমস্থানসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলের লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারে। সেই জন্যই মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যেখানে প্রতি দুই হাজার লোকের জন্য একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান থাকবে সেখানে জন-বিরল এলাকায় প্রতি এক হাজার লোকের জন্য একটি করে দোকান খোলা হবে।

নিঃসন্দেহে এই বিরাট কর্মযজ্ঞে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে পণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্ন বিতরণের গুরুভার থাকবে রাজ্য সরকারের উপর। এজন্য হয়তো রাজ্যগুলির অসামরিক সরবরাহ দপ্তর আরও শক্তিশালী করতে হতে পারে।

নতুন নতুন ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার ব্যাপারে সমবায় ও পঞ্চায়েতগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত ন্যায্য-মূল্যের দোকান রয়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত, যদিও তাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিছুটা রয়েছে। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে সেখানে ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত অথবা ক্রেতাসমবায়ের পরিচালনাধীন থাকলে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি স্বভাবতই ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে।

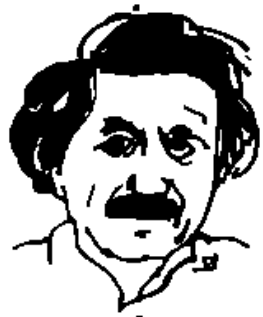

শতবর্ষের আলোকে বিশ্ববিজয়ী আইনস্টাইন

প্রতিবাদটি

পদার্থ বিদ্যার চমকপ্রদ প্রসারের কথাটা যদি বিটাটনের সময় থেকে ধরা যায় তবে বিগত তিন শতাব্দী জুড়ে বিজ্ঞানের কি প্রচণ্ড অগ্রগতিই না হয়েছে। সেই অগ্রগতির বিস্ময়কর রূপ আমরা দেখি আলবার্ট আইনস্টাইনের বিজ্ঞান সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে। আজ আইনস্টাইন নামটি পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রে এক বিস্ময়োদ্দীপন---উজ্জ্বল নিরোনাম। আজ তাঁর জন্ম-শতবর্ষে তাঁর কাজের পূর্ণ মূল্যায়ন করা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁর বহু মূল্যবান কাজের মধ্যে কোনটি ছোট তার মূল্যায়নও কঠিন। তবু কোনো এক সময়ে মূল্যায়নের বাণকাঠিতে তাঁর যে কাজটি সবচেয়ে তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়েছিল এবং তার জন্য অব্যবহিত আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার (১৯২১) সম্মানিত করা হয়েছিল, সেটি হলো আলোক-তড়িৎক্রিয়া বা ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলেইতো রূপালী পর্দার বুকে নির্বাক ছবি সবাক হতে পেরেছে। তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অবশ্য আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটা মেরুদণ্ড।

রূপকথার মতোই আইনস্টাইনের জীবনকথা। তাঁর জীবিতকালেই তিনি একটি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ দক্ষিণ জার্মানির উলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন আইনস্টাইন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার প্রথম এবং একমাত্র পুত্র সন্তান; তাঁর একটি ছোট বোন ছিল। বাবা, কাকা, মা আর তাঁরা দুই ভাই-বোন--এই ছিল আইনস্টাইন পরিবার। এঁরা জাতিতে ইহুদী। তাঁর বাবার ছিল একটি কারখানা; দুই ভাই মিলে সেটি দেখাশুনা করতেন। কাকা জ্যাকব ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। আলবার্টের মা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে জানতেন। ছেলেকে তিনি ছ'বছর বয়স থেকেই বেহালা বাজানো শিখিয়েছিলেন। উত্তরকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের মধ্যে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অন্যতম বলে গণ্য হয়েছিলেন। বেহালা ছিল তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী।

আলবার্টের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর বাবা সপরিবারে ইতালিতে মিলানে চলে আসেন এবং সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। কারখানাটিও মিলানে নিয়ে আসা হয়। এইখানে আলবার্টকে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের একটা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। খুব ছেলেবেলা থেকেই বালক আইনস্টাইনের মনে অনুসন্ধিৎসার ভাবটা প্রবল ছিল। এই অনুসন্ধিৎসাই ছিল এই বিজ্ঞানীর প্রতিভার উৎস। এই সম্পর্কে তাঁর ছোটবেলার একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। তাঁর বয়স যখন মাত্র চার বছর, সেই সময়ে তাঁর কাকা জ্যাকব ভাইপোকে তার জন্মদিনে একটি দিক-নির্ণায়ক কম্পাস যন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। কম্পাসের কাঁটাটির একটি বিশেষ দিক একই অভিমুখে থাকার ব্যাপারটা বালকের মনে জাগিয়ে তুলেছিল কৌতূহল। কম্পাসের কাঁটা এইভাবে থাকে কেন? —ছেলের এই প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলতেন—এইরকম অভিমুখীন হয়ে থাকাটাই এর ধর্ম। তাই আশ্চর্যবোধ হয়েছিল এটা বালকের কাছে। উত্তরকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে বিজ্ঞানী বলতেন: 'সারাজীবন আমি এটির কথা ভুলতে পারিনি। একটু বয়স হলে পরে আমি বুঝেছিলাম যে, বাইরের জগতে কোথাও নিশ্চয় কোনো কিছুর আছে যার জন্য কম্পাসের কাঁটাটি এইরকম আচরণ করে থাকে'।

ম্যাগনেটিক কম্পাস আর ইউক্লিডের জ্যামিতি—এই দুটি জিনিসই আইনস্টাইনকে ছেলেবেলা থেকেই অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল। ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁর মনের মধ্যে এমনভাবে দাগ কেটেছিল যে, উত্তরকালে তিনি এই সুন্দর বস্তুবাটি করেছিলেন: 'যৌবনকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয় না ঘটেছে তার পক্ষে একজন তত্ত্বীয় গবেষক হওয়া অসম্ভব।' জ্যামিতি গ্রন্থের ওকথাটা তিনি গভীরভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। এই বিজ্ঞানী প্রেমের জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার উৎপত্তি বিকাশ ও পরিণতি সবকিছুই যেন জ্যামিতিক ছন্দেই আবর্তিত হয়েছিল। জ্যামিতির মতো সুনিশ্চিত ধ্রুব পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছিল বিজ্ঞানের পথে।

সুইস ফিডারেল পলিটেকনিক স্কুল জুরিখ। সুইজারল্যাণ্ডের এই বিখ্যাত বিদ্যানিকেতনের ছাত্র হয়ে যখন আইনস্টাইন এলেন তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো বছর। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, প্রতিভাব্যঞ্জক দুটি আয়ত চোখ, স্বল্পবাক্ এই ছাত্রটির প্রতি শিক্ষকগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি আর বিস্ময়কর মেধা দেখে। পলিটেকনিকে ভর্তি হয়ে অবধি আইনস্টাইন নিজেকে পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকতেন। এখানে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রধান দুটি ঘটনা হলো: সুইস নাগরিকত্ব লাভ আর মিলেভা মারিকের সঙ্গে পরিচয়। মারিকোভা এই বিদুষী তরুণী ছিলেন তাঁরই সহপাঠিনী। একই টেবিলে তাঁরা দুজনে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করতেন। দুজনের ভাষা আলাদা, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মিলেভা শিখে নিলেন জার্মান ভাষা আর আইনস্টাইন আয়ত্ত করলেন সার্বিয়ার ভাষা। উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গণিতে মিলেভার পারদর্শিতা দেখে আইনস্টাইন তার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন।

১৯০০। পলিটেকনিকে পড়া শেষ হলো। এই বছরেই পিতার মৃত্যুতে আইনস্টাইনকে নিতে হয় সংসারের দায়িত্ব। একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। বেতন সামান্য। সৈন্যুক কারখানাটি তখন তখন অচল। একটা ভালো চাকরি দরকার ভাবলেন তিনি। বছর দুই বাদে তাঁর এক বন্ধুর চেষ্টায় বার্নের পেটেণ্ট অফিসে জুরিখ পলিটেকনিকের মেধীপাষান স্নাতক এবং ভবিষ্যতের মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট

আইনস্টাইন একটা চাকরি পেলেন—ক্লার্কের চাকরি। চাকরি করতেন বটে, কিন্তু তাঁর অবসর সময়টা পত্নীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অতিবাহিত হতো। তখন থেকেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্য আপন মনে চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তার বিষয় ছিল দুটি—গতি (Motion) আর সময় (Time)। একদিন মিলেভাকে বললেন, আমার মনে হয় সমস্ত গতিই আপেক্ষিক (All motion is relative) আর এই যে নিত্য প্রবাহিত সময়ের স্রোত একে একটা কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়। সময় মানে গাণিতিক সময়, পদার্থ নয়, এ সবকিছুই দ্রষ্টার সম্পর্কে সম্পর্কিত। আমি অন্ত কষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি'।

মিলেভা বিস্মিত হন স্বামীর মুখে এই কথা শুনে। তাঁর মনে হলো বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন তত্ত্ব জন্ম নিতে চলেছে। তখন তিনি বিষয়টি একটি প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করলেন। ১৯০৫ সালে বার্লিনের একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ('Annals of Physics') প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের বিজ্ঞানী মহলে যেরকম আলোড়ন দেখা দিয়েছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল বলেই হয়। কেউ কেউ আইনস্টাইনের আপেক্ষবাদকে (Theory of Relativity) বিদ্রূপ আখ্যা দিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে যেসব বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লেখা দিয়েছে, সেসবেরই পরিণতি হিসাবে এসেছে আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতাবাদ। পূর্বতন বিজ্ঞানীদের চিন্তাই তো এই আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিরূপ সমালোচনা হলো অনেক পত্র-পত্রিকায়। লন্ডনের বিখ্যাত 'টাইমস' কাগজে লেখা হলো এই বক্তব্যটি: 'A Patent clerk in Berne has attacked time-honoured theories and put forth new theories of the Universe understood only by a few high priests.'

সমালোচকদের এইরকম বিরূপ বক্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আইনস্টাইন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন: 'কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে কেউ যদি কোনো কিছুর প্রবর্তক হতে চায় তবে তাকে একাকী পথ চলতে হবে'। তবে খ্যাতনামা কয়েকজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে তিনি পেলেন অভিনন্দন আর প্রশংসাসূচক পত্র। জার্কাট বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলিশ অধ্যাপক টাইটকোভি প্রবন্ধটি পাঠ করার পর প্রকাশ্যে বললেন: 'এতকাল বাদে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন কোপার্নিকাসের আবির্ভাব ঘটল।' বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক (ইনিই কোয়ান্টাম-তত্ত্বের উদ্ভাবক ও আইনস্টাইনের পূর্ববর্তী) একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আইনস্টাইনকে অভিনন্দিত করলেন। আর জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স ভন লাউ বার্লিন থেকে বার্নে এসে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন: 'ম্যাক্সওয়েলীয় তত্ত্বাকর্ষিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই শুধু গণিতের সাহায্যে আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যা এতকাল আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।'

কিছুকাল বাদে আর একটি মৌলিক তত্ত্ব উপহার দিলেন তিনি। বললেন: পদার্থ (Mass) ও শক্তি (Energy) এক এবং অভিন্ন। ঘোষণা করলেন: 'Matter is energy and energy is matter.'

তাঁর এই নতুন তত্ত্ব পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে এতদিনকার প্রচলিত ধারণা একেবারে পাল্টে দিল। আইনস্টাইনের এই চিন্তাধারা কলশ্রুতি ছিল তাঁর সেই বিখ্যাত সূত্রটি $E=mc^2$—যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আপেক্ষবাদের কাঠামোটি। পৃথিবীতে পারমাণবিক যুগের সূচনা করে দিয়েছিল তাঁর এই সূত্র যা চূড়ান্তরূপে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। ঐ তারিখে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে মার্কিন সামরিক বিমানবহর থেকে জাপানী শহর হিরোশিমার ওপর একটি অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বোমার বিস্ফোরণের ফলে জাপানী মারা গিয়েছিল; আহত হয় এর দশ গুণ আর পুড়ছাড়া হয় দুই দশমেরও কিছু অধিক। যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ফলে এই বিরাট ধ্বংসকাণ্ড ঘটেছিল তার উৎস ছিল ছাব্বিশ বছর বয়স এক তরুণ পদার্থবিদের উদ্ভাবিত একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

১৯০৯। শুরু হয় আইনস্টাইনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। অধ্যাপনার জীবন। তখন থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা নিয়েই কাটিয়েছেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি অধ্যাপক হয়ে এলেন তখন তিনি দুটি পুত্রের জনক হয়েছেন। জুরিখে থাকতেই তিনি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য। এই ঘটনা ১৯১১ সালের কথা। এখানে এক বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি জুরিখের পলিটেকনিক আকাদেমিতে যোগদান করেন ১৯১২ সালে। ১৯১৪। আমন্ত্রণ এলো বার্লিনের প্রাশিয়ান আকাদেমি অব সায়েন্স ও কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউট থেকে। এই বছরে শুরু হয় য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পরিবর্তিত পরিবেশ বিজ্ঞানীকে টেনে এনেছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে। জার্মান বিজ্ঞানীরা যখন যুদ্ধের অনুকূলে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন তখন একমাত্র আইনস্টাইন সেই ইস্তাহারে তাঁর স্বাক্ষর প্রদান করেন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহকে তিনি চিরকাল অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

১৯২৪। জুন মাস। একদিন বার্লিনে ভারতবর্ষ থেকে একটি চিঠি এলো আইনস্টাইনের হাতে। পত্র প্রেরকের নাম: সত্যেন বোস, রীডার, ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চিঠির সঙ্গে ছিল ছয় পৃষ্ঠার একটি গাণিতিক প্রবন্ধ। আইনস্টাইন আগ্রহের সঙ্গে প্রথমে চিঠিখানি, পরে প্রবন্ধটি পাঠ করে চমৎকৃত হলেন। চিঠির শেষভাগে অধ্যাপক বোস লিখেছিলেন: 'যদি আপনার বিবেচনায় এটি প্রকাশযোগ্য মনে হয় তাহলে আপনি 'অ্যানালস অব ফিজিক্স' পত্রিকায় এর প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যদিও আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এইরকম অনুরোধ জানাতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছি না। কারণ, আমরা সবাই আপনার ছাত্র। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে যে, আমি ও আমার বন্ধু অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দুজনে মিলে আপেক্ষিকতত্ত্বের ইংরেজি অনুবাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছিলাম।'

(● ৮ পৃষ্ঠার দেখুন)

একমাত্র সুস্থ মা-ই পারেন সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে। মায়ের স্বাস্থ্য যদি ভাল না হয় তাহলে সেই মা যখন সন্তানসম্ভবা হবেন, গর্ভের শিশুটির উপর তার প্রভাব আসতে বাধ্য। আর শিশুরাই যখন আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতে সুস্থ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

মায়েদের স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে তাঁর মা হওয়ার আগের অবস্থা থেকে। মা হবার পূর্বাবস্থায় তাঁর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা অপরিহার্য।

শারীরিক সুস্থতার কথায় প্রথমেই আসে পুষ্টির কথা। শারীরিক পুষ্টির জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। সুষম আহারের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল—শরীরে দৈনন্দিন কাজ করার মত শক্তি যোগানো, দেহের দৈনিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা ও রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা। অর্থাৎ যদি খোরাকীর আহারের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনমত শক্তি ও খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান আহরণ করা যায় তাহলেই শরীর সুস্থ ও সবল হবে।

খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন শারীরিক ব্যায়ামেরও। ব্যয়াম ও পরিশ্রমের সঙ্গে সমতা রেখে একটু ব্যায়াম করলে শরীর সুগঠিত হয়। রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালনীয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সুস্থ পরিবেশে বসবাস করলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষত মেয়েদের রোগের হাত থেকে দূরে থাকার জন্য নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

সংক্রামক রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে নিবারণ করা। এইসব রোগ নিবারণের জন্য আছে নানা প্রকার টীকা। বসন্তরোগ যদিও আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করা হয়েছে তথাপি শরীরে বসন্তরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রতি তিন বছরে একবার টীকা নেওয়া দরকার। আমাদের দেশে সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরা ও টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব বেশী। প্রতি বছর কলেরা ও টাইফয়েডের টীকা নিয়ে নিজেকে এসব রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

সুস্থ পরিবেশে সুষম খাদ্য খেয়ে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে শরীরে সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলে প্রত্যেক মা নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারেন। আর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মন প্রফুল্ল রাখা হ'ল দরকার।

এরূপ সুস্থ মা যখন সন্তানসম্ভবা হবেন তখন তাঁর নিজের শরীরের প্রতি আরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে অনাগত শিশুর কল্যাণ কামনায়। সুস্থ মায়ের শরীরেই সুস্থ শিশুর গঠন ও বিকাশ সম্ভব।

সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মায়ের উচিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া। এর ফলে ডাক্তার নিশ্চিন্ততাবে সন্তান-সম্ভাবনার খবরটি মনে নিতে পারবেন এবং তখন যদি মায়ের শরীরে কোনরকম অসুস্থতা থাকে তাহলে প্রথমাবস্থা থেকেই তা চিকিৎসিত হতে পারবে। ফলে সেই রোগের প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর শরীরে দেখা দেবে না। এছাড়া গর্ভের প্রথমাবস্থা থেকে মাকে কিভাবে চলতে হবে, কি খাবার খেতে হবে, আমার কবে ডাক্তারকে দেখাতে হবে সেগুলোও জানা হয়ে যাবে। সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে মা' হাসিয়ে অনেক বেড়ে যায়। তখন মনে রাখতে হবে যে তখু নিজের জন্য নয় গর্ভস্থ শিশুর জন্যও—ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্যই নিজের পরিচর্যা করা দরকার।

গর্ভাবস্থায় কোন অসুবিধা না থাকলে প্রথম পাঁচমাস পর্যন্ত দুইমাসে একবার করে, তারপর আটমাস পর্যন্ত মাসে একবার করে ও তারপর নয়মাস পর্যন্ত দুই সপ্তাহ পর পর ও শেষে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখিয়ে নেওয়া উচিৎ। এছাড়া যদি কোন উপসর্গ দেখা দেয় যেমন ফ্যাকাসে ভাব পা ফোলা, রক্তিমাল্পতা বা রক্ত কম হওয়া, মাথা ঘোরা, ঘুম না হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য তাহলে তো ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেখানো একান্তই দরকার। প্রত্যেক সরকারী হাসপাতালেই প্রসূতিদের পরীক্ষার ও পরামর্শ দেওয়ার সুব্যবস্থা আছে। হাসপাতালে তাদের ওজন নেওয়া হয়, রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয় মায়ের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুটিকেও পরীক্ষা করে দেখা হয়। নিয়মিত ব্যবধানে প্রসূতি অবস্থায় এসব পরীক্ষাগুলি করিয়ে নিলে যদি কোন অস্বাভাবিকতা থাকে তা সময়মত চিকিৎসা করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এর ফলে আশা করা যেতে পারে সুস্থ মা উপযুক্ত সময়ে এক স্বাভাবিকভাবে একটি সুস্থ শিশুর জন্মদান করবেন।

আমি একটি কথা প্রসঙ্গত না বলে পারছিনা যে আমাদের দেশের মায়েদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা আছে যেমন গর্ভাবস্থায় হাসপাতালে দেখানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা মোটেই উপলব্ধি করেন না। মনে করেন হাসপাতালে একটি কার্ড থাকলেই প্রসবের সময় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যাবে। সেইজন্য গর্ভাবস্থায় নয় মাসের মধ্যে যে কোন একদিন তিনি হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখিয়ে আসেন ও সেই কার্ডটি সঙ্গে তুলে রেখে দেন। প্রসবব্যথার আগে আর একবারও হাসপাতালের ছায়া মাড়ান না। এর ফলে অনেক প্রসূতি সাধারণভাবে ভুগতে হয় কিম্বা বিশ

শিশুটিকেও হয়তো হারাতে হয়। অনেক সময় মায়ের জীবনও বিপন্ন হয়ে থাকে। এই কথাটি মনে রেখে প্রত্যেক প্রসূতিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হাসপাতালে বা অন্যত্র ডাক্তারের কাছে দেখানো একান্ত কর্তব্য। আবার বলছি, কোন উপসর্গ না থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখানোটা আবশিক।

প্রসূতিকালে মায়ের যত্নের মধ্য দিয়ে গর্ভস্থ শিশুরও যত্ন হয় ও সুস্থ-সবল শিশুর জন্মে সহায়তা করে। কিভাবে তা করা দরকার এবার সেই আলোচনায় আসা যাক্। সময়মত খাওয়া, উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, সময়মত বিশ্রাম করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই সময় একান্ত দরকার আগেই বলেছি। গর্ভস্থ সন্তান মায়ের শরীর থেকেই তার পুষ্টি আহরণ করে। কাজেই প্রসূতিকে নিজের শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন তা খাওয়ার সঙ্গে শিশুর পুষ্টির জন্যও খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। শিশু মাতৃগর্ভে মায়ের রক্তের ভেতর দিয়ে মায়ের শরীর থেকেই নিজের শরীরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে। স্বভাবতই যে কোন পূর্ণবয়স্ক মহিলার চাইতে গর্ভবতী মায়ের খাদ্যের পরিমাণ খানিকটা বেশী হওয়া দরকার। আবার এই সময় শরীরের গঠনের পরিবর্তন হওয়ার জন্য খাবার হজম করার ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কমে যায় বলে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে গুরুপাক খাদ্য বর্জন করা উচিৎ। সময়মত খাওয়া ও হাল্কা খাবার খাওয়াই দরকার। অনেক সময়ই দেখা যায় মায়েদের অরুচি হয় বা অনেক খাবারে গন্ধ লাগে। সেজন্য প্রসূতি মায়েদের পছন্দমত আকর্ষণীয় খাবার খেতে দিলে তাতে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

মাকে নিজের শরীর রক্ষার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে তা আগেই বলেছি। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান হচ্ছে---আমিষ জাতীয় উপাদান বা প্রোটিন, শর্করা জাতীয় উপাদান বা কার্বোহাইড্রেট, তৈল জাতীয় উপাদান বা ফ্যাট, লবণ জাতীয় উপাদান বা মিনারেল, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও জল। শরীরে শক্তি জোগায় প্রধানত শর্করা জাতীয় খাদ্য। শিশুর শরীরের বাড়ও এই জাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে আমিষ জাতীয় খাদ্য। শিশুর রক্ত ও প্রধান প্রধান অঙ্গের গঠনেও এই খাদ্য সাহায্য করে। খাদ্যপ্রাণ আমাদের রোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি জোগায়। শিশুর শারীরিক গঠনের জন্য এই সকল উপাদানই একান্ত প্রয়োজনীয়। গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে হাড়মাংস রক্ত সবই তৈরী হয় মায়ের শরীর থেকে। তার জন্য বিশেষ কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের একান্ত দরকার। যেমন লৌহ ও ক্যালসিয়াম। এই লৌহ জাতীয় উপাদান শিশুর রক্ত তৈরীতে সাহায্য করে। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন নিজের যকৃতে এমনভাবে লৌহ-জাতীয় উপাদান সঞ্চিত করে রাখে যা জন্মের পরেও ছয়মাস পর্যন্ত তার প্রয়োজন মেটায়। কাজেই মাকে শিশুর দৈহিক গঠনের প্রয়োজন মিটিয়ে, শিশুর সঞ্চয়ের যোগাড় করে, তারপরে নিজের শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য লৌহ-জাতীয় উপাদান গ্রহণ করা দরকার। আর গর্ভাবস্থায় মায়ের নিজের শরীরেও লৌহজাতীয় উপাদানের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। শিশুর প্রয়োজন মেটানোর পর বহুক্ষেত্রে দেখা যায় মায়ের নিজের ভাগে টান পড়ে যায়। ফলে দেখা দেয় মা'র ক্যাকাসে ভাব বা রক্তাল্পতা। এই অবস্থায় মোকাবিলার জন্য মাকে খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ-জাতীয় উপাদান গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় প্রসূতির পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ঔষধের মাধ্যমে শরীরের সেই লৌহ জাতীয় উপাদানের অভাব মেটাতে হয়। শিশুর হাড়ের গঠনের জন্য মাকে খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির বাড়ানেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই সময়ে সমান জায়গায় হাঁটা খুবই স্বাস্থ্যকর। সন্তানসম্ভবা হলে খুব বেশী শুয়ে-বসে থাকা ভাল নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রামের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হেঁটে বেড়ানো খুবই ভাল। কোষ্ঠ-কাঠিন্যের জন্য প্রসূতিদের অনেক সময় কষ্ট হয়। এর জন্যে সুখভ্যাস, খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে শাক্-সব্জি গ্রহণ ও জল খাওয়া ও তার সঙ্গে রোজ কিছুটা হেঁটে বেড়ালে খুব উপকার পাওয়া যায়।

প্রসবকালে মা ও শিশু দু'জনেরই টিটেনাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রসূতিকালীন অবস্থায় মাকে টিটেনাস রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া যায়, যার ফলে মা ও শিশু উভয়েই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

মায়ের মনের প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর ওপরও পড়ে। তাই গর্ভাবস্থায় মন প্রফুল্ল রাখলে ও সৎ চিন্তায় মন প্রবৃত্ত রাখলে গর্ভের শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে।

কাজেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাচ্ছে, সুস্থ শিশুর জন্মদান ও বিকাশে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর যত্ন কীভাবে নেবেন

যতদিন সম্ভব শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দিন।

চার মাস বয়স থেকে শিশুকে নরম খাবার দিতে শুরু করুন।

শিশুকে দিনে পাঁচ ছ'বার করে খাওয়ান।

অসুস্থ হ'লেও আপনার শিশুকে খাবার খাইয়ে যান।

শিশুর অসুখ হলে বিশেষ করে পেটের অসুখ হ'লে বেশী করে জল খেতে দিন।

শিশু অসুস্থ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাহায্য নিন।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলুন।

শিশুর খাবারে যাতে মাছি না বসে তার ব্যবস্থা নিন।

শিশুকে খাওয়ানোর আগে নিজের ও শিশুর হাত ধুয়ে নিন।

পরিষ্কার জল পান করান।

দুটি বা তিনটির বেশী সন্তান নয়।

প্রতিটি সন্তান যেন ২/৩ বছর পর পর হয়।

ইউনিসেফ

অনিল দলুই রবিবারের গল্প

এই [illegible] বীণা [illegible] দুটি দিন [illegible] [illegible] [illegible] বিছানা ছাড়তে [illegible] না। তারপরই [illegible] [illegible] [illegible]

বিয়ের আগে আদুরে মেয়ে দিন কেটেছে। মেনে থাকত। অফিসের কাজের সময়টুকু ছাড়া জল-খাবার-দিনেমা নিয়ে সপ্তাহ থাকত। বন্ধুদের প্রতি বীরা মোটে প্রসন্ন নয়। বাইরে যায় যদি বিভাস সময় মত ফিরতে পারে না। দেরী তার সইবে। সিনেমার চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। অনেকদিনের পুরনো অভ্যেস। বাড়িতে চা খেলেও এখানে এক কাপ না হলে মেজাজ খুশ হয় না। কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হবে চায়ের দোকানে। তারপর রাজনীতি থেকে খুচরো কিছু বাদ যাবে না। বীরা রাগ করে। বিভাস ওকে দোষ দেয় না।

আজ বিভাস দেরী করে না। মুরেনের সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু পাশ কাটিয়ে গেল। বীরার জন্যে মনের গভীরে যেন এক চিলতে নরম জমি মাথা তুলেছে ধীরে ধীরে। অন্যদিন ওরা দু'জনে ক্লান্ত হয়ে ফেরে। বীরা ফুলে কাজ করে। সারাদিন বকবকানির পর আবার সংসারের কাজে। এক-একদিন ও কথা পর্যন্ত বলতে চায় না। বিভাসের বকলও কম যায় না। ছুটির দিন সকাল থেকে বীরা তরতাজা। কথায় চলনে-বলনে কোথাও এতটুকু ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ঝুরঝুরে পাখি যেন। খুশী উপচে পড়ে সারা শরীরে।

বীরা বলে—আজ আবার কি ভাগ্য।

—কেন?

—এতো শিগগির ফিরে এলে। বন্ধুদের সঙ্গে বুঝি দেখা হয় নি?

—তোমার জন্যে বন্ধুদের ত্যাগ করেছি।

—এতো সুখ সইলে বাঁচি। ত্যাগ করো-না-করো তবুও খুশী হলুম।

—এক কাপ চা দিতে বলো।

—যা-রে চা খেয়ে তো বাজারে গেলে। ফিরে আবার চায়ের বরবাস।

—সিনেমার দোকানের চা বাদ দিলুম না? ওখানে ঢুকলে এতো তাড়াতাড়ি বেরিয়তে ইচ্ছে হয় না। তবু তোমাকে কম্পানি দেবার জন্যে এ স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে।

রান্নাঘর মানে। কোনরকমে বলে বীরা চলে। শহর নয়, শহরতলী। একখানা ঘর, লাগোয়া বারান্দা। রান্নাঘর, অবশ্য একেবারে আলাদা নয়। এখন বাড়ি হঠাৎ মেলে না। ওরা সুখী। তাছাড়া ঘরভাড়া বেশী। ও জানে, এখন ছিমছাম বাড়ি ক'টা মেলে পরের। নতুন বিয়ে হয়েছে, একটু নিরালা না হলে নয়নভরে বীরা যায় না।

বিভাস খবরের কাগজ কিনে এনেছে। বারান্দা ঘরের চৌকাঠের কাছে বারান্দায় চেপে বসে। চা খায়। সিগারেট ধরিয়ে কাগজ পড়া সুরু করে। হালকা মনে চোখ বুলোয় কাগজের পাতায়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে বীরা একা-সেটা করছে। তুচ্ছ কাজ। তবু সে তারিয়ে তারিয়ে দেখে। মেয়ের জীবনে এমন ছিল না। ঘাটতুলে জীবন। ঘরোয়ারি কলতলায় চান সেরে ওদের খাবার বসা। খাওয়া যে শুধু উদরপূর্তি নয় একটা বিলকর্ম, জানা ছিল না।

বীরা বলে—কি মাছ এটা?

—চিনতে পারছ না?

—না।

—চেতল মাছের পেটি। ষোল টাকা কিলো। বেশ ভালো করে রান্না করো। এমন মাছ বাজারে রোজ মেলে না। তুমি খাও তো?

—আমার অত মাছবিচার নেই, মাছ হলেই হলো। কি খাবে?

—তুমি যা ভালো বোঝ করো। কেউ কোন দিন জিজ্ঞেস করেছে বুঝি, কি খাব, কি রান্না হবে। মেয়ের রান্না খেয়ে বুঝতে কি চিহ্ন। ঝাল-ঝোল চচ্চড়ির তফাৎ বোঝা ভার।

বীরা বেদনা বোধ করে। বিয়ের পর সে সব খেয়েছে। বিভাসের মা-মা যায় গেছে ও' বখন খুব ছোট। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি মানুষ। মেজমাসী করেছে নিজের চোখে। চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন দূর সম্পর্কের এক কাকা। তারপর থেকে মেসের বাসিন্দা। বীরাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা খুব না থাকলেও অবহেলা ছিল না। বিভাসের জন্যে দুঃখ অনুভব করে, সংসার জীবনের মাধুর্য ও কোনদিন পায়নি।

বিভাস বলে—উম্মু!

—কি?

—আজ আর বন্ধুদের বাড়ি যেতে ভালো লাগছে না।

—কেন?

—এমনি। তার চেয়ে চলো সিনেমায় যাই। 'পার্বতীতে' একটা ভালো বই হচ্ছে।

—বন্ধুমাসী অনেক করে যেতে বলেছে।

—আসছে রোববার যাব।

—টিকিট পাবে?

—এখনি কাটছি।

জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় বিভাস। বীরার মন খুঁত খুঁত করে। বন্ধুমাসী না জানি কি ভাববে। যাব যাব করে কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না। আজ তার সিনেমা দেখার মোটেই ইচ্ছে নেই। কিন্তু বিভাসের মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। বিভাসকে সে দুঃখ দিতে চায় না। জীবনে কোনদিন কারো কাছে ভালবাসা পায়নি। বীরা তার ইচ্ছেতে বাধা দেবে না।

চায়ের কাপ-ডিশ ধুতে গিয়েছিল কলঘরে। ফিরে এসে দেখে মাছের চাকাটা নেই। কি হোল? কোথা গেল? আকাশ ভেঙে পড়ে মাথায়। কাক নিয়ে গেল নাকি? কাক অতবড় মাছটা নিয়ে উড়তে পারবে না। তাহলে? হঠাৎ তার নজরে পড়ে, গোল গোল পায়ের ছাপ বারান্দার পাশ দিয়ে বাইরে চলে গেছে। বেড়াল!

সে কি করবে বুঝতে পারে না। সে এত অন্যমনস্ক হল কেন? বাজারের কপাটে খেয়াল টেনে দিয়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না। বিড়াল আসে মাঝে মাঝে, সে অত খেয়াল করেনি। বিভাসের কথা ভাবতে ভাবতে উঠে গিয়েছিল। বিভাস ফিরলে কি বলবে তাকে? সে মানুষ মত বসে থাকে। কাজ করতে ভাল লাগে না। ছুটির দিনের এমন সুন্দর সকাল বিষাদ লাগে।

বিভাস ফিরে আসে। শংকায় নিথর বীরার সারা শরীর। বিভাস বলে—বুঝলে বীরা, কি ঝিঁচেনভাস ভীড়। কাউন্টারে চেনা-জানা লোক ছিল, দু'টো টিকিট ম্যানেজ করেছি।

বীরা বেরিয়ে আসে শুকনো মুখে।

বিভাস বলে—কি হলো তোমার?

—মাছ বেড়ালে নিয়ে গেছে।

বিভাস জলে ওঠে দপ করে। অনেক আশা করে মাছ কিনেছিল। বলে—কি করে দিল?

—কলঘরে গেছি, এসে দেখি মাছ নেই।

—এত বেয়াদবেলা হয়ে কাজ কর কেন? আমার জিনিসটা বেড়ালকে খাওয়ালে?

—আমি কি ইচ্ছে করে করেছি? তুমি রাগারাগি করছ কেন?

—রাগারাগি করাটা আমার অপরাধ হলো? পয়সার অপচয় দেখবে না?

—তোমার পয়সা দিয়ে মোর। কত দাম বল।

—পয়সার গরম দেখাচ্ছ?

—পয়সার কথা তুমি তুলেছ।

—না, আমি অপচয়ের কথা বলেছি। চাকরে মেরে বিয়ে করা ভুল হয়েছে।

—করলে কেন?

—চুপ কর। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী।

বিভাস ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে দেয় ফুল স্পীডে। জামা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে। সিনেমার টিকিট রাখে টেবিলে। বিছানায় শুয়ে পড়ে। দপ দপ করে রাগে। বীরা পয়সা খেয়ে দিতে চাইল? পয়সা খেললে সব জিনিস সব সময় মেলে? একটা লোকের আদার কথা ভাবল না?

আয়না উঁচুনের সামনে বসে থাকে বীরা। বিভাস এত চড়া গলায় কথা বলেনি কোনদিন। কাজ করতে গেলে কার না ভুল হয়? বিভাস কি কোনদিন অসাবধান হয় না? ও কত সহজে বলতে পারল, বীরাকে বিয়ে করে সে ভুল করেছে। সে তো এমন কথা ভাবতে পারে না। চোখ দু'টো তার জ্বালা করে।

ঘর-সংসারে চুপ। কোন লোক নেই। ওরা ভাত খায় মুখ বুজে। খাবা চোপা না পড়ে চোখে চোখ পড়ে। খাটে শোয় বিভাস, মেঝেতে মাদুরে বীরা। দু'জনে দু'দিকে পাশ ফিরে শোয়। কেউ ঘুমোয় না, ঘুমের ভান করে। বিভাস উঠে বসে, সিগারেট ধরায়, কলঘরে যায়, ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে। বীরা সব শোনে, চোখ খোলে না, গায়ের কাপড় দিয়ে সোড়াদি ঢাকা দেয়।

বাইরে রোদের তাপ কমে। বীরা উঠে চা করে খাবে। চায়ে চুমুক দিয়ে বিভাস বলে—তৈরী হয়ে নাও, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

—সিনেমা যাব না।

—কেন?

—শরীর ভালো নেই।

বিভাস কিছু বলে না। সিনেমার টিকিট ক্যানেল হওয়ায় খরচ বেঁচে গেল। আয়নার সামনে বসে বীরা চুল বাঁধে। গম্ভীর মুখ, যাতে ধরা চুলের ফিতে, ঘির বীরা। বিভাস জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

রাত ন'টায় ফেরে বিভাস। খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ে। আলো নেভে।

—বীরা।

বীরা চুপ।

—আমার দিকে ফিরে শোও।

—কি বলছ?

—বড় ছেলেমানুষী হলো।

—কার?

—তোমার-আমার। অপচয় বন্ধ করা না।

—টিকিট বিক্রি করে দিলে না কেন?

—পয়সা দিয়ে সব অপচয় পূরণ করা যায় না।

—তা'হলে?

—জীবনের একটা আনন্দের দিন অপচয় হলো-না? আমরা বড় বোকা, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই। তাই না?

বীরা জবাব দেয় না। একটা হাত রাখে বিভাসের গায়ে।

শতবর্ষের আলোকে আইনস্টাইন

● ৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মাত্র দু'পৃষ্ঠার টাইপ-করা প্রবন্ধ। সেটি পাঠ করে বিস্মিত হলেন আইনস্টাইন। উপলব্ধি করলেন এর মৌলিকতা ও গুরুত্ব। অনুবাদ করলেন আইনস্টাইন প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায়। প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন উচ্চ পত্রিকায়। অতিরিক্ত হিসাবে এই দুটি লাইন সংযোজন করে দিলেন: 'আমার মতে পুঞ্জানুপুঞ্জ প্রমাণে বোসের পদ্ধতি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 'প্রফেসর সত্যেন বোস' এই নামটি ওদেশের বিজ্ঞানী সমাজে রাতারাতি পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে অধ্যাপক বোস বার্লিনে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং কিছুকাল তাঁর অধীনে কাজ করবার সুযোগ-সুবিধাও পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের আরো দুইজন মহান ব্যক্তির প্রতি—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—আইনস্টাইন গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। ১৯৩২ সালে কবির জার্মান সফরের সময়ে তিনি যখন বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন তখন সেখানে এই বিজ্ঞানীর কাছ থেকেই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। গান্ধীকে তিনি পৃথিবীর শান্তিবাদীদের শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন।

জার্মানিতে যখন হিটলারের অভ্যুদয় ঘটল ও তিনি জার্মানির সর্বেসর্বা হলেন তখন আইনস্টাইন সপরিবারে দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি আর জার্মানিতে ফেরেননি। শুরু হয় নির্বাসিতের জীবন, শরণার্থীর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি এই সময়ে রুজভেল্টের সহযোগিতায় 'Why War?' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। য়ুরোপের শান্তিকামীদের কাছে বইটি প্রশংসা লাভ করেছিল। আমেরিকা জার্মানির বিজ্ঞানীকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালো। প্রিন্সটনে অবস্থিত ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি আইনস্টাইনকে গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। জীবনের পরবর্তী তেরো বৎসরকাল তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন আমেরিকার নাগরিক হিসাবে।

১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পরিণতি দেখে চির শান্তিবাদী (Pacifist) বিজ্ঞানী সেদিন ভেঙে পড়েছিলেন মনুষ্যত্বের প্রতি এই অবমাননায়। এই সময় এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে আইনস্টাইন লিখেছিলেন 'আমার আশংকা হয়, এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন চলতে থাকবে হিংসার বীভৎস কাণ্ড।' তাঁর জীবনের শেষ তেরোটি বছর কেটেছে বিরল ও বিচিত্রতর বিজ্ঞান-সাধনায়। বিজ্ঞান বিধান মানবাত্মার স্বপ্রকাশ—এমনই একটা ধারণা তাঁর সমস্ত সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিজ্ঞানী মরে উঠেছিলেন একজন দার্শনিক। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এই কথা: আমি চিরকালই সমস্ত সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছি। আমি কোনো একটি দেশের বা রাষ্ট্রের অধিবাসী নই। আমি সমগ্র পৃথিবীর, সমস্ত মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত।'

১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল বিজ্ঞানী জীবনদীপ চিরকালের মতো নির্বাপিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র বিশ্বপ্রকৃতি নয়, আইনস্টাইনের মানবপ্রীতি ও বিশ্বমানবতা বহু যুগ ধরে উদ্বেলিত করবে অগণিত সত্য অনুসন্ধিৎসু মনুষ্যকে।

কলকাতার বস্তি

উচ্ছেদ না উন্নয়ন?

সমীর দাশগুপ্ত
সন্ধ্যা দাস

নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা আঁকতে গিয়ে পরিকল্পনা বিশারদ প্রথমেই যে বাধার সম্মুখীন হন তা হল বস্তি। ভারতবর্ষের মত বিকাশশীল দেশে যেখানে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা আজ নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানে বস্তিসমস্যা এক তীব্র আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরাঞ্চলের বস্তিগুলোর অবস্থা সবচাইতে খারাপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক দৈনন্দিন বস্তিবাসীদের এক অসহনীয় জীবনযাপনে বাধ্য করছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারত-বর্ষের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে বস্তির জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ। একমাত্র কলকাতা শহরেই তিন চতুর্থাংশ লোক বাস করে বস্তিতে। প্রতি বর্ষা বাইলে কলকাতার বস্তি জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৭৭৩০০। কলকাতার বস্তি সঙ্কলের সংখ্যা কত? হিসেব দেওয়া মুশকিল। কলকাতার নিম্নোক্ত বস্তি অঞ্চলগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বস্তি জনসংখ্যা যে কত বিপুল এবং শহরাঞ্চলের কত জমি যে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে তা বোঝা যাবে :

দুঃস্থ কলকাতা

১। পচা-পতিতিয়া বস্তি
২। মনোহরপুকুর বস্তি
৩। ভবানীপুর বস্তি
৪। ব্লক ডাট-পাব এডিনিউ বস্তি
৫। কালিঘাট বস্তি
৬। পঞ্চাননতলা বস্তি

পূর্ব কলকাতা

১। বস্তিবিল বস্তি
২। নারকেলডাঙা বস্তি
৩। বেলেঘাটা বস্তি
৪। বিলখুসা, তিলজলা বস্তি

মধ্য কলকাতা

১। কলুটোলা বস্তি
২। ঘোড়াবাগান বস্তি
৩। ইলিয়ট রোড বস্তি
৪। পার্কসার্কাস বস্তি
৫। তালতলা বস্তি
৬। বড়বাজার বস্তি

উত্তর কলকাতা

১। লক্ষ্মণেট বস্তি
২। রাজা নবীন্দ্র রোড বস্তি
৩। রানী চন্দমুখী রোড বস্তি
৪। কাশীপুর বস্তি

কেন্দ্রীয় সরকার বস্তি সমস্যা দূর করবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছেন। কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায়। নগর উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে সি আই টি, সি এম ডি এ, সি এম পি ও প্রভৃতি সরকারী, আধা সরকারী সংস্থা। হয়ত কিছু বস্তিতে তুলনা-মূলকভাবে খুবই স্বল্প উন্নয়নমূলক কাজও হয়েছে। তথাপি ঘরে গেছে যোজনার সঙ্গে বাস্তবের একটা বিরাট দূরত্ব। এর কারণ কী? সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর জন্য মূলত দায়ী প্রাকৃতির যোজনা এবং সামাজিক যোজনার মাঝ-খানে এক বিশাল শূন্যতা। যদি কোন যোজনা বিশারদ "স্লাম ক্লিয়ারেন্সের" ওপর শুরুত্ব আরোপ করেন তবে নিশ্চয়ই তা ব্যর্থ হবে। কারণ আমরা সমীক্ষায় দেখেছি, বস্তি উচ্ছেদের প্রচেষ্টাগুলি এক দাম্ভিক বুলডোজার পদ্ধতিরই নামান্তর মাত্র। যাঁরা মনে করেন বস্তি উচ্ছেদ করলেই পরিচ্ছন্ন এক নগর উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ বস্তি উচ্ছেদ করা যায় না। যাঁরা বস্তিতে বাস করেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিন্নমূল—কেউ গ্রাম থেকে কেউ বা অন্য দেশ থেকে—যাবার কেউ বা অন্য রাজ্য

এলাকা অনুযায়ী বস্তি আর তার পরিবেশ ঠিক বস্তির মত। মাত্র ৪ বছরে সি এম ডি এ প্রায় ১৫০০ বস্তির উন্নয়ন করেছে

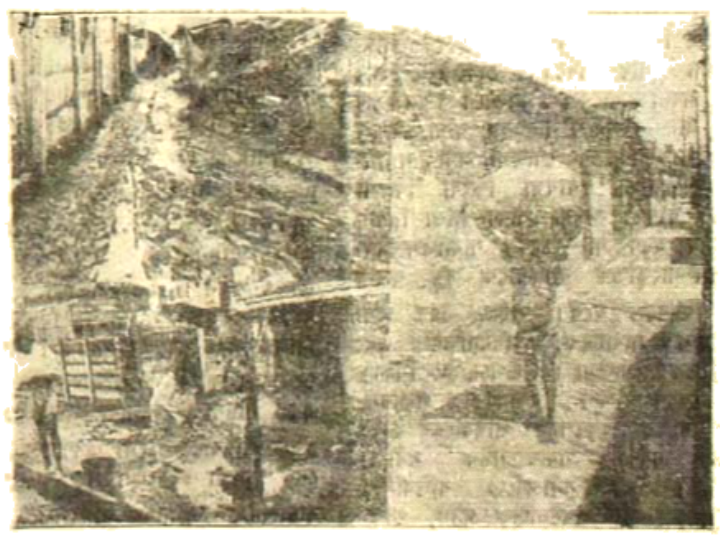

বস্তিতে উন্নয়নের অনেকগুলি দিক,—পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রসাধনাগার ইত্যাদি। এছাড়াও দিল্লি কি এ বস্তিতে জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে

থেকে এখানে এসেছেন। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয় কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা রাজনৈতিক তাড়াভোলে বিপর্যস্ত হয়ে এরা শহরাঞ্চলের এমন কিছু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে অল্প ভাড়ায় অল্প ভাড়ার বাসা সোজাসুজি জায়গা থেকে উৎখাত হলে অন্যত্র তাঁরা নতুন করে বস্তি অঞ্চল গড়ে তুলবেই। তাই বস্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ভাবতে হবে বস্তি অঞ্চলগুলোকেই কীভাবে পুনর্গঠিত করা যায়—কিভাবে পরিচ্ছন্ন করা যায়। এর জন্য প্রাকৃতিক যোজনা অর্থাৎ স্যানিটারী পদ্ধতির ব্যবস্থা কিংবা বিজলী বাতির ব্যবস্থা অথবা পানীয় জলের নির্বাণ করলেই হবে না—তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যকে দূর করার কথা ভাবতে হবে। অর্থাৎ এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোজনা। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মনে রেখে দক্ষিণ কলকাতার গড়ানপোতা বস্তির একশোটি পরিবারের ওপর আমরা একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালাই। এই সমীক্ষাতে বস্তিবাসীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠন, প্রাকৃতিক আকৃতি (Physical Structure) এবং বস্তী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মনোভাব পর্যালোচনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১০০টি পরিবারের মধ্যে ৭২টি পরিবার গ্রাম থেকে এসেছে। তাদের স্থান ত্যাগ বা মাইগ্রেশনের প্রধান কারণ হল, গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় (৭৮ শতাংশ)। এদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। শহরাঞ্চলে এসে কেউই প্রায় পেশাজীবনে নিরাপত্তা পায়নি। ৬৯ শতাংশ দিনমজুরের কাজ করে। পরিবারের গঠন এখনও গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং সনাতন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে অর্থাৎ নগরসভ্যতার কেন্দ্রস্থলে বাস করেও ৭০ শতাংশ বাস্তুবাসী যৌথ পরিবার জীবনযাপন করছে। কিন্তু পরিবারের আকৃতি তুলনামূলকভাবে বেশ বড় (৪-৬ জন প্রতি পরিবারে)। মাসিক আয় এত কম (১০০-১৫০ টাকা) যা সরকার প্রবর্তিত ন্যূনতম মজুরীর আওতাতেও পড়ে না। ৯০ শতাংশ পরিবার ঋণের দায়ে জর্জরিত। ৫০-১০০ টাকার বদ্ধ অঙ্কের ঋণ মাসে শোধ করতে হয়। কাবলীওয়ালা কিংবা বন্ধকী কারবারীর কাছ থেকে তাঁরা চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। অবসর বিনোদন কাকে বলে তা তাঁরা জানে না কিংবা জানবার সুযোগও নেই। তবে পাশ্চাত্য দেশের মত এ দেশের বস্তি অঞ্চলগুলো অপরাধের পীঠস্থান নয়। কারণ পরিবারের এক ঐতিহ্য এবং Sacredness of familism অনেকাংশে সে ধরণের অপরাধ হতে নিবৃত্ত করে। সুতরাং যারা বলেন, 'slum dwellers are always in a brawling mood which disturb the more sedate life of the city' তাঁদের বক্তব্য বস্তি অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই যুক্তি টেকে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩৯ শতাংশ বয়স্কজন অশিক্ষিত। ২৩ শতাংশ কখনো কখনো দুবেলা খাবার জোটে না—বিবাহবিচ্ছেদের একটি ঘটনাও সমীক্ষাতে ধরা পড়েনি। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা প্রকৃতপক্ষেই অবর্ণনীয়। 'They are the victims of physical dilapidation'। ৯২ শতাংশ পরিবারই বাস করে একটি ঘরে। প্রতি পরিবারের সদস্যসংখ্যা গড়ে ৫—৭ জন। ৯১ শতাংশ বাড়ীর মেঝে মাটির—দেওয়াল বাঁশের বেড়ার—ছাদ টালির এবং মেঝের পরিমাপ গড়ে ৫১—১০০ বর্গফুট। ১০০টি পরিবারের রান্নাঘর এবং পায়খানা আলাদা নয়। ১০ কিংবা ১২টি পরিবারের জন্য একটি করে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। ৭৩ শতাংশ পরিবার রান্নাঘরকে রান্নাঘর হিসেবেই ব্যবহার করে। ডেস্টিটিউশনের কোন ব্যবস্থাই নেই। কর্পোরেশনের দেওয়া জলের কলের ওপর সমস্ত পরিবারকেই নির্ভর করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৮৩ জন ভাড়াটে। ৫—২০ টাকায় যত তাঁরা প্রতি মাসে ভাড়া দিতে হয়। জমি অবশ্যি কিছু কম নিজের এমনি পরিবার রয়েছে ১৬টি। সরকারের বস্তি উচ্ছেদ প্রকল্প সম্বন্ধে তারা সচেতন কি না জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৮৪ জনই এর পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু ৯৮ শতাংশ এই বস্তি উচ্ছেদ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তাঁদেরকে যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় তবে তারা কী করবেন এই প্রশ্নের উত্তরে ১৪ শতাংশ ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন এবং তা নির্ধারিত হবে বর্তমান জমি এবং গৃহনির্মাণ বাবদখরচার মূল্যের ভিত্তিতে। শতকরা ৮৪ জন নতুন ফ্ল্যাটে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন কিন্তু সে ব্যবস্থা বস্তি উচ্ছেদের আগে করতে হবে। তাঁরা সরকারের আশ্বাসের ওপর আস্থা রাখছেন না। কত টাকা কী তাঁরা ভাড়া দিতে সক্ষম হবেন জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৭১ জন ১০ থেকে ২৫ টাকার ওপর জোর দিয়েছেন।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিশারদকে ভাবতে হবে বা উচ্ছেদ একটি অসফল প্রকল্প কি না। দ্বিতীয়ত, বস্তি পুনর্বাসনের প্রকল্পের সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যারও মোকাবিলা করা দরকার। যেমন বস্তি উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। যাঁরা বাড়ী বন অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা সম্প্রদায় তাদেরকে বর্তমান জমির মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। তৃতীয়ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেই সমস্যা মিটবে না। সেখানে বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। ঝোপা-ঝাপিড-বাক্সা কিংবা ফোকাসবার সম্প্রদায়কে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথোপযুক্ত জায়গা দেওয়া দরকার। পুনর্বাসনের ফলে একটা সামাজিক শূন্যতা কিংবা marginality দেখা দিতে পারে এবং তা অপরাধ প্রবণতার পথে প্রধান পাথেয়ও হতে পারে। তাছাড়া বস্তী জীবন এবং ভরমিটরী জীবনের মধ্যে একটা কৃত্রিম শূন্যতাও সৃষ্টি হতে পারে।

সুতরাং আমাদের মনে হয় বর্তমানে যে অঞ্চলগুলোকেই পুনর্গঠিত করার পথে পরিকল্পনা বিশারদের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। প্রাকৃতিক যোজনার প্রয়োজন তো আছেই কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যোজনার গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ 'culture of poverty' দূর না করতে পারলে নগর উন্নয়ন সফল হয় না। যোজনা বিশারদের সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার 'Planning must be from the bottom'। তাহলে হয়ত মুখ পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে দেশ এগিয়ে যেতে পারবে।

গ্রামজীবনে বৃত্তি ও শিল্পের রূপান্তর

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতি ও বংশগত বৃত্তির দিন দ্রুত অস্তমিত হচ্ছে। আধুনিক শিল্পের প্রসারের ফলে যেমন বংশানুক্রমিক বৃত্তির দিন ফুরিয়ে আসছে, তেমনই আমার একই সঙ্গে বাঙলা তথা ভারতের শিল্প-মানচিত্রের রূপরেখাটিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের কিছুটা পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সূচনায় বলে রাখা ভালো, বীরভূম জেলার কয়েকটি ব্লকে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলাম বর্তমান প্রবন্ধটি তারই ফলশ্রুতি।

নির্মলকুমার বসু তাঁর 'হিন্দু সমাজ গঠন' গ্রন্থে লিখেছেন: 'হিন্দু সমাজ বহুদিন যাবৎ নানা জাতির সংহতির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে কৃষি-শিল্পাদি ব্যাপারেও নানাবিধ উৎকর্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতি দেশে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এক এক জাতি হয় তো বিশেষ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। যে জাতি বা কুলের সমস্ত একটি বৃত্তি অবলম্বন করিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের নিয়ন্তাগণ সেই বৃত্তিতে সেই কুলের বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকার করিয়া দিতেন।' এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় কীভাবে বংশানুক্রমিক বৃত্তি ব্যাপারটির সূচনা হয়েছিল। তবে ব্রাহ্মণরা যাই করে থাকুন-ছিলেন বলে বংশানুক্রমিক বৃত্তির সূচনা যাঁদ হয়েও থাকে তা দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকার কিছু বাস্তব কারণ ছিল এবং আছে। কোন বিশেষ বৃত্তিতে কেউ সফল হলে তার বংশধরগণ সেই বৃত্তিই গ্রহণ করতে চান। তাতে সুবিধা এই যে, বিশেষ বৃত্তির খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বিশদভাবে একই পরিবারে থেকে আরেকজনের পক্ষে সুচারুরূপে জানা ও রপ্ত করা সম্ভব। বৃত্তিধারী তাঁর সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর বংশধর ও আত্মীয়দের দান করতে পারেন। দিনে দিনে, দীর্ঘ সময় ধরে এই দান ও পরিগ্রহণ সম্ভব। ফলে পরবর্তী বংশধর বৃত্তিতে সহজেই উৎকর্ষ লাভ করতেন। পুরুষানুক্রমিক আবর্তনীয় অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগ তাঁকে সাহায্য করত। ব্যবসা ও বৃত্তি এই বাস্তব কারণেই পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হত। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হয়ে থাকে বলে সাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতা বিষয়েও সাধারণ মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকে না। তাতে কারুর কাজ দেখার ব্যাপারটিও একই বংশের মানুষদের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলতে পারে। বাবা, দাদা বা কাকাদের 'যোগাড়ে' বা সহায়ক থাকতে থাকতেই অনেকে ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো পটুয়া, ছুতোর, কামার ইত্যাদিতে পরিণত হন। নতুন করে কোন উদ্যোগে না গিয়ে হাতের কাছে পাওয়া বৃত্তিটুকু গ্রহণই অনেকের কাছে সমীচীন মনে হয়। যেন বংশানুক্রমিকভাবে অধিকার জন্মাত বলা যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল বলেই ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের প্রবণতাও হয়ত কম দেখা যেত। মনে রাখা দরকার যে, শিল্প শিখার কোন স্কুল ছিল না। তবু বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে উৎকর্ষ সাধনের কোন অসুবিধা ছিল না।

গ্রাম সমাজে এক একটি বর্ণের মধ্যগত বিভিন্ন বর্ণের পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। এবং সেই সমস্ত বর্ণের মধ্যে যাজন বৃত্তি-ভিত্তিক মান মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য ছিল। এখন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বর্ণসমূহের নির্ভুল ওজন নির্ণয়ই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপক আকারে বৃত্তিলাভের ফটার পূর্বে যে কোন কাজ করতেন আজ তাও খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। এক একটি বর্ণের মধ্যে কর্মানুসারে থাকত চারটি স্তর। বীরভূমে সাড়ুর থানার কয়েকটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, ডোমদের মধ্যে ঝাঁকুড়ে স্তর পেতে, ঝাঁচি (ঝুড়ি) বুনতেন, নিম্নস্তরে ঢোকরা চুই, পাকুর গাছির উপর নির্ভরে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। বাদুনেরা বাজাতেন ঢোল। ঘাটকা গ্রামের পরলোকগত বিখ্যাত কিংবদন্তী কবিয়ালের মনে হোল বাজাতেন বাজনে ঢোল অধু। মাঝী, ডোমী ও বেন কঠিন। এক একটি বর্ণের মধ্যে কর্মানুসারে থাকত চারটি স্তর। বীরভূমে সাড়ুর থানার কয়েকটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, ডোমদের মধ্যে ঝাঁকুড়ে স্তর পেতে, ঝাঁচি (ঝুড়ি) বুনতেন, নিম্নস্তরে ঢোকরা চুই, পাকুর গাছির উপর নির্ভরে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। বাদুনেরা বাজাতেন ঢোল। ঘাটকা গ্রামের পরলোকগত বিখ্যাত কিংবদন্তী কবিয়ালের মনে হোল বাজাতেন বাজনে ঢোল অধু। মাঝী, ডোমী ও

খোঁ বলেনি কুম্ভকারগণ পোড়ামাটির গ্যাস, প্রদীপ, ভাঁড়, পাত্রাদি করকে ইত্যাদি তৈরী করতেন ও করেন। মেয়েরা মূলের কাজ ছিল চিনে মাটির বাসন নির্মাণ। এভাবে আরও কয়েকটি বর্ণের বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা কে কোন্ বৃত্তিধারী ছিলেন তার একটি তালিকা আমি প্রস্তুত করেছি। এক একটি বর্ণের বৃত্তি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকল।

এখানে শুধু জানিয়ে রাখি যে, বাঙলার বাইরের রাজ্যের কিছু কিছু শ্রমজীবী মানুষ, যেমন কামার, কুমোর, ছুতোর, রজক, নুচি প্রভৃতিও স্থানীয় এই একই বৃত্তির মানুষদের পাশাপাশি স্বীয় বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। জীবিকার প্রয়োজনে এই সহাবস্থানের সূত্রপাত হলেও আজ তারা এমনকি স্থানীয় বিভিন্ন বর্ণের বর্ণের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। সাড়ুর থানার মহাগ্রামের এক কর্মকার তো কর্মকারদের

দুটি 'ঘরের' কথা আমাকে জানিয়েছিলেন —এক সেদি কমকার ও দুই, রাণা কর্মকার। রাণা কমকারগণ পশ্চিম থেকে এসে বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। রাণা কমকারদেরই একটি ঘর 'সানকর কামার', যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গৃহস্থের প্রয়োজন অনুযায়ী ছুরি, কাঁচি, বঁটি ইত্যাদিতে 'সান' দিয়ে বেড়ান। সবচেয়ে বড় কথা বৃত্তি ও জীবিকার তাড়নায় স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে মানুষের যৌথ সাংস্কৃতিক লক্ষণাবলী বদলে যেতে পারে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মাত্র সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে নির্দিষ্ট বর্ণ ও বর্ণের অন্তর্গত বর্গভিত্তিক বণ্টন ও গ্রহণের প্রচলিত রীতিনীতি যে পরিমাণে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হয়েছে সচরাচর তার তুলনা মেলা ভার। দক্ষতা, প্রবণতা ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতায় বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত বৃত্তিতে অন্য লোকের আগমন ঘটল। একটা উদাহরণ দিই। ১৩৮১ সালে লাভপুরের কুমরা মেলায় বংশ পরম্পরায় বুড়িবাড়ী ছুতোরের পাশাপাশি দোকান করেছিলেন কাপসুন্দি (লাভপুর থানা) গ্রামের শেখ নুরুদ্দিন আলী। নুরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা বরাবর চাষের কাজ করেছেন। শেখ নুরুদ্দিন লাভপুর স্কুলে ছুতোরের ট্রেনিং নিয়ে পরে ওই পেশায় মোটামুটিভাবে দক্ষতা অর্জন করেছেন। সে সময় আমি যখন তাঁকে দেখেছিলাম তখন তিনি ছুতোরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনবোধে কৃষিকাজও করতেন।

ব্যাপক কলকারখানা ও শিল্পপ্রসারের ফলে এক বর্ণের কাজ যে অন্য বর্ণে বর্তেছে তার বহু উদাহরণ আমি পেয়েছিলাম বীরভূম মেলায় করেকটি গ্রামে। কর্মকারদের হাতে এসেছে ছুতোরদের কিছু কিছু কাজ। লাভপুর থানার কয়েকটি গ্রামে ছুতোরদের তৈরী গাধার কাঠের 'দুন' দেখেছিলাম। আগে ওই অঞ্চলে লোহার কাঠের 'দুন'-এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। একটাই কাঠখণ্ড থেকে কেটে কুঁদে এটি নির্মাণ করা হ'ত। কলকারখানা থেকে টিনের পাত কর্মকারদের হাতে এসে পড়ায় তিনি ওই উপাদানের সাহায্যে এখন টিনের পাতের 'দুন' নির্মাণ করেন। কাঠের নির্মিতে বহুলাংশে টিনের 'দুনের' প্রচলন পর্যন্ত। কৃষিকাজে লেট সরঞ্জামের এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। এখন আবার ডিজেল চালিত হালকা বহনযোগ্য পাম্প সেট অল্প লম্বা মোটা বড় পলিথিনের পাইপ দিয়ে গ্রাম ঘরে হাজারে হাজারে পৌঁছে গেছে। স্বাধীন কারবারের কাজ ঐতিহাসিক নিয়মে এভাবে কলকারখানা ও শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে যাবে এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও ফুরোবে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে পালকির। তন্তুবায়ের লোকজনের অন্যত্র গমনাগমন ও যোগাযোগের মুখ্য উপায় ছিল পালকি। বর্তমানে আধুনিক পরিবহণের যুগে পালকি অচল। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী বা সুবিধাবশত এখনও অবশ্য কোথাও কোথাও, বিশেষ করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিবাহের সময় কন্যাপুত্রে গমন ও বিবাহান্তে বধূসহ প্রত্যাবর্তনে পালকির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ছুতোরদের আর পালকি বড় একটা তৈরী করতে দেখা যায় না।

আগে রথও দ'ত কাঠের। অনেক পরে এসেছে লোহা ও পিতলের পাতের রথ। আর সাড়াইয়ের কলেও আগে কোন লোহা বা ধাতু ব্যবহার করা হত না। পুরোপুরি কাঠের তৈরী এই আর্থ সাড়াইয়ের কলকে বীরভূমের ছুতোরেরা 'বরপোল' বলতেন। এই আটও আজ ছুতোরদের তৈরী করতে দেখি না। গ্রামের ছুতোরদের তৈরী কাঠের সিন্দুকও আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না। গৃহস্থের এক সময়ের ব্যবহার্য সিন্দুকের স্থান নিয়েছে স্টীল ট্রাঙ্ক ও সুটকেস। কাঠের সিন্দুকে আগে কব্জার ব্যবহার ছিল না। খিলান পদ্ধতিতে নির্মিত সিন্দুক ছুতোরদের দক্ষতার প্রমাণ। কব্জা ও ঘাঁসকলসুনি প্রচলনের আগে বীরভূমের ছুতোরেরা এসব দরজা তৈরী করে লাগাতেন যাতে ওগুলির কোন প্রয়োজন অনুভূত হত না। এই দরজাগুলিকে বলা হত 'মুকু' লাগানো দরজা। লোহার ব্যাপক ব্যবহারের আগে ছুতোরদের এই কাজ অবশ্যই বুদ্ধি ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে দেখা যেত।

আধুনিক কলকারখানা ও যন্ত্রের উদ্ভবের ফলে গ্রামীণ শিল্পীর জীবিকা ও বংশগত কর্মবৈশিষ্ট্যে যে পরিবর্তন হয়েছিল তা শুধু এক বর্ণের কাজ অন্য বর্ণে ন্যস্ত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, গ্রামে উৎপাদ্য ব্যবহারিক শিল্প সম্ভারের ক্ষেত্রেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কিছু শিল্পসম্ভারে ও অঙ্গনে যা কারিগরা নির্মাণ করতেন তা এখন কলকারখানায় নির্মিত হয়। বর্ধমান জেলার কাঁসাই-কাঁসারপাড়া ও লাইহাটি থেকে স্বর্ণকারদের উৎকৃষ্ট শিল্প সম্ভার সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ত। ওই দুই স্থানের নির্মিত দাদুড়ি, কাতুড়ি, চৌকি, গ্লাস, কাঁসলা চোপসা, সুলি, আঁতি, আমরো, থালোস প্রভৃতির চাহিদা বীরভূমের স্বর্ণকারদের মধ্যে ছিল ব্যাপক। আস্তে আস্তে কারখানার যন্ত্রপাতি এসে এই চাহিদার অনেকখানিই কমিয়ে দিয়েছে।

তন্তুবায়ের সুতোর পরিবর্তে বিদেশ সুতো ব্যবহৃত হতে লাগল বীরভূমের তাঁতে। বিদেশ সুতোরও দিন ফুরিয়ে এখন আবার সাইলনের সুতো ব্যবহারের সূচনা হচ্ছে।

জানা অজানা

১। নতুন পেনের নাম কি ?

২। কি আবিষ্কার করে ভট্টর পল মুলার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

৩। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সংখ্যা কত এবং নবীনতম সদস্যরাষ্ট্র কোনটি ?

৪। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 'টিনি' পুরস্কার দেওয়া হয় কেন ?

৫। সম্প্রতি ভেঙ্কটরাঘবন অনুষ্ঠিত এশিয়ান ভলিবল প্রতিযোগিতায় কোন বিজয়ী হয়েছেন ?

উত্তর

[illegible]

যেন ভুলে না যাই

রামি ছাবরা

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন : "আমি তো বলি জনসংখ্যার সমস্যা তত্ত্বমাত্র একটি গুরুতর সমস্যাই নয়, বরং দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা।"

ভারতের ক্রম বিস্ফোরিত জনসংখ্যার সঙ্কট সচেতন নেতৃবৃন্দ অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলে সেই ১৯৫২ সালেই ভারত বিশ্বের প্রথম কয়েকটি দেশ হিসেবে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে এক সরকারী কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই সিকি শতাব্দীর বেশী প্রচেষ্টায় সমাজের কুসংস্কারের অন্ধকূপ থেকে এই স্পর্শকাতর বিষয়কে প্রকাশ্যে টেনে আনা ছাড়া মোট ফলশ্রুতি কি? বড়জোর খাঁটী প্রতি তিন সেকেণ্ডে অতিরিক্তের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ানোর জন্যে এদেশে দুটি নতুন মুখের জন্ম হচ্ছে। এ সত্ত্বেও, কর্মসূচীর সূচনা থেকে আজ অবধি আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে এক সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসংখ্যার সমান এবং প্রতি বছরই যোগ হচ্ছে মোটা অস্ট্রেলিয়ার সমান জনসংখ্যা। এখন ন্যানখাদ অঙ্কিত সর্বনাশা দৃশ্যপটের দিকে অপ্রতিরোধনীয় গতিতে এগিয়ে চলার প্রবণতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আজও রয়েছে।

এবং এই গতি শুধু অপ্রতিরোধ্যই নয়, গতির তাল যেন এখন আগে বেড়ে গেছে। এই বর্তমান মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন এক সঙ্কটজনক সময়ের সব প্রতিরোধই ভেঙে পড়েছে। ঠিক যখন আমরা বিংবিংশতের কিনারে বিপদাপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, যখন অগ্রগতির ছায়া এক নজির সৃষ্টি করতে চলেছে তখন দেশের জন্মহার সূচিত করছে এক উর্ধ্বমুখী গতি। জন্মহারের যে চিত্রলেখ (গ্রাফ) একটু নিম্নমুখী হয়েছিল, যদিও তা তেমন আশাপ্রদ ছিল না, তার মুখ ঘুরে গিয়ে উর্ধ্বমুখী বাঁকুনির আবর্তরেখা উঠে গেছে। এই প্রতিক্রিয়ার কারণগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের আতসকাঁচের মধ্য দিয়ে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অবশ্য এই বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণই হলো আসল সত্য। জরুরী অবস্থার ঘাড়ধাক্কির ফলশ্রুতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জরুরী অবস্থা উত্তরকালের পরস্পর বিপরীতধর্মী মনোভাব ও উদাসীনতা যা জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ের তথাকথিত স্পর্শকাতরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। এই যৌথিক বিশ্লেষণ নাম ত্রিকোণের যে ক্ষতি করেছে তা অপরিসীম।

অতএব আমাদের মাথার ওপর এক সঙ্কট এসে উপস্থিত। কিন্তু সঙ্কটের সংজ্ঞা কি? এটি জেনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন কালের চীনারা তাদের অতি প্রাকৃত প্রজ্ঞায় এই শব্দটির কোন বিশেষ চরিত্র (প্রকৃতি) সৃষ্টি করেনি। তার বদলে চীনা ভাষায় এই শব্দটির প্রতিরূপ হলো সমযুক্ত দুটি প্রতীক : বিপদের প্রতীক আর সুযোগের প্রতীক। আর তার মানেও হলো অন্তর্নিহিত : সঙ্কট হতে পারে এক বিভীষিকা নাম আলো বা সর্বনাশ সূচিত করে অথবা থাকতে পারে এক সুবর্ণ সুযোগের ইঙ্গিত যা সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। আমরা কোনটা বেছে নেবো?

এই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনও আমাদের। নির্বাচন যুদ্ধে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টির প্রচণ্ড রাজনীতিকরণের জন্যে এই কর্মসূচীর প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিপরীত, তবু এ কর্মসূচী সম্পর্কে এক প্রচণ্ড সচেতনতারও সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতিপূর্বে সমাজের সর্বস্তরে কখনই ছিল না। গুজব, গল্প এবং কুৎসা হয়তো ক্ষতি করেছে অনেক কিন্তু তারা 'সন্তান হলো ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ'—এই বাস্তবতা আমাদের মনীষক ওতঃকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছে। জনগণ অন্তত একটু জেনেছে যে, মানুষের হস্তক্ষেপ সম্ভব। এখন আমাদেরই এই গণসচেতনতার জোয়ারে প্লাবিত হবার বদলে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজে লাগাতে হবে। আমরা তা পারি, যদি একটি কঠিন রাজনৈতিক এবং জাতীয় সদিচ্ছা থাকে যা বাইরের কোন টানে বিপথগামী হবে না।

দেশে এখন এমন উপ-কাঠামো গড়ে উঠেছে যা লক্ষ লক্ষ দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার সাহায্য জোগাবার মতো বিশাল ভার গ্রহণ করার উপযুক্ত। অবশ্য এখনও অবধি যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা অতীতীন সমুদ্রের মতো ব্যাপক প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তথাপি এই প্রচেষ্টাকেও ছোট করে দেখা যায় না। যদিও ভারতের প্রয়োজন ও সমস্যার ব্যাপ্তির তুলনায় এই সাফল্য এক অনুবীক্ষণী উদ্ধৃতাংশ মাত্র, তথাপি বলতে দ্বিধা নেই, জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ যারা ইতিমধ্যে বেছে নিয়েছে তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

কর্মসূচীর সূচনা থেকে ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁরা অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তাদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ছুঁয়েছে। অর্থাৎ এ হার হল প্রতি ১০০০ জনে ৪৪ জন। সত্তরের দশকে বেশী মহিলা নুপ ধারণ করেছেন এবং প্রায় পাঁচ কোটি লোককে অন্যান্য প্রচলিত গর্ভনিরোধক পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সংখ্যাটা খুব সামান্য নয়। এ ছাড়া এই প্রচেষ্টায় বিগত সিকি শতাব্দী ধরে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ জন্ম রোধ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আর একটি সোভিয়েট বা আর একটি স্পেন বা আর একটি দক্ষিণ কোরিয়ার সমান জনসংখ্যা সংযোজিত হতো যদি-না এইটুকু সচেতনতারও জনবলে না আসতো। প্রশাসনিক কাঠামোর আত্মতুষ্টির মনোভাবকে মার্জনা করার প্রচেষ্টায় এই সব পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হচ্ছে না, বরং যে ভিতের ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছি তা জানার জন্যেই এর উল্লেখ প্রয়োজন। এ থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এখন থেকে আরো সুসংহত ও নিবিড়ভাবে এই কর্মসূচীর রূপায়ন সম্ভব।

বর্তমানে প্রজননশীল বয়সের মধ্যে আছেন ১০ কোটি ৭০ লক্ষ দম্পতি। যাঁদের অস্ত্রোপচার হয়েছিল এবং যাঁরা নুপ ধারণ করেছিলেন তাদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় বা মৃত্যুর ফলে, অথবা নুপ বেরিয়ে যাওয়া বা বের করে নেওয়া আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে নানা অঘটনের ফলে আজকে আমাদের দেশে বাস্তবিক সুরক্ষিত দম্পতির হিসেব হবে প্রায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ বা দম্পতি গোষ্ঠীর ২২'৩ শতাংশ। যেখানে অস্ত্রোপচার এবং ধারার ঘড়ি ১০০ শতাংশ কার্যকরী বলে ধরা যায়, সেখানে নুপ ৯৪ শতাংশ কার্যকরী এবং প্রচলিত গর্ভনিরোধক সুব্যাপি মাত্র ৪০ শতাংশ।

১৯৭৮-৮৩ সালের জন্যে পঞ্চম পরিকল্পনার ঘোষণা অনুসারে আমাদের লক্ষ্য হলো ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে

প্রজননশীল দম্পতিদের মধ্যে ৬৫ শতাংশকে গর্ভনিরোধের নিশ্চয়তা দেওয়া। এর ফলে আমরা জন্মহারকে প্রতি ১০০০-এ ৩০-এ নামিয়ে আনতে পারবো। এই লক্ষ্য ইতিপূর্বে পঞ্চম পরিকল্পনার জন্যে ধরা হয়েছিল। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার কাজের ক্ষেত্রে বাধার ফলে তা চার বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা অতি সাধারণ, কেননা এটি অনেক আগেই অর্জন করা উচিত ছিল। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে, এটি একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সাফল্য প্রায় দ্বিগুণ করা হবে। এই সময়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে গর্ভনিরোধ, ৫০ লক্ষ মহিলার চুল বাধন ও প্রতি বছর আরো ৫০ লক্ষ লোকের জন্য সাধারণ জন্মনিরোধক পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পরিকল্পনার শুরুর আগে এমনও যে, বর্তমানে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যানুপাত যা আছে তাতে প্রজননশীল মেয়েদের অনুপাত আগামী বছরগুলিতে বেড়ে যাবে। এখন প্রতি বছর ছয় লক্ষ দম্পতি প্রজননশীল বয়সীমা পার হচ্ছে, কিন্তু ২০ লক্ষ প্রজননক্ষম নতুন দম্পতি সংযোজিত হচ্ছে এবং ১৫—২৪ বয়সীমার গর্ভধারণ ক্ষমতা ৪০-৪৪ বয়সীমার মহিলার তুলনায় তিনগুণ। অতএব, দেশে মোট সন্তান জন্মের এক ক্রমবর্ধমান চাপ সর্বদাই থেকে যাচ্ছে।

আমরা সচরাচর বলে থাকি যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু বর্তমানের অনিয়ন্ত্রিত প্রজননের অধিকতর ভয়াবহ ফলশ্রুতি হিসেবে জীবন ও স্বাস্থ্যের যে অবক্ষয় হচ্ছে সেই সম্পর্কে খুব কম লোকই ভেবে থাকেন। ভারতে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার মায়ী প্রাণ হারান প্রসবাগারে। তাছাড়া সরকারের এক অনুমানে অর্থাৎ ২৫ লক্ষ শিশু জন্মের এক বছরের মধ্যে মারা যায়। শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণ হ'ল, ক্ষেত্র, সুযোগ-সুবিধা, পুষ্টি এবং যত্ন। যা তাদের জন্মগত অধিকার তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। এও ঠিক, এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্যে অদূর ভবিষ্যতেও এই সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে, নারী এবং শিশুর অবস্থার উন্নতি একমাত্র পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব। এই জরুরী প্রয়োজনের স্বীকৃতি না দেওয়া হলে নারী স্বাস্থ্য ও আমূর্ধাতিক শিশু মৃত্যু উদ্বেগজনক ভাবে অর্থহীন ফাঁকা অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবে।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হল দ্রুতগতিতে পরিবার পরিকল্পনার কাজে পুরুষদের সহযোগিতা প্রায় অনুপস্থিত। আজকে দেশে যে পরিমিত সংখ্যক অস্ত্রোপচার হচ্ছে তার মধ্যে ৯০ শতাংশই হলো টিউবেকটমী। মহিলাদের পক্ষে এটি একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি। যদিও টিউবেকটমী হলো

স্বাস্থ্যকর্মী পারিশ্রমিক অস্ত্রোপচারে ইনসেনটিভ

ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমিতে মাধ্যমীদের অস্ত্রোপচারের জন্য যেসব ব্যক্তি নিয়ে আসবেন তাদের ইনসেনটিভ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। অস্ত্রোপচারের পর উৎসাহদাতাকে প্রতি ভ্যাসেকটমির ক্ষেত্রে ৫ টাকা এবং টিউবেকটমির ক্ষেত্রে ৩ টাকা দেওয়া হবে। যে সব অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা স্থানীয় সংস্থা এক্ষেত্রে উৎসাহদাতাদের টাকা দেবেন তা পরিশোধ করা হবে।

সরকারী কর্মী (পুলিস দপ্তর ও সরকারী স্কুল শিক্ষক বাদে) মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মী, জনস্বাস্থ্য কর্মী, এবং সমবায় সমিতির কার্যনির্বাহকদের ক্ষেত্রে এই টাকা দেওয়া হবে না।

একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যা অনেক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে হয়, বিশেষকরে যদি সন্তান প্রসবের পরেই করা হয়। কিন্তু এটি এমন এক পদ্ধতি যাতে হাসপাতালে রাখার এবং অস্ত্রোপচার করার জন্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রয়োজন হয়। শহর এলাকায় এবং জেলা হাসপাতালগুলিতেই টিউবেকটমী সম্পাদিত সবত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। এব এলাকাগুলিতে এই সব সুবিধা পাওয়া যায় না। অথচ সেখানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের প্রয়োজনীয়তা হলো সব চাইতে বেশী। তুলনামূলকভাবে, ভ্যাসেকটমী অস্ত্রোপচার শুধু সহজ করাই সহজ নয়, এতে খরচও কম লাগে এবং এতে স্বাস্থ্য এবং জীবনের কোন ঝুকিরও বিশ্লেষণও নেই। একমাত্র এই ভ্যাসেকটমী অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই দেশের পক্ষে জনসংখ্যার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। লোকসায়ক প্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও বলেছেন যে, পুরুষের নৈতিক দায়িত্ব হল প্রজননশীলতা নিয়ন্ত্রণের ভার সমানভাবে মায়ীর সঙ্গে বহন করা।

সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাধীনভাবে সমর্থন করেছে। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, পরিবার পরিকল্পনাকে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট পূর্বশর্ত ধারণার এক অংশ হিসেবে দেখতে হবে এবং অন্য সব কল্যাণমুখী প্রকল্পের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করতে হবে যাতে সন্তিকারের মানুষের কল্যাণে এই কর্মসূচীটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রাক্তন নীতির সঙ্গে বর্তমান নীতির পার্থক্য হল, এই নীতিতে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য রয়েছে সারাদেশ জুড়ে সেবা ব্যবস্থা : ৬৩৫২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩৯,০০০টি উপকেন্দ্র, প্রায় ১৮০০টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩২৪টি প্রসবোত্তর কেন্দ্র।

মাধ্যমিক ও সবটি উচ্চ পর্যায়ের জননেতা ও জনমত সংগঠকদের মত দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কাঠামোকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তাঁরা জনগণ তথা দেশের আজ যা সর্বাধিক প্রয়োজন সেই প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। আজকের এই সঙ্কটকে তাৎক্ষণিক বিপদের থেকে একটি চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত করবার সুযোগ এখনও আমাদের হাতেই আছে। এই চ্যালেঞ্জই একটি নৈতিক বিপ্লবের প্রতি জাতীয় চেতনা গড়ে তুলবে। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে দীর্ঘসূত্রিতা এখনও যদি চলতে থাকে তবে অনিবার্যভাবে আমরা এমন একটি প্রজন্ম বলে চিহ্নিত হব যে প্রজন্ম নিজেদের প্রতি তাদের কর্তব্যেই শুধু অবহেলা করেনি, অন্যান্য যাদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব তাদের হাতে ছিল সেই দায়িত্বও তারা পালন করেনি।

গ্রাম বাঙলার কড়চা

ধনেখালির শাড়ি

ধনেখালির নাম শুনলেই মনের বীণায় গুনগুনিয়ে ওঠে :

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

কোন রূপসীর অঙ্গ ঘিরে নীল শাড়ির বাহারে ঐ একই গানের কলি ভেসে ওঠে সুবর্ণরেখা। হুগলী জেলার চুঁচুড়া সদর মহকুমার এই ছোট্ট গ্রামটির নাম কে রেখেছিল ধনেখালি? হয়তো তখন ধনেখালির তাঁতের শাড়ির তত কদর ছিল না। ধনেখালির শাড়ি কবে থেকে "হুগলী পহন" হল, ইতিহাসে তার সন-তারিখের উল্লেখ নেই। কিন্তু জানি না, এরূপ সুতোর বস্ত্রাকাটা ধনেখালির শাড়ি বিদেশ বাণিজ্যে উপহার পেয়ে আত্মহারা হন না কোন ধনি বণিনী। এই শাড়ির জন্যেই ধনেখালির আজ জগৎ-জোড়া নাম। শুধু বিদেশী মোহাই ব্যাপার নয়, ধনেখালির শাড়ির চাহিদা দক্ষিণেও প্রচুর। ইউরোপ আমেরিকার প্রবাসিনী ভারত ললনারা ধনেখালির শাড়ির দামে পাগলিনী প্রায়। তাদের শাড়ি তাই ধনেখালির ধনলক্ষ্মী-মনোলক্ষ্মী।

ধনেখালির শাড়ির জন্যেই আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ঘুরে আসি ধনেখালি থেকে। অবশেষে সুযোগ মিলল। আমার মনলের বিয়ে হয়েছে ধনেখালির মদন-মোহন তলায়। কার্তিক ঠাকুরের ভাসান্ দেখতে সে চুঁচুড়ো এসেছিল। ফেরার পথে সে আমাকে একরকম টানাটানি করেই নিয়ে গেল ধনেখালিতে।

কিন্তু আমি ধনেখালিতে গিয়ে কি দেখলাম? বলতে ইচ্ছে করে না যে ধনেখালি। না যে বর্ষাকালের ভেজা খালা চাল। না যে বর্ষাচোরা গ্রাম। চুঁচুড়া শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে ধনেখালি এক গঞ্জগ্রাম। শহর লেপিনাদী কলেজ এখানেই। শুনলাম শহর জন্মশতবর্ষে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীকৃপাসিন্ধু সাহার (এম এল এ) উদ্যোগে। এই গ্রামেরই তন্তুবায় পরিবারের শ্রীভোলানাথ রক্ষিত তাঁর আজন্মের সঞ্চয় লক্ষাধিক টাকা দান করেছেন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু থাক সে সব কথা। যে শাড়ি নিয়ে ধনেখালির নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে যায় সেই শাড়ি যাঁরা বোনেন, তাঁদের কথা কিছু বলি। ধনেখালির তাঁতীদের যে কে দুঃখ তা বুঝতে পারলাম বিশ্বনাথ সাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় হাটতলাতে, শাড়ির দোকানে। বছর যুবক। মিষ্টিভাষী। বেশিক টেবিং নিয়েছেন। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারির জন্যে কয়েক বছর বৃথা ঘোরাঘুরি করে শেষে 'ধুত্তেরি' বলে লেগে পড়েছেন তাঁত ব্যবসায়। বাড়িতে এখন ৩টি তাঁত চলছে। বাড়ির পুরুষ মানুষ সবাই তাঁত বোনেন। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সুতো পাট করা, এলীবাটা, চরকা কাটা—এসব কাজ তাঁরাই করেন ঘরকন্নার কাজকর্ম সামলে। তাঁতের যৌসতে সংসারের অবস্থা এখন মোটামুটি স্বচ্ছল। তিনি আমায় নিমন্ত্রণ জানালেন, তাঁদের তাঁতখানা দেখার জন্যে। সাদোরা সোনাপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। "তাঁতী বসে তাঁত বোনে"—সে দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। বেলার তাঁর সঙ্গে।

পথে অনেক আলাপ হল বিশ্বনাথ-বাবুর সঙ্গে। তিনি খুবই দুঃখ করছিলেন : ধনেখালির তাঁতের শাড়ির দিন বুঝি আর থাকে না। দু'হাজারের বত তন্তুজীবী বাস করেন ধনেখালিতে। কিন্তু হাদি আছে কজনার মুখে। বাজারে মোবেপ্রিন্ট নাইলন টেরিকট ভেজাল শাড়ির সঙ্গে ধনেখালির শাড়ির দারুণ প্রতিযোগিতা। বছর ও সুতোর দাম বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। সুপার আশি সুতোর বর্তমান বাজার দর ২২২ টাকা। কিন্তু বছর খানেক আগেও তা ২০৮ টাকায় পাওয়া যেত। ন্যায্য মূল্যে সুতো পাওয়াও যায় না অনেক সময়। সুতোর দাম যে হারে বেড়ে চলেছে সে তুলনায় শাড়ির দাম বাড়েনি। তাগিদা কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছিল তাই বক্ষে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন ধনেখালি এবং সোনাপুর টাইলার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির কথা। সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪১ ও ১৭০। সদস্য শিল্পীরা সোসাইটির দেওয়া সুতোর কাপড় বোনেন। একজন তাঁতশিল্পী সপ্তাহে ৪ থেকে বড়জোড় ৬টি কাপড় বুনতে পারেন। কাপড়ের মান অনুযায়ী মজুরি পান, কাপড় পিছু বোনাবুটি ৬ টাকা থেকে ৩৭ টাকা। কাপড় পিছু এক টাকা করে প্রোডাকশন বোনাস দেওয়া হয়। পুজোয় সবর অতিরিক্ত পুজো-বোনাস পান। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থাও আছে। তবু অবসরে কেরে অনেক তাঁতশিল্পী এখনও মহাজনের কাছে ঋণ নেন। অনেক কম মজুরিতে তাঁদের কাজ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দেন। ইচ্ছা থাকলেও কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য হওয়ার পথ বন্ধ।

ধনেখালি কি বনে যাবে?

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি থেকে বেরোনোর মিনিট ৩ পরেই। এলাকার এম এল এ কৃপাসিন্ধু সাহার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়। তাঁর মুখে শুনলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এখন তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি কাপড় কিনছেন। ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে যাতে ধনেখালিতে একটি শাড়ি উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন খুবই। তখন তাতের কাজ জানা অনেক বেকার ছেলেমেয়ে কিছু না কিছু কাজ পাবে। কৃপাসিন্ধুবাবু বললেন, শাড়ির মান উন্নয়নের জন্য ধনেখালিতে একটি ডিজাইন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার চেষ্টা তিনি করবেন।

ফেরার পথে মদনমোহন তলায় আলাপ হল শ্রীনবদু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বাবুনের ছেলে। কিন্তু বাড়িতে তাঁত আছে। তিনি তাঁতশিল্পী। নিজ হাতে কাপড় বোনেন। হঠাৎ তাঁতে মন বসল কি করে! বাবুনের ছেলে হবে? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে হাসতে হাসতে বললেন, আমার বাড়ি যে ধনেখালিতে।

লতিকা চক্রবর্তী

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
ঠাকুর্দা ঠাকুমা বুড়োবুড়ি
ছেলে বউ আর থোকাখুকি
দু'জন এরা কত সুখী

খেত খামার

সাধা ভাগতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার ওপরে। কিন্তু দুঃখের কথা, আমরা বীজের জন্য নির্ভর করে আছি অন্য প্রদেশের উপর। পাটবীজের সিংহ ভাগটাই আসে মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তর-প্রদেশ থেকে। এ নির্ভরতার ফলে আমরা সঠিক প্রজাতির ও উচ্চমানের বীজ পাচ্ছি না। বীজের সরবরাহ ঠিক মত হচ্ছে না। ফলে উৎপাদন মার খাচ্ছে। তাছাড়া একটা বিরাট অঙ্কের টাকা অন্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। অথচ একটু চেষ্টা নিলেই নিজের প্রয়োজন মত পাটবীজ নিজেই উৎপাদন করা সম্ভব।

বর্তমানে প্রচলিত পাটের উন্নত জাতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তেজো বা ওটি পাটের মধ্যে সোনালী (ডে আর সি ৩২১), চাকাই (ডি ১৫৪) সবুজ সোনা (জি আর সি ২১২), শ্যামলী (ডে আর সি ৭৪৪৭)।

তাছাড়া তোষা বা বিঁড়া পাটের মধ্যে উন্নত জাত হিসাবে আমরা পাচ্ছি চৈতালী (ডে আর ও ৮৭৮), বাসুদেব (ডে আর ও ৭৮৩০), বৈশাখী (ডে আর ও ৬৩২), নবীন (ডে আর ও ৫২৪)। এছাড়া আছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত নতুন জাতের পাট 'রূপালী'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খামার, পাট গবেষণা কেন্দ্র বা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত মানের পাটবীজ পেতে পারেন।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ

পাটবীজ তৈরী করার জন্য একটু উঁচু জমি বেছে নিতে হবে। সেচের সুবিধা থাকলে ভাল হয়। জল নিকাশের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি পাট চাষের পক্ষে ভাল। জমিতে আবর্জনা পচা বা গোবর সার দেবেন। তাছাড়া বিঘা প্রতি ৪০ কেজি মুক্তা (১৫ : ১৫ : ১৫) শেষ চাষের সময় দেবেন।

বীজ বোনার সময় ও পদ্ধতি

বীজ তৈরী করার জন্য জমিতে বীজ বুনবেন জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় মাসে। তবে বৃষ্টির অবস্থা বুঝে কয়েকদিন আগে পরে বোনা যেতে পারে। খুব বেশী আগে বুনলে গাছ লম্বা হয়ে যেতে পারে। তাতে গাছ কম বৃষ্টিতে পচে যেতে পারে

উন্নত জাতের পাট বীজ নিজেই তৈরী করুন

পাট বীজ ছিটিয়ে বুনতে পারেন। তবে লাইনে বোনাই ভাল। এতে পরিচর্যার সুবিধা হবে। তাছাড়া গাছগুলি সমানভাবে বাড়ার সুযোগ পাবে। একটি লাইন থেকে অন্য আর একটি লাইনের দূরত্ব রাখবেন দেড় ফুট। একটি গাছ থেকে আর একটি গাছের দূরত্ব রাখবেন ৪ ইঞ্চি। লাইনের দূরত্ব বেশী থাকার ফলে গাছের ডালপালা বেশী হবে। বিঘা প্রতি বীজের দরকার হবে ৪০০ গ্রামের মত। শোধন করা বীজ বোনা উচিত। বিড়াল বা চড়ুইদের দিয়ে আগাছা তুলে দিন। অন্য জাতের বিপরীত পাটগাছ জমিতে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলবেন। পাটগাছগুলি চার ফুটের মত লম্বা হবার পর গাছের মাথা কেটে দিন। তাতে গাছের ডালপালা অনেক বেশী হবে। গাছটি ঝাঁকড়া হবে। ফুল ফুটবে বেশী। বীজের পরিমাণও বাড়বে।

রোগ পোকা থেকে সাবধান

প্রতি কেজি বীজকে ৩ গ্রাম এগ্রোসেন জি এন দিয়ে শোধন করে বুনবেন। গোড়া পচা রোগ দেখলে গাছটি তুলে ফেলবেন। তোলা না হলে আগানীবার বীজের সঙ্গে এরোগ আসতে পারে। গাছে পোকা দেখা গেলে প্রতি লিটার জলে থায়োডেন ৩৫% দুই মিলি লিটার বা মেটাসিড ৪০% এক মিলি লিটার ভাল ভাবে গাছে স্প্রে করুন।

সংরক্ষণ : বীজ পাকলে গাছ কেটে নিন। পরিষ্কার ও শুকনো জায়গায় ঝাড়াই করুন। বীজগুলিকে ভাল করে রোদে শুকিয়ে ছায়াতে ঠাণ্ডা করুন। তারপর মোটা পেপের পলিথিন প্যাকেটে ভরে শুকনো জায়গায় রেখে দিন। পাটবীজের মোনার মরশুমে এই বীজ শোধন করে বুনুন। তাতে বীজের মান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবেন। ফলন বেশী পাবেন।

জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহিলা মহল

গ্রামের দিন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে লাগলো রোদ্দুরের তাপ। আমি আর মহেশ্বরপুর শিবদুর্গা সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমতী রেখা সেন শ্যামবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে ৯৩ নং বাসে রওনা হলাম। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের জার্নি শেষ হলো বারাসত জেলার বাদু গ্রামে। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সা চেপে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছুলাম মহেশ্বরপুর শিবদুর্গা সমিতিতে।

গ্রাম বাংলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকল্পে ১৯৬০ সালে প্রাক্তনী মেয়ের শ্রী শ্রীমতী বিভা ঘোষ অপরিসীম মনোবল নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এই সমিতি। বিভাদি বলছিলেন তখন চারিদিকে ছিল গভীর অন্ধকার। আপন পর সবাই নিরুৎসাহ করেছিল। কিন্তু আজ?

কয়েক বিঘা জমির ওপর আধুনিক প্রথায় নির্মিত হয়েছে চারটি অট্টালিকা। বিভাদি জানালেন, এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য জমি দান করেছে ওঁর ভাইয়েরা। এছাড়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিও খানিকটা জমি দিয়েছেন। সরকারী এবং বেসরকারী অনুদানে গড়ে উঠেছে এই গৃহগুলি। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির রেজিস্ট্রেশন হবার পর বিভাদি পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই বয়স্ক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রামের লোকেদের উৎসাহের অভাবে ৩১৪ বছর পর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে ওঁরা বাধ্য হন। ১৯৬৪ সালে প্রি-প্রাইমারী ও প্রাইমারী বিভাগ সরকারী অনুমোদন লাভ করে।

মহেশ্বরপুর শিবদুর্গা সমিতি

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রী সংখ্যা ৩০০। প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এই সমিতিতে শিক্ষা ছাড়া মেয়েদের কোনরকম হাতের কাজ শিখিয়ে অর্থকরী উপার্জনের পথ সুগম করে দিতে সহযোগিতা করেননি কেন? উত্তরে বিভাদি জানালেন, আসল অসুবিধে হচ্ছে বাজারের। গ্রামের মেয়েদের পক্ষে এতদূর থেকে কলকাতার মার্কেটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। তাই একমাত্র লেডী ব্রাবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স এবং তাঁত ছাড়া অন্য কোনরকম হাতের কাজ শেখাবার চেষ্টাই আমরা করিনি। কারণ এই প্রতিষ্ঠান গড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পল্লী অঞ্চলের মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

● ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রন্থ আলোচনা

আমার মাটি আমার। পরমেশ চৌধুরী। পরিবেশক। দে বুক স্টোর, কলেজ স্কোয়ার: কলিকাতা-৭০০০১২। মূল্য—৫০ টাকা।

পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ বিরল। শ্রীযুক্ত পরমেশ চৌধুরীর এই গ্রন্থ সে বিষয়ের কিছুটা অভাব পূর্ণ করেছে। প্রচুর বানান ভুল কণ্টকিত ও প্রকাশভঙ্গির কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা সত্ত্বেও এই অ-সাধারণ গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল নানা দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান-তৎপরতায় আলোচ্য বিষয়ে আগ্রহী ও অনাগ্রহী সকলের পক্ষেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত :—(১) গ্রন্থের পাঠ আবশ্যক, (২) বীভৎস নগর নগরী, (৩) প্রকৃতির ছাড়পাবার, (৪) বিষাক্ত জল, (৫) বিষাক্ত বেষ্টন, (৬) প্রতিকার, (৭) এ বাহিক সভ্যতা পাল্টাতে হবে এবং (৮) চাই একটি সুন্দর সুস্থ সভ্যতা। এ থেকেই উপলব্ধি করা সহজ হবে তিনি তাঁর বক্তব্য কিভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। আধুনিক মানব সভ্যতা যতই এগিয়ে চলেছে ততই সে চারিদিকে প্রকৃতির সহজ সরল সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন বৈশিষ্ট্যের বিরোধী কর্কশ যান্ত্রিকতা ঘুলিপঙ্কিল মলিনতা এবং রূঢ় রুক্ষ সুষমাহীন নির্মমতাকে চক্রবৃদ্ধি হারে বর্ধিত করেছে। লেখকের মনে এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে উঠেছে। শেষ পরিচ্ছেদে লেখক বলতে চেয়েছেন পৃথিবীর সব দেশই পরিবেশবিকারে রোগে ভুগছে। অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে মনুষ্যজাতের সঙ্কট। বিশ্বের নানা মনীষীর চিন্তার এর সমাধান খুঁজতে চেয়ে, অবশেষে ভাবতে ভাবতে পৌঁছেছেন প্রাচীন ভারতের প্রেয়োবোধে বিশ্বশ্রেয়বোধে। গ্রন্থটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়।

আমরা আছি—সুব্রত।—বিমল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক। এবং, ১৯/২: শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩০০৭৩। মূল্য—দুই টাকা।

আদিবেয়ার কামু জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা নিরর্থকতা বোঝাতে গিয়ে আধুনিক দার্শনিক অর্থেই 'Absurd' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। Absurd theatre তথা উদ্ভট নাটকের ক্ষেত্রে শ্যামুয়েল বেকেট ও ইউজিন ইয়োনেস্কো—দুজন প্রতিভাশালী নাট্যকার। এ ঐতিহ্য এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার।

প্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই নাট্যকাব্যে জীবনের অনিবার্যতা, অনিকেত প্রতিপীড়ন অথচ নিস্তরঙ্গ দৈনন্দিনের অবসাদ ও বিকার জনিত একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাবার জন্য পরিত্রাণহীন যন্ত্রণা মানবের করুণ নিয়তিতে রূপায়িত হয়েছে। বর্তমান কাঁপা জন্য জীবনের ক্লান্তি তিক্ততা বিপন্ন অস্তিত্বের বিষয়ে এবং জটিল মানসিক অবদমন হেতু গ্লানি পুঞ্জীভূত থেকে মুক্তিস্পৃহাকে করেছে ভারাক্রান্ত।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে নানা উদ্ভট শব্দসংবেশে গ্রন্থটি রচিত। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যঙ্গ স্বরপ্রয়াস সর্বত্র স্মৃতিসুখকর হয়নি। লেখক ব্যাকরণের রীতিনীতি মানেন নি। যেমন ১৫৭। অসতীর এবং ঊষা অন্ধকারের-যোগ্য।

প্রেমেন্দ্র সিংহরায়

পত্র-পত্রিকা

আর্যাবর্ত। ৩৯তম বর্ষ; দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা। সম্পাদক : নরেশ বিশ্বাস। ৩৪, রবীন্দ্রসরণি ব্লক থেকে, কলিকাতা-৩৩। মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রয়াত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের একটি অপ্রকাশিত কবিতা আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। 'বৈকালী' জীবনসায়াহ্নে উপনীত কবির যাথার্থীন ভাবনার অপরূপ রূপ। মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, নবেন্দু চৌধুরী ও মহাদেব রায় যথাক্রমে রিলকে, এলেনস্টাইন ও ঘসোটির কবিতার অনুবাদ ক'রেছেন। প্রথমোক্ত দুই কবি উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে মূল কবিতার ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ করাসী কবি ও সমালোচক শার্ল বোদলেয়ারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষিত পাঠক আজও যথেষ্ট কৌতূহলী। বিজয় মেহের বিবৃত 'শার্ল বোদলেয়ার : জীবন ও বাক্তি' সেই কৌতূহল চরিতার্থ করবে। প্রসঙ্গক্রমে বোদলেয়ারের কবি স্বভাবের বিশ্লেষণ আলোচনাটিকে উত্তীর্ণ করেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা, জীবন দর্শন, সাহিত্য-বিন্যাস ইত্যাদি নিয়েই সলীল বিশ্বাসের 'বাক্তি'। বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে লেখকের অধিগত নয় বলেই আলোচনাটি অসংলগ্ন।

কোরকিয়ার সাহিত্যসংখ্যা পাঠান। পঞ্চম বর্ষ. দ্বিতীয় সংখ্যা। সম্পাদিকা : বাসন্তী চক্রবর্তী। কোরকিয়ার সাহিত্যসংখ্যা। জলপাইগুড়ি জিলা। কোরকিয়ার। মূল্য : এক টাকা।

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সকলের গোচরে আনাই পত্রিকাটির লক্ষ্য। এবারের সংখ্যায় জনৈক নামগোত্রহীন কবির রচনা নৃপেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় 'লক্ষ্মী চরিত্র' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ বিমলেন্দু দাস লিখিত তথা সহযোগে 'কোচবিহার রাজসভার কবি পীতাম্বর' সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। ফুলিয়ান গাউডের 'হলং নদ' গল্পের কোহেন যেমন পরিচ্ছন্ন গ্রন্থন-উপাখ্যান। লেখকের চিত্রধর্মী রচনারীতির গুণে হলং-এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য থেকে পাঠকও বঞ্চিত হবেন না।

এষণা। দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। সম্পাদক। পুলক দেবনাথ। নিবাস পল্লী, পোস্ট হৈদচক-৭৪০১৪৪. চব্বিশ পরগনা। মূল্য। চল্লিশ পয়সা।

কবিতার শোভাযাত্রায় দীপঙ্কর বিশ্বাস, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও ভূপতিনাথী কবি মপাসাঁকের ছাড়া অন্যরা অবলীলায় হারিয়ে যাবেন। পুলক দেবনাথের 'সন্ধি' ঠিক গল্প নয়, গল্পের স্কেচ মাত্র। ভিক্টোরিয়ার মতো জটিল সমস্যাকে অতিমাত্রায় সরলীকৃত করায় লেখকের জীবনদৃষ্টির অস্বচ্ছতাই পাঠকের চোখে ধরা পড়বে।

মন মনুকরে। জানুয়ারি, ১৩৮৫। সম্পাদক : প্রবীর বিশ্বাস। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মূল্য : পাঁচ টাকা।

'মন মনুকরে'র পায়ন-সংকলন ছোটগল্পের সমৃদ্ধ। নির্মল গুপ্তের 'খালি বোতল' একটি ভেবেও গল্পের অনুবাদ। স্কৌনীশ বাগচী কৃষ্ণ চন্দরের একটি গল্প ভাষান্তরিত করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদ স্বচ্ছন্দ নয়। দেবকুমার বোষের 'সুখের সাধিরা'—'faithless coldness of the time' হলেও নিষ্প্রভ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নিরিপল্প 'সেই বাদামওয়ালা' চমৎকৃত করার ক্ষমতা রাখে।

সুশোভন দত্ত

সংবাদ

গ্রামে গ্রামে পানীয় জল

১৯৫৩ থেকে ১৯৭৭ এই ২২ বছরে আমাদের দেশের প্রায় ৫ লাখ ৭১ হাজার গ্রামের মধ্যে মাত্র ৬৪ হাজার গ্রামে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। লোক সংখ্যার হিসাবে আমাদের দেশের মোট ৪৪ কোটি গ্রামীণ অধিবাসীর মধ্যে পড়-কড়া মাত্র দশ ভাগ লোক গ্রামে পানীয় জলের সুযোগ পেয়েছেন।

আমাদের দেশের প্রায় ৮ লাখ লোক হরত প্রয়োজনমত জল পান কিন্তু সেই জল স্বাস্থ্যকর নয়। আবার ১ লাখ ৮৫ হাজার গ্রামে পানীয় জল অপ্রতুল এবং অস্বাস্থ্যকর। আর দেড় লাখ গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সব গ্রামে পানীয় জল আনতে হয় মাইলের পর মাইল দূর থেকে। আর ঐ জল দূষিত।

১৯৭৭ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জলসরবরাহ প্রকল্প সৃষ্টির দিকে গভীর মনোনিবেশ করেছেন। আর এই প্রকল্প নূনতম চাহিদা কর্মসূচীর অন্তর্গত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে ১৯৭৭-৭৮ সালে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ৪০ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ফলে এক বছরে ১৬ হাজার গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে আরো ২৭ হাজার গ্রাম এর আওতায় আনা হয়েছে। বাজেটে এর জন্য ৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নতুন রেলযোগাযোগ

যোজনা কমিশনের রেল কমিটি উত্তর পূর্বাঞ্চলে নতুন রেল সংযোগের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করেছেন। সরকার স্থির করে-ছেন ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালেই রেল সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। প্রস্তাবিত এই রেল কার্যগুলি হ'ল—ধর্মনগর-কুমার-ঘাট, লৌয়াটি-বাগিহাট, শিলচর-ভিরিয়ান, বাগিপাড়া-ডানুকং, আমবুড়ি-তুলি, লালা-ঘাট-তৈরবী। এই প্রকল্পগুলির জন্য মোট ৫০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে।

এক লক্ষ নতুন টাচ-টেলিফোন লাইন

ডাক ও তার বিভাগ ১৯৭৮-৮৩ সালের মধ্যে বাড়তি এক লক্ষ স্বয়ংক্রিয় ট্রাঙ্ক টেলিফোন সংযোগের এক পরি-কল্পনা নিয়েছেন। চলতি মার্চ মাসের শেষাশেষি নাগাদ স্বয়ংক্রিয় ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ১৮ দাঁড়াবে এবং এগুলি থেকে দেশের ১০০টি বড় শহরে এস টি ডি টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা হবে। চলতি আর্থিক বছরের শেষে মোট ৩৭ হাজার স্বয়ংক্রিয় ট্রাঙ্ক-টেলিফোন লাইন সংযোগ দেওয়া হবে।

গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট তৈরীর জাতীয় প্ল্যান

গ্রামের সঙ্গে প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাজার হাটের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি সাধনের এক মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর জন্য কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলির পরামর্শ দিয়েছেন। রাস্তাঘাটের মোট চাহিদা ও টাকার পরিমাণ এই মাষ্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এজন্য ১৫ বছর মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮-৮৩ পঞ্চম পরিকল্পনায় দেড় হাজার ও তার বেশী জনবসতির সমস্ত গ্রাম এবং এক হাজার থেকে দেড় হাজার জনবসতির প্রায় অর্ধেক গ্রামের সঙ্গে ১৯৮৩ সালের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার জনবসতির বাকী অর্ধেক গ্রামে সপ্তম পরিকল্পনায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে

গত বছর এপ্রিল-ডিসেম্বরে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৮·৮৯ শতাংশ বেড়েছে। এই নয় মাসে ৭৬৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। ১৯৭৭ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৬৭৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে বেড়েছে—দক্ষিণাঞ্চল ২০·৩৬ শতাংশ, উত্তরাঞ্চল ২০·৯ শতাংশ, উত্তর পূর্বাঞ্চল ১১·১৭ শতাংশ, পশ্চিমাঞ্চল ৭·৬৫ শতাংশ এবং পূর্বাঞ্চল ৩·৭৭ শতাংশ।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারী-মার্চের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারী-মার্চে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১১·৩৩ শতাংশ বেড়ে ২৭২৮ কোটি ৬০ লক্ষ ইউনিট হবে বলে আশা করা যায়। এবং ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বছরের তুলনায় চলতি ৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১২·৬ শতাংশ বেড়ে মোট ১০,৩৭৫ কোটি ৪০ লক্ষ ইউনিটে দাঁড়াবে।

মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনে ইনসেনটিভ

মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনে মানুষের উৎসাহ দেখার জন্য সরকার কয়েকটি সুযোগ সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মিনি সিমেন্ট কারখানায় উৎ-পাদন ক্ষমতা দৈনিক ২০০ টন অথবা বছরে ৬৬,০০০ টন পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হবে।

সাহসিকতার জন্য শিশুদের জাতীয় পুরস্কার

প্রতিবারের মত এবারও সাহসিকতার জন্য ছয় বছর থেকে ১৬ বছর বয়সের ১৬ জন ছেলেমেয়েকে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এরা হ'ল রবিন্দ্র মোমোই, এ মোহম্মদ, এম বালকৃষ্ণন, কে বিনোদ, রাজেশ্বর প্রসাদ, চন্দ্রভানু সিং চৌহান, মদনমোহন, কুমারী আশালতা দেবী, পাতিল মহেশ পাণ্ডুরাং, রাজেন্দ্র তোষিদাস রানে, মহেশ অর্জুন পাতিল, কুমারী সুষমা কুলকারণি, আর আয়া রানিয়া, দীপক কুমার, মনিতা কুমারী কলিতা এবং দিলীপকুমার দীনাজলাল চৌধুরী।

উন্নতির ছোঁয়া সমবায়

শুরু অল্প দিয়ে। ফলেও আন্তরিকতার থাকলে যে একটি প্রতিষ্ঠান বিরাট আকার নিতে পারে মেদীয়া জেলার দাতনা সবল কৃষি উন্নয়ন সমিতি এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৭ সালে এই সমিতি ১৬১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সেসময় মূলধন ছিল ২,৪০০ টাকা। উদ্দেশ্য কৃষক-দের সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করা। এই সমিতি গঠিত হবার পর দশ বছরে ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের ২৫,০০০ টাকার শস্য ঋণ দেওয়া হ'ল। যদিও প্রথম প্রথম বাধা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাই বলে লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কাজ থেমে রইল না। সমিতির কার্যকর্মে কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হতে লাগল এবং মূলধনী অংশ বেড়ে দাঁড়াল ৪৮,০০০ টাকায়। গত বছর সমিতি ৩৫০ জন ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের ২ লাখ টাকার শস্য ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে সমিতি সার, কীট-নাশক ওষুধ, কাপড়-চোপড়, কেরোসিন প্রভৃতি দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির জন্য দোকান খুলেছেন। শিক্ষিত বেকার যুবকরা এগুলিতে চাকরীর সুযোগ পাচ্ছেন। সমবায়ের মাধ্যমে এরকম পরিবর্তনে অন্যান্যরাও অনুপ্রাণিত হবেন।

শিল্প সংস্কৃতি

ফেব্রুয়ারি (১৭৩৩) মাসের পর ইংরেজদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল এদেশের ভাষাটাকে চটপট শিখে ফেলার। মাঝে নির্দিষ্ট কোন ব্যাকরণগত আদর্শ না থাকায় অসুবিধে হচ্ছিল পদে পদে। এ অবস্থায় অগ্রণীর ভূমিকা নিলেন ব্রেজ রাজপুরুষ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। ছাপার হরফ তৈরী করতে এগিয়ে এলেন উইলিয়ম বোল্টস। কিন্তু হরফ তৈরী করে তার ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। সাধনাতে না পেরে শেষে অবশেষে বিরত হতে হল। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানীর আর এক সিভিলিয়ান চার্লস উইলকিন্সের অধীনে অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তৈরী হল বাংলা হরফ। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন অভিজ্ঞ মুদ্রণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। প্রকাশিত হল বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ—'গ্রামার অব দা হিন্দু ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)। হ্যালহেডের পুরো বইটা ইংরেজীতে লেখা হলেও উদাহরণে ও উদ্ধৃতিতে এদেশে ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষার সেই প্রথম ব্যবহার দেখা গেল। এর পর পরই ছাপা হল কয়েকটি ছোটখাটো বই বাংলা হরফে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর ফরস্টারের ইংরেজী বাংলা ডিকশনারি। ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষার প্রথম যুগের ইতিহাস এইটুকুই। তারপর মঞ্চে এলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। সে খবর তো অনেকেরই জানা।

সম্প্রতি বাংলা মুদ্রণের সেই দু'শো বছর মাসেকাল জনজীবনকে মুখর করে রেখেছিল এক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের উদ্যোগিকের সহযোগিতায়। এই উপলক্ষে পুরোনো দুষ্প্রাপ্য সব বই, পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ ও ছাপার হরফাদির এক বিচিত্র ও অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিল নতুন বইয়ের বইবেলা ও আলোচনাসভা। চলেছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে উৎসব কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষার জন্মকাল থেকে শুরু করে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য কোথায় এবং কতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা সপ্রমাণ দাখিলিবরণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে। সে চেষ্টায় তাঁরা অনেকাংশে সার্থক হয়েছেন বলা যেতে পারে।

কাজের সুবিধের জন্য প্রদর্শনীকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একভাগে বই ছাপানোর যন্ত্রপাতি, অন্য ভাগে পুরোনো বই, পত্রপত্রিকা ও পুঁথির

পুরোনো বই, পুরোনো দিন

মূল্যবান সংগ্রহ। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেশী বলে মনে হয়েছে। গ্রাহুবী লিপি থেকে বাংলা ভাষা কিভাবে তৈরী হল বা প্রাথমিক অবস্থায় হরফ করেছিল বাদ্য সাহিত্যে টাইপ হল তার প্রতিটি স্তর চোখের পরে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাংলা ভাষাকে মুদ্রণের জন্যে যেদিনকার সাহেবরা যে কি পরিশ্রম করেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁদের ইংরেজী বাংলা অভিধানগুলি দেখলে। Difficult-এর বাংলা আমরা যাই করি না কেন সাহেবরা তার মানে করেছেন 'বাহুড়া'। glad-এর বাংলা 'আনন্দিত' ঠিকই কিন্তু উচ্চারণের সুবিধের জন্যেই বোধ হয় পাশে ছোট্ট করে লেখা 'anandit'। বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্যে তাঁদের সরকার হয়েছিল বাংলা প্রবচনের (Proverb) বই।

ক্রমবিকাশের পথে বাংলা ভাষা যে বিভিন্ন স্তরের রচনার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল তার জীবন্ত প্রমাণ এখানকার প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, পাঠ্য ও শিশুপাঠ্য পুস্তক, পত্রিকা সাহিত্য, ঘটতলা সাহিত্য ও বিষয়ভিত্তিক বইয়ের অমূল্য সংগ্রহ। এর মধ্যেই চোখ টেনেছে প্রবেশ দ্বারের ভারতবর্ষের ইতিহাস, শৈশবের স্মৃতিবাহী ধারাপাত, প্যারীচরণের ফার্স্টবুক, স্ত্রী শিক্ষার মুকুল নিয়ে লেখা ঘটতলার নাকোমারা উপন্যাস ও মুদ্রণ-পূর্ব যুগের একটি হাতে লেখা পত্রিকা। তাছাড়াও একান্তরা সালের দ্বিতীয় সংস্করণ সীতাহরণ ও প্রথম সংস্করণ কবি ও কোরান বা রাজকাহিনী আমাদের কম অবাক করেনি। তবে সবচেয়ে বেশী তোষে ছিলেছেন বোধহয় প্রাচীন ও নবীন পুরাতত্ত্ব লেখকেরা। তাঁদের হাতে লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, ছাপানো বা গানের খাতা দেখতে ভীড় হয়েছে খুব। রবীন্দ্রনাথ লিখতে লিখতে ছবি এঁকেছেন, অজস্র পরিমার্জনার গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন 'কনভেন্ট', নারায়ণ বা মাসিক বা বুদ্ধদেব লিখতে গিয়ে কেটেছেন অনেক জায়গায়।

সাময়িক পত্রের বিভাগে এঁরা শুরু করেছেন দিগ্বিজয় বেঙ্গল গেজেট দিয়ে, শেষ করেছেন মিনি পত্রিকায়। দিগ্বিজয় গেজেট, সমাচার দর্পণের প্রথম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, সমাচার প্রভাকর বা সংবাদ ভাস্করের মত দুর্লভ সংখ্যা দেখার পর সংখ্যা ছাড়িয়ে সাধারণকে একবার দেখার ইচ্ছে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে তাঁদের চেনার কোন সুযোগ নেই। তবে প্রদর্শনীর সংগ্রহে আমিকার একাধিক ঐতিহাসিক সংবাদপত্র বাদ পড়েছে, অনেক উল্লেখ্য সাময়িক পত্রও যোগাই পাওনি, কোন্ অজ্ঞাত কারণে কে জানে। মনে হয়, এর ফলে ধারাবাহিকতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বাদ পড়েছে আরও অনেক কিছুই। বাদ পড়েছে পুরোনো যুগের খোদাই করা কাঠের ব্লক, কিংবদন্তীর মত শিক্ষপ্রিয় সব গল্পের বই ও পত্রপত্রিকা, বিচিত্র স্বাদের ও বিচিত্র বিষয়ের সাময়িক পত্রগুলি বা উল্লেখ্য মুদ্রক ও প্রকাশকদের উল্লেখ্য প্রকাশনার বিশদ কোন তালিকা। উপন্যাসের আয়োজন 'কুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর জন্যে মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেছে। পাণ্ডুলিপির কাঁচের বাক্সে ঈশ্বরচন্দ্রকে না পেয়ে হতাশ হয়েছি। হতাশ হয়েছি বেশী করেই সংখ্যায় খ্রীষ্টান ট্র্যাক্ট ও বাইবেলের বাংলা অনুবাদ দেখতে না পেয়ে।

যন্ত্রপাতির বিভাগকে আকর্ষণীয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন উৎসবের উদ্যোক্তাপক্ষ। এখানে যা সবচেয়ে বেশী মন দিয়ে দেখার তা হল শ্রুতকীর্তি পঞ্চাননের সাজসরঞ্জাম ও কেরীর আমলাদিত 'আগুনে কল'।

অনুগত মিত্র

কেন্দ্রবিন্দু

কেন্দ্রবিন্দু/মৃণালের ঘোষ ও রুমা গুহঠাকুরতা

নৌতনিকেতন এ নাটকের পটভূমি ১৯৭১-৭২ সালের অশান্ত, পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণ অঞ্চলের একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ঐ পরিবারের ছোট ছেলে 'মান্তু' উগ্র রাজনীতির সমর্থক—সে মাধ্যমিকের নিরক্ষেপ। পাড়ার গুণ্ডা, পুলিশ সকলেই তারই সন্ধানে ব্যস্ত। পরিশেষে 'মান্তু'র হত্যাকাণ্ড দিয়েই এ নাটকের ইতি হয়। আবহ-তে তখন রেডিওর অধিবেশন শুরু বিধাতে সেই সুরটা বাজছে। যা ইতিহাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরূপ এবং আবহ সংগীত রচনা করেছেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমটিতে তিনি যতখানি সার্থক, দ্বিতীয়টিতে ঠিক ততখানি ব্যর্থ। এ প্রযোজনা আরো উন্নত আবহ-সংগীতের দাবী জানাচ্ছে। প্যালালাল নৈত্রের মত অনায়াসেই দর্শকদের কাছে প্রশংসার প্রত্যাশা করতে পারে। পরিচালক বীরেশ্বর মিত্র নিজ ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করে। শেষ দৃশ্যটির পরিকল্পনা অভিনব। আলোর প্রয়োগও ঐ মুহূর্তে সুন্দর। 'কেন্দ্রবিন্দু'কে একরকম ত্রুটিহীনই বলা চলে। যে ছোটখাট ত্রুটি আছে তা চোখে পড়ে গেছে এর সম্পূর্ণতার কাছে। এখানেই নৌতনিক প্রযোজিত মুক্ত মঞ্চে অভিনীত 'কেন্দ্রবিন্দু' নাটকের সার্থকতা।

'কেন্দ্রবিন্দু' নাটকের প্রায় প্রতিটি শিল্পীই সাধ্যমত ভালো অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় (মা) সুকুমার ঘোষ (বাবা) এবং বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় (অন্ধ)। কাজার মুখার্জিতে প্রথম ও শেষোক্ত অভিনয় দীর্ঘদিন দর্শকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বলেই বিশ্বাস। 'মান্তু'র ভূমিকায় মানসশঙ্করকে মানিয়েছে চমৎকার। কাজী অনির্বাণ অভিনয়ের থেকেও গানটি গেয়ে দর্শকদের বেশী আকর্ষণ করেছেন। 'গিন্নী'র চরিত্রে চন্দ্রা গাঙ্গুলী ভালো অভিনয় করলেও তার কণ্ঠস্বর [illegible] দিয়েছে। প্রথমটি বন্ধুবলাবকে অবশ্যই ভালো লাগ লাগাতে পারে। খুবই প্রাণ অভিনয় করেছেন তিনি। সম্ভবত ও পাশের সুন্দর অভিনয় দেখে বিস্মৃত হয়ে শিল্পী বন্ধু কাজ চালিয়ে গেছেন। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অমল মুখোপাধ্যায় চরিত্রটিতে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে কার্পণ্য করেন নি। কাজী হালদার ভূপাল মুখার্জী ও নির্মল কমলবল্লিক এবং দৃশ্যে অভিনয় করেই নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

তপন রায়

কালবৈশাখী ঃ
একটি বুদ্ধিদীপ্ত নাটক

ভূতেন্দু চট্টোপাধ্যায় যে শুধু একজন শক্তিশালী অভিনেতা তাই নয়, একজন উত্তম পরিচালকও। ফ্রেনগ্রাউন 'টেনসিটিভিটি' কালবৈশাখী নাটকটি দেখলে একথাই বার বার মনে হয়। অভিনেতা হিসাবে 'ফিনয়', 'ছায়ার আলোয়' তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন আলোচ্য নাটকে। একটা দৈব দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের চরিত্রগুলি কি করে শেষ পর্যন্ত রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হল, তা দৃশ্যে দৃশ্যে নির্দেশক ভূতেন্দুবাবু যুক্তিনিষ্ঠভাবে পরিবেশন করেছেন। টাকা কি করে মানুষের মুখ বন্ধ করে, সন্তোষ বাবুর মত লোক কি করে সমাজে মাথা উঁচু করে চলে তা যেমন বাস্তবানুগ, তেমনি কর্মফল কি করে তাদের মত লোকদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ঘৃণার চোখে দেখে তাও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থিত করেছে। কমল চৌধুরী সন্তোষ বাবুর ভূমিকায় আট্ট ব্যক্তিত্বের অভিনয় করলেও প্রায়শ তিনি আড়ষ্ট। ছেলে ভদ্রব্রতের (ভূতেন্দু) বাল্যসখী প্রেমিকা (যার বিয়ে ওর দাদার সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল) রীণি (সবিতা বিশ্বাস) যখন নাটকের চূড়ান্ত পর্যায়ে রেল দুর্ঘটনার প্রকৃত ঘটনা ভদ্রব্রতের দাদার দেওয়া চিঠিতে জানিয়ে দিল তখন বসন্তবাবুর চোখমুখ ভাবভঙ্গী কেবল যেন খাপছাড়া মেখাচ্ছিল। সবিতা-দেবী নাটকের প্রয়োজনবোধে ছলনা দেখালেও স্বচ্ছন্দ হতে পারেননি। বরং বলা যায় প্রীতিলতার (সন্তোষবাবুর স্ত্রী) ভূমিকায় নীলিমা দাস এ নাটকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ছড়েলের ফিরে আসার জন্য আকুলতা, ছোট ছেলের জন্য মমতা আবার স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত নাটকে তাঁর জ্যোতিষীর ভূমিকার চিত্রণ রায় (পরিতোষ) মেনানাম। কল্পনা মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যারাণী স্ত্রীর ভূমিকায় যথাযথ বলা যায় না—প্রায়শ

কালবৈশাখী/কমল চৌধুরী, অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ও নীলিমা দাস

তার মুখভঙ্গী বিসদৃশ লেগেছে। গৌর চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার) মার্জিত। কিন্তু মুকুল ঘোষ (বিভাস) বাবার মৃত্যু যখন ছেলে সন্তোষবাবুর উপর বেভাবে রাগমুখ প্রকাশ করেছেন তা মানানসই করতে পারে একজন বিলাতফেরত আইনজীবী কি করে করতে পারে? মাষ্টার সঞ্জয় (পার্থ) খুব স্মার্ট।

নাট্যকার বীরু চট্টোপাধ্যায় নাটকের শেষ দৃশ্যে দীন দরিদ্রদের জন্য ধনীদের কর্তব্যবোধ সম্পর্কে যে ভাষণ রেখেছেন তা রাজনৈতিক আবেদনে লোচ্চার হয়ে ওঠেনি। বরং বলা যায়, দর্শকদের একটা ভাবাদর্শে আপ্লুত করে দেয়। নাটকের শুরুতে ঝড়ের দৃশ্য, মধ্যভাগে ট্রেনের দুর্ঘটনা, অন্তিমপর্বে হাসপাতালের দৃশ্য তপন সেন দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন আবহ সঙ্গীত (অজয় দাশ) প্রশংসনীয়। সুরেশ দত্তের মঞ্চ পরিকল্পনা (একটিমাত্র গেট) ভাল হলেও আবহাওয়া সৃষ্টিতে যে দেখিয়েছেন তা কি অবশ্যই? তবু নাটকটি পরিবেশনের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সত্যাবেষী

প্রতিমা চৌধুরীর আট পটারী

সিরামিক-চর্চা দেশে ইদানীং বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলেও ইটিও চর্চায় নিয়োজিত শিল্পীর সংখ্যা, শোনত কলকাতায়, খুব বেশী নয়। প্রতিমা চৌধুরী সেই বিরলদের মধ্যে শীর্ষে হিসেবে চিহ্নিত হবার প্রতিশ্রুতি রাখেন। সম্প্রতি তাঁর আট পটারির এক এক প্রদর্শনী হয়ে গেল ডেকর ডিভাইসের উদ্যোগে। ১২ থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত ডেকর সার্ভিসের গ্যালারিতে। গ্যালারিতে কৌতূহলী দর্শকের ভীড় কম ছিল না। শুধু দেখাই নয়, শিল্পরসিক যেন কিছু শিল্প-কিনেও নিয়ে গেছেন। কেননা চৌধুরী শিল্পের সঙ্গে দৈনন্দিন ... র সঙ্গে এমন এক সুন্দর সমন্বয় পেয়েছেন—যার শিল্প সৌকুমার্য দর্শকদের প্রভাবিত করে। প্রতিমা চৌধুরীর এই প্রদর্শনীতে অধিকাংশই ছিল টেবিল-সজ্জার উপকরণ, চা-কফির পাত্র, দুধ ও ফলের পাত্র, ছাইদান, মোমবাতি-... বাতিদান ইত্যাদি। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষণীয় মনে হয় তাঁর তৈরী ইকেবানা এবং অবশ্যই ফলদানীর সকলটী অনবদ্য পাত্র। রং ও নকশায় তাঁর স্বকীয়তা সহজেই চোখে পড়ে, যদিও তাঁর বেশীর ভাগ কাজই লাল গাঢ়ারী কফি কিংবা বিস্কুট রংএর। কিন্তু সিরামিকের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তিনি বেরেছেন।

শিল্পী ১৯৫৭ সালে সরকারী কলা বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ... পর ১৯৬২ সালে সিরামিক ... প্রশিক্ষণ নেবার জন্য পশ্চিম ... যাত্রা করেন। সেখানে বেলভের বিখ্যাত ... খান কোম্পানীতে তিনি পোর্সি-... কাজে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। ক্যালেনবেথেনে বিখ্যাত সিরামিক শিল্পী ডিনস্ল্যডের ইটিওতেও তিনি কাজ করেন এবং সবোন স্কো পটারিতে দক্ষতা লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। পরের বছর আবার জার্মানীর রোজেন থাল কোম্পানী থেকে মন্যার ডাক এল রোজেনের ম্যাজিক ফ্লুট বিষয় নিয়ে তাঁদের সেই বিখ্যাত কাজে অংশ নেবার জন্য। দেশে ফিরে থেকেই তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন—একটি নিজস্ব ইটিও গড়ে তুলবার কাজে নামলেন তিনি। তিন বছর আগে ইটিওটি অনেক পরিশ্রমে গড়ে উঠল। দু'জন সহযোগী এবং ঘুটো কার্লেস নিয়ে পটারস হুইলে কাজ সুরু করলেন। আড়াই বছর এক-নাগাড় পরিশ্রম এবং কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন তিনি মুক্তির আনন্দ পাচ্ছেন। শিল্প রসিকদের সঙ্গে পরিচিতির বাসনায় প্রদর্শনীর এই প্রথম উদ্যোগ নিলেন।

পটারিরত অবস্থায়—শিল্পী প্রতিমা চৌধুরী

সাড়া পেয়েছেন যথেষ্ট। পেয়েছেন প্রচুর বাহবাও। লোকসান পুষিয়ে তাঁর এই শিল্পকে এখন পুরোপুরি একে এক কুটির শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রতিমা চৌধুরীর রয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি চালাতে চান আর্ট পটারি নিয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা।

বীরেন সাহা

মহেন্দ্রপুর সিনেমা সমিতি

● ১৬ পৃষ্ঠার পরোংশ

এবারে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা বিভাদি এ বাংলার চাষাভুষো এবং অন্যান্য নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কেমন লক্ষ্য করছেন। জবাবে বিভাদি বললেন এদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন অন্তরায় বাল্য বিবাহ। ফলে কোনোরকমে একজন মেয়েকে ১৪ বা ১৫ বছর আট শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী হিসেবে পাওয়া যায় না। যেকোন ক্লাসে পেলেই ওরা অবাধাসে ৮।১০ দিন কামাই করে বসে। তবে পড়ায় একবার মন দিলে ওরা সবটুকু নিয়ে উঠবে এবং সবর বার করে এই পড়াশুনার পেছনে।

অবশ্য দশম শ্রেণীতে এখনও সরকারী অনুদান পাওয়া যায়নি বলে এই স্কুলে ছাত্রীরা প্রাইভেটে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। এছাড়া ১৯৭৬ সাল থেকে বয়স্ক মেয়েদের (যাদের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা আছে) দু বছর পড়িয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার অনুরোধন লাভ করেছে। এই সমিতির পাঠাগার ছাড়াও ওঁরা একটি স্বতন্ত্র পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। উপলব্ধি করেছেন নারী মুক্তির মোড়ার কথা—শিক্ষার আলোকে জীবনকে চিনতে শেখা। তাহলেই দূর হবে পল্লী জীবনের অন্যতম সমস্যা।

বেলা পড়ে এলো। আমরা সমিতির শিক্ষয়িত্রীকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

ছেনা চৌধুরী

DHANADHANYE
Price 50 paise

YOJANA
(Bengali)

Regd. No. wb/cc—
March 1—15,

রঞ্জীতে বাংলার বাজীমাৎ

কলকাতায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শেষ হবার পর আর একটি খেলা হ'ল। টেস্ট নয়। তবুও কম রোমাঞ্চকর হয়নি বাংলা ও হরিয়ানা দলের রঞ্জী ট্রফির সি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি। হরিয়ানা বেশ ভাল দল। অল স্টাফের রয়েছেন ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সিরিজের সেই সাড়া জাগানো কপিল দেব। অন্যদিকে বাংলা দলে এবার বেশ কিছু চেনা মুখ নেই—টাই পেয়েছেন অপেক্ষাকৃত তরুণরা। ইডেনের পীচে কপিল-সমৃদ্ধ হরিয়ানা ভাল খেলবে এমন অনেকেই করেছিলেন অবশ্যই। কিন্তু বাজিমাৎ করলো বাংলা দল। বাংলা এই খেলায় হারিয়ে দিল হরিয়ানাকে ৬ উইকেটে।

বেশ নাটকীয়তা-পূর্ণ ছিল এই ম্যাচটি। হরিয়ানা তাদের প্রথম ইনিংস শুরু করে পূর্ণা রাণেই প্রথম উইকেটটি হারায়। কিন্তু তার পরের উইকেট পড়লো ৬৫ রাণে। মনে হচ্ছিল হরিয়ানা বুঝি রানের উঠলো। কিন্তু নাটক শুরু হলো ৮ম পতনের বিভীষিকা পর। এক সময় ১৫ মিনিটের মধ্যে ১১ রাণে কপিলদেব সহ হরিয়ানার ৪টি উইকেট পড়ে গেল। কপিলদেব মাত্র ১ রাণ করেন। দিনের শেষে দলের রাণ ৭ উইকেটে ২৩৬। অপরাজিত ব্যাটসম্যান (৪৩) রাজিন্দর অবতরনাথ (৪৬) ও রবীশের চাল্লা (৪৩) রা একটু খেলেন। দ্বিতীয় দিনে ১৭ রাণ যোগ হতেই ২৫৩ রাণে হরিয়ানার প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল।

এবার কিন্তু রাণ কম হরিয়ানার। তবুও বাংলা দল তাদের প্রথম ইনিংসে খুব সুবিধা করতে পারলো না দ্বিতীয় দিনে। তাদের রাণ উঠলো ৬ উইকেটে ১৭৭। উল্লেখযোগ্য রাজু মুখার্জীর অপরাজিত ৬৯ রাণ। রাজিন্দর গোয়েল এই ইনিংসে প্রথম বারকে বোল্ড আউট করে রঞ্জী ট্রফিতে ৪১৮ টি উইকেট পেয়ে তাঁর-নজুর ভি বি কুমারের ৪১৭টি উইকেট রেকর্ড ভেঙে দেয়। তৃতীয় দিনে রাজুর ৯৯ রাণ ও সমরের ৩৯ রাণের সুবাদে বাংলা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল—২৪৪ রাণে। হরিয়ানার চেয়ে ৮ রাণে পিছিয়ে রইলো বাংলা দল।

প্রাঙ্গণ

দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু হ'ল মোটামুটি সমান সমান অবস্থায়। কিন্তু হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার সুব্রত পোদ্দারের যে কি ভয় মূর্তি। বিদ্যুৎ খেলে দল তবে ৫৯ রাণে সে শুরু করলো ৬টি উইকেট। আর অনেক তাচ্ছিল্যে শেষ ১৯ রাণে ৩টি উইকেট। হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ১৫২ রাণে। ১৬১ রাণ করলে জিতবে এই অবস্থায় শুরু হ'ল বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। তৃতীয় দিনের শেষে বাংলা কোন উইকেট না হারিয়ে করলো ২০ রাণ। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির ৩৯ মিনিট পরে বাংলা দল ৪টি উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৬১ রাণ তুলে নিল। এ খেলায় কপিল-দেবের অস্তিত্ব তেমন একটা বোঝা গেল না।

বাই হোক কোয়ার্টার ফাইনাল বাংলা খেলছে বিশ্বনাথ, শ্রিজেশ প্যাটেল, প্রদীপ চন্দ্রশেখরের কর্ণাটক দলের বিরুদ্ধে।

পূর্বাঞ্চলীয় ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপ টেনিসের পূর্বাঞ্চলীয় সেমি-ফাইনাল হয়ে গেল এই ক'দিন আগে কলকাতায়। রীতিমত জমেছিল এই সেমি-ফাইনাল খেলা। প্রথম দুটি সিংগলসেই ভারত হেরে গেল। পশ্চী যেমন হারলো দল কেসের কাছে ৯-৭, ৬-১, ৬-২ সেটে। আর বিজয় অমৃতরাজ হারলো জন আলেকজাণ্ডারের কাছে ৬-৪, ৮-৬, ১-৬ ও ৬-৩ সেটে। আলেকজাণ্ডার ১২বার ডাবল ফল্ট করলেও বিজয় তার সুযোগ নিতে পারেন। ডাবল খেলতেও পারেনি। পশ্চী তো প্রথম সেটটাতেই যা একটু লড়েছিল। বস্তুত এদিনের খেলা দেখে মনে হয়েছিল সহজ জয় অষ্ট্রেলিয়ার জন্য অপেক্ষামান। দ্বিতীয় দিনে হ'ল ডাবলস খেলা। ভারতের বিজয় ও অমৃতরাজের বিরুদ্ধে খেললো ৭৭-এর উইলডেন বিজয়ী বব কেস ও জিওফ ব্রাউন। প্রথম সেটে হেরে গিয়েও ভারত কেভাবে এই ম্যাচটি জিতেছে তা প্রশংসনীয়। তারা জিতলো ৬-৮, ৮-৪, ৬-১ ও ৮-৩ সেটে। এই জয়ই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ২-১ খেলায় পিছিয়ে থেকে ডিবিস্ট্রি সিংগলসে বি ১-৩, ৮-১, ৭-৩ পেয়ে বস-কো হারিয়ে খেলার সমতা আনে। আর সিংগলসে পশ্চী যেমন ৫৮৩ প্রতি ঘাড়া করলো—আলেকজাণ্ডারের বিরু প্রথম দুটি সেট পশ্চী পেল ৮-৬, ৬-৩, দি দুটি আলেকজাণ্ডার জিতলো ৬-১, সেটে। পরের সেটে যখন, ৬-১ খেলা বন্ধ হইলো আলোর অভাবে। প দিন ১৫ মিনিটের মধ্যেই আলেকজ ৬-৪-এ সেটটি জিতে অষ্ট্রেলিয়াকে পূর্বাঞ্চ ফাইন্যালে তুলে দিল। এ খেলায় ম মূল্যায়ণ করেছেন অষ্ট্রেলিয়ান দলের প্লেয়িং ক্যাপ্টেন নীল ফ্রেজার। বলেছেন—বরাত জোরে জিতে গেছি

জাতীয় ক্রীড়া

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হ'ল ছয় ব্যাপী জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগি জাতীয় ক্রীড়া শেষবার অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালে কটকে আগে এর যোগিতার নাম ছিল ভারতীয় অলি গেমস। ১৯৫৬ সাল থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতা নাম হয়।

এবার জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত চন্দ্র। ৯টি বিভাগে এ হাজার প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। আগে আর কোন জাতীয় ক্রীড়া যোগিতায় এত বেশী প্রতিযোগী যো করেন নি। শুধু অ্যাথলেটিকসেই নিয়েছেন ১ হাজার ২০০ জন। অ বিভাগে হ'ল বক্সিং, কুস্তি, ভারোত্তো জিমন্যাসটিক্স, সাইকেল চালনা, ভা ও ঘাড়ডল। হকি, ফুটবল, ব্যাডমিণ্ট মতো যে সব খেলার পৃথক জাতীয় যোগিতা হয়ে থাকে সেগুলি এই যোগিতার স্থান পায় না।

—প্রণবেশ

পাঠকদের প্রতি

পাঠকদের সুবিধার্থে কাগজ এজন্য আমাদে পত্রিকা সময়মত প্রকাশ করা সম্ভ হচ্ছে না। এজন্য আমরা দুঃখিত।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীনে বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত যোজনার বাংলা, হিন্দি ইংরেজী, অসমীয়া, গুজরাতী, কন্নড়, মারাঠী, তামিল এবং তেলেগু সংস্করণের যথাক্রমে সম্পাদক—প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বাংলা সংস্করণ অফিসের সম্পাদক—শ্রীশান্তনুকুমার রায়, সহকারী সম্পাদক—বীরেন্দ্রনাথ. উপ-সম্পাদক—ত্রিপুরা চক্রবর্তী।
কমলেশ প্রেস, ১৬৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।